মুসাফির

সৈয়দ মুজতবা আলী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ : পৌষ, ১৩৭২

প্রকাশক : মৈনাক বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ : প্রসাদ রায়

প্লেন যখন ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়ে যাচ্ছে তখন ছোকরা মুখুজ্যে শুধালে, 'চাচা, লণ্ডনে গিয়ে উঠবো কোথায়, চিন্তা করেছেন কি?' ছোকরা এই প্রথম বিলেত যাচ্ছে, প্রশ্নটা অতিশয় স্বাভাবিক। আমি বললুম, 'বাবাজী, কিচ্ছুটি ভাবতে হবে না। রসুই বামুন না হলেও তুমি তো ব্রাহ্মণসন্তান বটে। হাটে গিয়ে চাল-ডাল কিনে নিয়ে আসবে; আমি ততক্ষণে বটগাছ-তলায় ইটের উনুন জ্বালিয়ে রাখবো। শুনেছি লণ্ডনের উপর বিস্তর বোমা পড়েছিল, ইট পেতে অসুবিধে হবে না।'

এ্যারপোর্ট থেকে বেরিয়ে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পরও যখন বটগাছ পাওয়া গেল না, তখন বাধ্য হয়ে হোটেলে উঠতে হল।

রসিকতা নয়, একটুখানি সবুর করুন!

সেদিন সন্ধ্যাবেলায়ই মুখুজ্যের বয়েসিই তার এক ইংরেজ বন্ধু এসে উপস্থিত। ছোকরা খাঁটি ইংরেজ, লড়াইয়ের সময় ভারতবর্ষে এসেছিল, এ-দেশটাকে এতই ভালোবেসে ফেললে যে শেষ পর্যন্ত দিশী মেম নিয়ে বিলেত গেল। বললে, 'এদেশের লোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমনি অগা যে, সেদিন এক গবেট বিবিসিতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললে, "ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ লোক বাইরে শোয়।" আমি ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে বিবিসিতে কড়া চিঠি লিখেছি।'

আমি বললুম, 'এতে চটবার কি আছে? কথাটা তো সত্যি। গরমের দেশের লোক ১১৪ ডিগ্রীতে সর্বাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে ঘরের ভেতর শোবে নাকি? তোমাদের দেশের লোক মাইনাস দশ ডিগ্রিতে যদি বাইরে শোয় তবে মরে যাবে। আমাদের দেশের লোক গরমে ঘরের ভিতর দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে না বটে, কিন্তু সারা রাত এপাশ ওপাশ করে কাটাতে হবে। হীট হার্টস্, কোল্ড কিল্স্।'

এই কোল্ড কিল্স্ নিয়ে প্রাচ্য প্রতীচ্য সভ্যতার পার্থক্য। বটগাছতলা আর হোটেলের পার্থক্য।

গরমের দেশে জীবন ধারণের জন্য অত্যধিক সাজ-সরঞ্জাম আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয় না; পক্ষান্তরে শীতের দেশে পাকা-পোক্ত ঘর-বাড়ি চাই, মেঝেতে শোওয়া যায় না; লেপ-কম্বল গদি-বালিশ চাই। শীতের ছ'মাস শাক-সব্জী ফলমূল কিছুই ফলে না, ছ' মাসের তরে মাংসের শুঁটকি জমিয়ে রাখতে হয়; আমরা দিন আনি দিন খাই, ছ' মাসের খাবার-দাবার জমিয়ে রাখার কথা শুনলে নাভিশ্বাস ওঠে। ছ' মাসের খাবার কিনতে গেলে বেশকিছু রেস্তোর প্রয়োজন।

তাই বোধ হয় ইয়োরোপীয়রা একদিন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ডাকাতি করতে প্রাচ্য দেশে এসেছিল। আজ ডেনমার্ক, জর্মনি, নরওয়ে, সুইডেনের খাবার-দাবার ব্যবসা-বাণিজ্য করেই চলে। ডাকাতিতে জিতেছিল ইংরেজ। আজ সে-সব লুণ্ঠন-ভূমি কব্জা থেকে খসে পড়ে যাচ্ছে। চার্চিল ব্রিটিশ রাজত্বের লিকুইডেটর হতে চাননি; আজকের শাসনকর্তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় হতে হচ্ছে। ওদিকে খাওয়া-দাওয়া থাকা-পরার মান অনেকখানি উঁচু হয়ে গিয়েছে—সেটাকে বজায় রাখা যায় কি প্রকারে? আজ না হয় রইল, ভবিষ্যতে হবে কি? সেকুরিটি কোথায়?

এই সেকরিটি নিয়েই যত শিরঃপীড়া।

সমসাময়িক ইংরিজি সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প। তবে সমঝদারদের মুখে শুনেছি, সেখানেও নাকি গুণীজ্ঞানীরা প্রাণপণ সেকুরিটি খুঁজছেন। ধর্মে বিশ্বাস নেই, আদর্শবাদ গেছে, চরমমূল্য পরমসম্পদ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আদৌ আছে কি না তাই নিয়ে গভীর সন্দেহ—সেই প্রাচীন 'ওয়েস্ট-ল্যাণ্ড' নাকি আরো বিস্তীর্ণ হয়ে সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে।

তবে কি কার্ল মার্কসের নীতিই ঠিক? দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অভাব-অনটন উপস্থিত হলে সাহিত্যে সেটা প্রতিবিম্বিত হবেই হবে?

তা সে যা হোক, হোক কিন্তু এই সেকুরিটির ব্যাপার আরেক সূত্রে উঠলো।

৺বিদ্যাসাগরকে যে ইংরেজ মহিলা স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার প্রসারে প্রচুর সাহায্য করেন, তাঁরই এক নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে আমাদের আবার দেখা হল লণ্ডনে। নাম কার্পেন্টার। ইনি জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছেন ভারতবর্ষে। আমি তাঁকে যখন একবার কলকাতাতে শুধাই তিনি কি মিস কার্পেণ্টারের কোনো আত্মীয় হন, তখন উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার ঠাকুরদার বোন।' তারপর হেসে বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু তাঁর মত টাকা ছড়াতে আসিনি: তারই কিছুটা কুড়িয়ে নিতে এসেছি।'

তিনি নিমন্ত্রণ করে স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় মূর পদ্ধতিতে তৈরী বিরয়ানী (সে কথা পরে হবে) খাওয়াচ্ছিলেন। কথায় কথায় তাঁকে শুধালুম, 'এই যে সাদায় কালোয় দ্বন্দ্ব লেগেছে এদেশে, তার মূল কারণ কি?'

তিনি এক কথায় বললেন, 'গার্লস।'

আমি অন্যত্র শুনেছিলুম চীপ লেবার অর্থাৎ কালারা কম মজুরীতে কাজ করতে তৈরী। ম্যানেজাররা তাই তাদের চায়। ইংরেজ মজুর তাই চটে গেছে।

তাহলে 'গার্লস' এল কোত্থেকে ?

আসলে দুটোই এক জিনিস।

নিগ্রোদের কথা বলতে পারবো না—সিলেট-নোয়াখালির খালাসীদের কথা জানি। তাদের অনেকেই লণ্ডনে এসে অন্য খালাসীদের জন্য রাইস-কারির দোকান খোলে। বাঙালী ছাত্রেরাও সেখানে মাঝে মাঝে গোয়ালন্দ-চাঁদপুরী জাহাজের রাইস-কারি খাবার জন্য যায়।

গিয়ে দেখবেন মিশকালো খালাসীর ইংরেজ বউ। দু' জনাই খদ্দেরকে খাবার দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সেই সিলেটি আছমৎ উল্লা বউকে ডেকে খাস সিলেটিতে বলছে, 'ওগো ডুরা (ডোরা), সাবরে আরক কট্টা মুর্গীর সালন দে (সায়েবকে আরেক কটোরা-বাটি মুর্গীর ঝোল দে)।'

মেম সায়েব সিলেটি শিখে নিয়েছে! কারণ আছমৎ উল্লা ইংরিজিটা রপ্ত করতে পারেননি।

এখন প্রশ্ন, এই মেমটি আছমৎ উল্লাকে বিয়ে করলো কেন ?

সেকুরিটি।

আছমৎ উল্লা মদ খায় না। তাই মাতাল হয়ে বউকে মারপিট করে না—এবং তার চেয়েও বড় কথা মদ খেয়ে টাকা ওড়ায় না। রেসে যায় না, তিন পাত্তি তাস খেলেও সর্বস্বান্ত হয় না। সন্ধ্যার পর বাড়িতেই থাকে। এই হল এক নম্বর।

দুই নম্বর—বিয়ের পর (আগেও ডোরা ছাড়া) অন্য রমণীর দিকে প্রেমের বাণ হানে না।

এই দুটি সেকুরিটি রমণী মাত্রই খোঁজে। অন্যান্য ছোটখাটো কারণের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই—বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে, কান্নাকাটি করলে বউকে ধমক দিয়ে ড্রইংরুমে লেপকম্বল নিয়ে শুতে চলে যায় না। আছমৎ উল্লার দেশের কুঁড়ে ঘরে তারা দশজন শুতো,—তার দাদার কাচ্চা-বাচ্চা

সে সামলেছে, পরিবার বেসামাল বড় ছিল বলেই তো দু' মুঠো ভাতের জন্য সে এদেশে এসেছে।

যদি বলেন, কালচারল লেভেল কি এক? নিশ্চয়ই। ডোরা খানদানী ডিউকের মেয়ে নয়, সে এগজিস্‌টেনশিয়ালিজম নিয়ে মাথা ঘামায় না, আর আমাদের আছমৎ উল্লাও জমিদারবাড়ির ছেলে নয়, সে 'যোগাযোগ' পড়েনি।

যদি বলেন, 'সাদা মেয়ে কি কালোকে পছন্দ করে?' উত্তরে বলি, 'আমাদের ভিতরে যে যত কালা সে-ই তো তত ফর্সা বউ খোঁজে।' (এই সাদার তরে পাগলামি এদেশে খুব বেশী দিন হল্ল আসেনি। দুশ' বছর আগেকার লেখা বইয়ে ইয়োরোপীয় পর্যটকরাও লিখেছেন, 'ভারতীয়রা আমাদের ফর্সা রঙ দেখে বেদনাভরা কণ্ঠে শুধায় "হায়, ভগবান এদের সবাইকে ধবলকুষ্ঠ দিয়েছেন কেন?" কথাটা ঠিক। এদেশের দুই মহাপুরুষ কৃষ্ণ এবং রামের একজন কালো, অন্যজন নবজলধরশ্যাম।')

এই সেকুরিটির অভাবই মদ্যপানের অন্যতম কারণ।

ইংলণ্ডে যে মদ্যপান বেড়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কোনো দেশের গুণীজ্ঞানীরা কি ভাবেন, কি চিন্তা করেন, সে-কথা জানবার জন্য সে-দেশে যাবার কোনো প্রয়োজন আমি বড় একটা দেখিনে। আপন দেশে বসে বসে সে দেশের উত্তম অধম পুস্তক, মাসিক, খবরের কাগজ পড়লেই সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মে। কিন্তু সে দেশের টাঙ্গাওলা-বিড়িওলা ড্রাইভার-কারখানার মজুর কি ভাবে, কি চিন্তা করে সেটা জানতে হলে সে দেশে না গিয়ে উপায় নেই। কারণ তারা বই লেখে না, খবরের কাগজে সম্পাদককে চিঠি লিখে নালিশ ফরিয়াদ জানায় না। তাদের কান্নাকাটি গালমন্দ যা-কিছু করার সব কিছুই তারা করে এদেশে চায়ের দোকানে, ওদেশে 'পাবে' অর্থাৎ শরাব-খানায়। আর শরাব-খানায় মস্ত বড় একটা সুবিধা—আমাদের চায়ের দোকানেও তাই—

কারো সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করতে চাইলে সে খেঁকিয়ে ওঠে না ; গুণীজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করতে হলে বিস্তর বয়নাক্কা, আত্মাবমাননাও তাতে কিঞ্চিৎ আছে কিংবা এ-চিন্তাও মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নয়, 'আমি কে যে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে যাব ?'

কেন্‌সিংটন গির্জার পাশে ছোট্ট একটি শরাবখানাতে এক কোণে বসেছি। প্রচণ্ড ভিড়। এমন সময় একটি বুড়ি বার থেকে এক গেলাস জিন কিনে এনে আমার পাশে বসতে গেলে তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগটি মাটিতে পড়ে গেল। সেটি কুড়িয়ে টেবিলের উপর রাখলুম। বুড়ি গলে গিয়ে 'থ্যাঙ্কয়ু্য, থ্যাঙ্কয়ু্য' বলে চেয়ারে বসে খানিকটে আমাকে শুনিয়ে খানিকটে আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'আজকাল-কার ছোঁড়াদের ভদ্রতা বলে কোনো জিনিস নেই, তবু—'বাকিটা তিনি আর শেষ করলেন না। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না তিনি কি বলতে চান। ছোঁড়াদের ভদ্রতা নেই কিন্তু আমার আছে, এ কি করে হয়, কারণ আমি ছোঁড়া নই। তবে বোধহয় বলতে চান ছোঁড়াদের নেই, কিন্তু এ বুড়োর (অর্থাৎ আমার) আছে। সেটা অনুমান করেও উল্লাস বোধ করি কি প্রকারে ? আমি বুড়ো বটি কিন্তু থুথ্‌ুড়ে বুড়ির কাছ থেকে সে তত্ত্ব শুনে তো আনন্দিত হওয়ার কথা নয়।

তা সে যাক্‌গে। আমি তখন অবাক হয়ে 'বারের' দিকে তাকিয়ে বার বার তাজ্জব মানছি। হরেক রকম চিড়িয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝপাঝপ বিয়ার, 'এল', জিন খাচ্ছে—এ কিছু নয়া তসবীর নয়, কিন্তু আশ্চর্য, চব্বিশ, ছাব্বিশ বছরের মেয়েরা পর্যন্ত 'বারে' কটাশ্‌ করে শিলিঙ রেখে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে ঢকাঢক বিয়ার খেয়ে ছুট করে বেরিয়ে যায়। যৌবনে যখন লণ্ডন গিয়েছি, তখন দুপুর বেলা 'বারে' একা একা খাওয়া মাথায় থাকুন রাত্রে ডিনারের সময়ও কোনো ভদ্রমেয়ে তার বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গেও এসব জায়গায় আসতে ইতস্তত করতো। নিতান্ত যেতে হলে যেত রেস্তোরাঁয় অর্থাৎ

খাবারের জায়গায় যেখানে মদ্যপান করা হয় খাদ্যের অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে—আমাদের গ্রামাঞ্চলে যে রকম শুধু জল খেতে দেয় না, সঙ্গে দুটি বাতাসা দেয়।

বুড়ো-বুড়িদের দৃষ্টিশক্তি কমে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বটাও সত্য যে, যা দেখে তার থেকে অর্থ বের করতে পারে সেই অনুপাতে অনেক বেশী। তাই সেই বুড়ি এক ঢোক জিন খেয়ে আমাকে শুধালে—(এ সব জায়গায় ইংরেজ লৌকিকতার বজ্রবাঁধন কিঞ্চিৎ ঢিলে হয়ে যায়) 'বাবাজী কি এদেশে এই প্রথম এলে?'

বুঝলুম, বাঙালের হাইকোর্ট-দর্শন দর্শন করে ঘটি যে রকম পত্রপাঠ ঠাহর করে নেয়, লোকটা বাঙাল; আর আমি তো আসলে বাঙাল; কলকাতায় যে-রকম প্রথম হাইকোর্ট দেখেছিলুম এখানেও ঠিক তেমনি ক্যাবলাকান্তের মত সব-কিছু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছি। যতই পলস্তরা লাগাই না কেন সে বাঙালত্ব যাবে কোথায়? প্রতিজ্ঞা করলুম সাবধান হতে হবে। শহুরেদের মত সব-কিছু দেখব আড়নয়নে সিব্রামদার মত 'বাঁকা চোখে'।

অপরাধীর সুরে বললুম, 'তা ম্যাডাম, প্রায় তাই। ত্রিশ বছর পূর্বে এসেছিলুম, আর এই। লণ্ডন ইতিমধ্যে পুনর্জন্ম না হোক অর্ধজন্ম তো লাভ করেছে!'

বুড়ি মহা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বলে কি? ত্রিশ বছর পরে! তাহলে তো এর কাছ থেকে অনেক-কিছু শোনা যাবে। অবশ্য উত্তেজনার কারণ জিনও হতে পারে।

'সবে দাড়ি-গোঁপ-কামাতে-শিখেছে এক স্কচ ছোকরা বাড়ি থেকে পালিয়ে মার্কিন মুল্লুকে উধাও হয়। বহু পয়সা কামিয়ে ত্রিশ বছর পরে সে ফিরছে দেশে। বাড়ি ফেরার সময় এত দিন বাদে এই সে প্রথম চিঠি লিখেছে। স্টেশনে বাপ-চাচা-দাদা সবাই উপস্থিত, সবাই খুশী, প্রচুর পয়সা কামিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসছে।

চুমোচুমি আলিঙ্গনের পর ছোকরা শুধলে, "তোমরা সাবই এ-রকম লম্বা লম্বা দাড়ি রেখেছ কেন? এই বুঝি ফ্যাশান!"

জ্যাঠা বিড়বিড় করে বললেন, "ফ্যাশান না কচু! তুই যে পালাবার সময় ব্লেডখানা সঙ্গে নিয়ে গেলি!"

বুড়ি আরেক ঢোক জিন্ খেয়ে হেসে বললেন, "আমার পিতৃভূমি স্কটল্যাণ্ডে; কাজেই আমার অজানা নয় যে সেখানে কুল্লে পরিবার এক ব্লেডে দাড়ি কামায়। কিন্তু ত্রিশ বছর—?'

আমি বললুম, 'ঠিক বলেছেন, ম্যাডাম। আমি ত্রিশ বছর পূর্বে লণ্ডন ছাড়ার সময় আমার ব্লেডখানা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম কিন্তু তাই বলে লণ্ডনের লোক দাড়ি কামানো বন্ধ করে দেয়নি। ইস্তেক গোঁপ পর্যন্ত কামিয়ে ফেলেছে।'

'মানে?'

'মানে মেয়েদের রাজত্ব। আমার ভাইপো এই প্রথম লণ্ডনে এসেছে। তার কাছে সব-কিছুই নূতন ঠেকছে। সে আজ সকালে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর বললে "ফোর টু ওয়ান" অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে যদি চারটে মেয়ে চলে যায়, তবে একটা ছেলে। আমি অবশ্য বললুম, "এখন আপিস, আদালত দোকান-পাট খোলা, সেখানে পুরুষরা কাজ করছে। অন্য সময়

শুনলে হয়তো অন্য রেশিয়ো বেরবে।" সে বলল, "ওসব জায়গায়ও তো মেয়েরাই বেশী। নিতান্ত বাস আর ট্যাক্সি মেয়েরা চালাচ্ছে না।" (পরে অবশ্য ফ্রান্স না জর্মনি কোথায় যেন তাও দেখেছি)।'

তারপর বললুম, 'এক একটা লড়াই লাগে আর মেয়েদের পায়ের শিকলি খোলার সঙ্গে সঙ্গে মনের শিকলিও খুলে যায়।'

'মানে?'

আমি বললুম, 'বেশী দূরে যাবার কি প্রয়োজন? ঐ 'বারের' দিকে তাকিয়ে দেখুন না। ত্রিশ বছর আগে উড়ুক্কু বয়সের মেয়েদের দুপুর বেলা 'বারে' মাল গিলতে দেখেছেন?'

বুড়ি একটু লজ্জিত নয়নে আমার দিকে তাকালেন।

আমি তাতে পেলুম আরো লজ্জা। আবার বাঙাল-পনা করে ফেলেছি। তাড়াতাড়ি বললুম, 'না, না, এতে আমার কোন আপত্তি নেই।' তারপর অস্বস্তির কুয়াশা কাটাবার জন্য হাসির রোদ ফুটিয়ে বললুম, 'সবাই কি ত্রিশ বছরের দাড়ি নিয়ে বসে থাকবে? সময়ের সঙ্গে কদম কদম এগিয়ে যেতে হয়।'

বুড়ি যেন আমার কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'এর জন্য আমরাই দায়ী। তবে শুনুন।'

'এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে লণ্ডনের উপর কি রকম বোমা পড়েছে তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। কয়েক বছর আগে এলেও দেখতে পেতেন লণ্ডনের সর্বাঙ্গে তার জখমের দাগ। এখনো কোন কোন জায়গায় আছে—নিশ্চয়ই দেখেছেন। কিন্তু ওসব বাইরের জিনিস। আজ যদি ভূমিকম্পে লণ্ডনের আধখানা তলিয়ে যায় তবে তাই নিয়ে বাকী জীবন মাথা থাবড়াবো নাকি?'

'কিন্তু মাটির তলার ঘর "সেলারে" বসে প্রতি বোমা পড়ার সময় ভয়ে আতঙ্কে যে রকম কেঁপেছি সেটা হাড়গুলোকে নরম করে দিয়ে গিয়েছে,—সে আর সারবার নয়। বম্বিং-এর পর রাস্তায় বেরিয়ে মড়া দেখেছি, জখমীদের কাতর আর্তনাদ শুনেছি—বুকের

উপর তার দাগ সেও কখনো মুছে যাবে না। আমার ফ্ল্যাটটা বহু-দিন টিঁকেছিল—অনেককে তাতে আশ্রয় দেবার সুযোগ পেয়েছি, দু'চার দিন থেকে তারা অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে, কেউ বা বেশী দিন থেকেছে। একদিন এক মর মর বুড়োকে আশ্রয় দিলুম। তাকে নিয়ে কি করবো সেই কথা ভাবতে ভাবতে যখন বাড়ি ফিরছি তখন জর্মন 'বমারের' বাঁশী বাজলো। ঘণ্টাখানেক মাটির নিচের আশ্রয়ে কাটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন দেখি স্বয়ং ভগবান আমার সমস্যাটির শেষ সমাধান করে দিয়েছেন। বাড়িটি নেই। সঙ্গে সঙ্গে বুড়োও গেছে।' একটুখানি থেমে বললেন, 'পরে অবশ্য লাশটা পাওয়া গিয়েছিল।'

বুড়ির জিন ততক্ষণে ফুরিয়ে গিয়েছে। কাপড়-চোপড় দেখে মনে হ'ল অবস্থাও খুব ভালো নয়। ফ্রকে হাঁটুর কাছটায় আনাড়ি কিম্বা বুড়ো হাতের একটুখানি রিপুও দেখতে পেলুম। এবার কিন্তু বাঁকাচোখে।

'এখখুনি আসছি' বলে বারে গিয়ে একটা জিন নিয়ে এলুম।

মনে মনে বললুম, সদাশয় ভারত সরকার যে কটি পাউণ্ড ভারতীয় মুদ্রা মারফৎ কিনতে দিয়েছেন তা দিয়ে এ রকম করলে আর কদিনে চলবে? কিন্তু তাই বলে তো আর ছোটলোকমী করা যায় না। আমার ক্যাশিয়ার মুখুজ্যেও পই পই করে বলেছে, 'কিপ্টেমি করা চলবে না; পাউণ্ড যদি ফুরিয়ে যায় তবে তদ্দণ্ডেই দেশে ফিরে যাবো—ফিরতি টিকিট তো কাটাই আছে।'

বুড়ি বললেন, 'না, না। আপনি আবার কেন—? আমি এমনিতেই অনেকগুলো খাই।'

আমি হেসে বললুম, 'ত্রিশ বছর পরে এসেছি; একটুখানি পরব করবো না। যদিও স্কচ ছোঁড়ার মত মিলিয়ন নিয়ে আসিনি।'

বুড়ি বললেন, 'তখনই আমার নার্ভস যায়। অনেকেরই যায়।'

তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন না, আমার বয়েসী ক' গণ্ডা বুড়ি মদ গিলছে।'

'খাবার জোটে না, অহরহ বোমা পড়ছে, কানের পর্দা শব্দের হাতুড়ী পেটা খেয়ে খেয়ে যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে—লক্ষ্য করেননি, অনেকেরই কান খারাপ হয়ে গিয়েছে, সবাই একটুখানি চেঁচিয়ে কথা কয় (আমি অবশ্য করিনি—তবে কথাটা সম্পূর্ণ ভুল নাও হতে পারে)—দিনরাত কেটে যাচ্ছে, চোখের পাতায় ঘুম নেই, এমন সময় পাশের বাড়ি উড়ে যাওয়ার পর তাদের "সেলার" থেকে বেরুলো এক গুদোম মদ।'

'আগের থেকেই নার্ভস ঠাণ্ডা করার জন্য ধরেছিলুম সিগারেট, এখন পেলুম ফ্রী মদ। মদ খেলে আরেকটা সুবিধে। ক্ষিদেটা ভুলে থাকা যায়, আর নেশাটা ভালো করে চড়লে দিব্য ঘুমনোও যায়—বোমা ফাটার শব্দ সত্ত্বেও।'

'খাবার নষ্ট হয়ে যায় সহজেই, কিন্তু মদ একবার বোতলে পুরলেই হল। তাই খাবারের চেয়ে মদ জুটতো সহজে—অন্তত আমার বেলা তাই হয়েছে। সেই যে অভ্যাসটা হয়ে গেল সেটা আর গেল না। এই দেখুন হাত কাঁপছে। গণ্ডাখানেক খাওয়ার পর হাত দড়ো হবে। আর নাই বা হলো দড়ো। কদিনই বা বাঁচার আর বাকি আছে!'

'কিন্তু যে কথা বলছিলুম। আমাদের মত বুড়িদের দেখে দেখে ছুঁড়িরাও মদ খেতে শিখেছে। দোষটা তো আমাদেরই।'

বুড়ি থামলেন। খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ল বৃষ্টি নেমেছে। দেশের মত গামলা-ঢালা বর্ষণ নয়—সে-বস্তু এদেশে কখনো দেখিনি। ঝিরঝিরে ফিনফিনে। তারই ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আরো যেন ঠাণ্ডা হয়ে 'পাবে' ঢুকে আমার হাড়ের ভিতর সেঁধিয়ে গিয়ে কাঁপন ধরিয়ে দিল। ওদের অভ্যাস আছে, বুড়ি পর্যন্ত বিচলিত হল না, কেউ দরজা বন্ধ করে দেবার কথা চিন্তাও করলে না।

পূর্বেই বলেছি বুড়িরা দেখে কম বোঝে বেশী। বললেন, 'বাবাজী এদেশে এলেন অক্টোবর মাসে, যেটা কিনা ইংলণ্ডের ওয়েটেস্ট্ মন্থ্, বৃষ্টি হয় সব চেয়ে বেশী। অবশ্য এ বছর আবহাওয়ার কোনো জমা-খরচ পাওয়া গেল না—তেষট্টি বছরের ভিতর এ-রকম ধারা কখনো হতে দেখিনি। যখন বৃষ্টি হওয়ার কথা, তখন ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর, আর যখন রোদ্দুর হওয়ার কথা, ফসল কাটার সময়, তখন হল বৃষ্টি। এ-রকম হলে এদেশ থেকে চাষ-বাসের যেটুকু আছে তাও উঠে যাবে।'

আমি বললুম, 'এই অনিশ্চয়তার জন্যই গত একশ' বছর ধরে এদেশে গমের চাষ কমে গিয়েছে—কোথায় যেন পড়েছি।'

বুড়ি বললেন, 'এবারের সঙ্গে কিন্তু আপদেই তার তুলনা হয় না। সবাই বলে এটম বম নিয়ে মাতামাতি করার ফলে। হবেও বা। আপনাদের দেশেও তো শুনেছি এবারে তুলকালাম কাণ্ড হয়েছিল,—বিস্তর গর্মী, অল্প বৃষ্টি।'

একটু আরাম বোধ করলুম। তাহলে বুড়ি এখনো খবরের কাগজটা অন্তত পড়ে। জীবনে আঁকড়ে ধরার মত অন্তত কিছু একটা আছে। বললুম, 'সে কথা আর তুলবেন না, ম্যাডাম। দিনের পর দিন ঝাড়া দুটি মাস ধরে ১১৪ ডিগ্রীর ১১৪ ন্যাজওলা ক্যাট অ' নাইন টেল্‌সের চাবুক খেয়ে পিঠে ঘা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন এই ঠাণ্ডায় সে-কথা ভাবতে চিত্তে পুলক লাগে, দেহ কদম ফুলের মত—'

'সে আবার কি ফুল?'

খাইছে। এ যেন লণ্ডন শহরে মুখুজ্যের বটগাছ সন্ধান করার মতো। বললুম, 'ম্যাডাম, সে তো বোঝানো অসম্ভব। এদেশের কোনো ফুল তার কাছ ঘেঁষেও যায় না। বোঝাতে গেলে সেই অন্ধের বক খাওয়ার মত হবে। অন্ধকে শুধালে "দুধ খাবে?" "দুধ কি রকম?" "সাদা।" "সাদা কি রকম?" "বকের মতো।"

"বক কি রকম?" লোকটা তার কনুই থেকে বক-দেখানোর বাঁকানো হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত অন্ধের হাতে বুলিয়ে দিল। অন্ধ ভয় পেয়ে বললে, "বাপ্‌স্‌! ও আমি খেতে পারবো না—আমার গলা দিয়ে ঢুকবে না।"

তারপর বললুম, 'কিন্তু ম্যাডাম, আপনি যে বললেন, ছুঁড়িরা আপনাদের অনুকরণে মদ খেতে শিখেছে একথাটা আমার মনকে সাড়া দিচ্ছে না। আমার মনে হয়, যারা মদ খায় তাদের অধিকাংশই তুরন্ত দৌড়-ঝাপটার কাজ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই ঐ কর্ম করে। চাষাবাদের কাজ ঢিমেতেতালা; তারা মদ খায় কম। কারখানার কাজ জলদ তেতাল; তারা খায় বেশী। আগে শুধু পুরুষেরা যে-সব ধুন্দুমারের কাজ করতো এখন মেয়েরাও সে সব কাজ করছে বলে তাদেরও একটু আধটু পান করতে হচ্ছে। কিন্তু এটাও বলে রাখছি, এ রেওয়াজ বেশীদিন থাকবে না।'

'কেন?'

আমি বিজ্ঞের ন্যায় বললুম, 'পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও পড়িনি, আমি নিজে কোথাও দেখিনি মদ নিয়ে মেয়েদের বাড়াবাড়ি করতে —ও বস্তু যেখানে জলের মত সস্তা সেখানেও। তার কারণ মেয়েদের বাচ্চা প্রসব করতে হয়। প্রকৃতি চায় না মদের বাড়াবাড়ি করে মেয়েরা স্বাস্থ্য নষ্ট করুক। এবং শেষ কথা পুরুষের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের আবার ঘরকন্নার দিকে ফিরে যেতে হবে।'

বুড়ি বললেন, 'কি জানি? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাই হয়েছিল বটে, কিন্তু এবার কি তারা যে স্বাধীনতা পেয়েছে সেটা আর ছেড়ে দেবে? সেবারে শুধু তারা পুরুষের কাজ করার অধিকার পেয়েছিল, এবারে তার টাকা ওড়াবার অধিকারও তারা পেয়েছে যে। এই যে তারা "পাবে" আসে, সেটা কেন? পুরুষের মত আড্ডা জমাতে তারাও শিখে গিয়েছে।'

আমি শুধালুম, 'বাড়িতে মদ খাওয়া তো অনেক সস্তা!'

বুড়ি আনমনে বললেন, 'অনেক। কিন্তু বাড়িতে আমার আর কে আছে? কর্তা তো আগেই গেছেন। ছেলেটাও ফ্রান্সের আণ্ডার গ্রাউণ্ডে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হল।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—গলায় নেশার চিহ্নমাত্র নেই—'কিন্তু জানেন, আমি তার আশা এখনো ছাড়তে পারিনি। হঠাৎ পেছনে থেকে শুনতে পাবো "মা"।'

শেষে ঘুম ভাঙতেই শুনি, পাশের বাড়ির লক্ষ্মীছাড়া রেডিয়োটা 'ধর্মসঙ্গীত' গাইছে।

মনে করো শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি নিরুত্তর।

কোথায় ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রসন্নমনে জানলা দিয়ে সবুজ গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সবুজ প্রাণশক্তি আহরণ করব, তা না, তখন স্মরণ করিয়ে দিলে শেষের দিনের কথা। ঘুম ত এক রকমের মৃত্যু, সেই মৃত্যুর থেকে উঠে শুনতে হয় বিভীষিকাময় আরেক মৃত্যুর কথা—তাও বিট্‌কেল 'গানে গানে'!

এখানে সকালবেলা খাটের পাশে রেডিয়োটা চালিয়ে দিই আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী শোনার জন্য। এ-দেশে সেটা জানার বড্ডই প্রয়োজন। বৃষ্টি হলেই গেছি—বুড়ো হাড় নিয়ে রাস্তাঘাটে ফ্লু, নিউমোনিয়া কুড়োতে ভয় করে। রোদের সামান্যতম আশা পেলে মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

এ-দেশের আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী...

দেশে এখনও আবহাওয়া যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ করার মত ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দফতর নেই বলে প্রায়ই ভবিষ্যৎবাণী করতে পার না। আমরা কিন্তু এখন বিলেতে মোটামুটি পারি।'

এর পরীক্ষা হাতেনাতে হয়ে গেল।

একদিন ঘুম দেরিতে ভাঙায় বেতার-রিপোর্টটা শুনতে পাইনি। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বাড়ির বুড়ি ঝিয়ের সঙ্গে দেখা—তার এক হাতে ভ্যাকুয়াম ক্লীনার অন্য হাতে বালতি। শুধালাম, 'বেতারে আবহাওয়ার বাণী কিছু শুনেছ?'

একগাল হেসে বললে, 'এবারে যা আবহাওয়া—' বলে সেই "পাবের' বুড়ির মত অনেক কথাই বললে—ইস্তেক এটম বম্ যে এ-সব গড়বড়ের প্রধান কারণ সেটা বলতেও ভুলল না।

সর্বশেষে বললে, 'যেন সব-কিছু যথেষ্ট বরবাদ হয়নি বলে শেষমেষ এলেন ঝড়, 'গেল্'! ওঃ তার কী দাপট!'

আমি শুধালাম, 'আবহাওয়া দফতর সতর্ক করেনি, ওয়ার্নিং দেয়নি?'

গম্ভীরভাবে বললে, 'ইয়েস, সার, আফটারওয়াডস, ঝড়ের পরে দিয়েছিল।'

রসবোধ আছে বৈকি।

কিন্তু মোদ্দা কথায় ফিরে যাই। আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করার পূর্বে বেতারে হয় ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা উপাসনা। সাতসকালে ওটাও সেই 'অন্যলোকে কবে কথা তুমি রবে নিরুত্তর' গোছ। কিন্তু পাছে আবহাওয়া মিস্ করি তাই সেটা শুনতে হত।

সর্বপ্রথম যেটা কানে ঠেকে সেটা পাদরী সায়েবের ভাষা।

একদা ধর্ম প্রভাব করতো সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত তাবৎ রসপ্রকাশ-প্রচেষ্টাকে—এখনোও করে। একথা ফলাও করে বোঝাবার কিছুমাত্র দরকার নেই—কারণ বহু শতাব্দী ধরে

রিলিজিয়াস আর্টের সাধনা করার পর মানুষ এই সবে সেকুলার আর্ট আরম্ভ করেছে।

এখন আরম্ভ হয়েছে উল্টো টান। এখন ধর্মযাজকরা আপন-আপন ভাষা সরল, প্রাঞ্জল, ওজস্বিনী, মর্মস্পর্শী করার জন্য ধর্ম-নিরপেক্ষ সাহিত্য থেকে বচন-ভঙ্গী ধার নিচ্ছেন। আজকের দিনের জীবন যে চরম মূল্যে বিশ্বাস হারিয়ে দেউলে হয়ে গিয়েছে তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে এক পাদরী সায়েব যখন ভোরবেলা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন আমার কেমন যেন আবছা-আবছা মনে পড়তে লাগল, কোথায় যেন এটা পড়েছি। তারই সন্ধানে যখন আমার মন আর স্মৃতিশক্তি লুকোচুরি খেলছে তখন, ও হরি, পাদরী সায়েবই মাইকের উপর হাঁড়ি ফাটালেন। বললেন, 'আজকের দিনের দুনিয়া দেউলে ; সর্বভুবন এখন এক বিরাট 'ওয়েস্টল্যাণ্ড'।'

কবিতাটি আমি মাত্র একবার পড়েছি, তাও বহু বৎসর পূর্বে এবং সেও খামচে খামচে, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে স্কিপ্ করে করে, কারণ ও-কবিতায় একাধিক ভাষার যে জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে ভাষা-শেখাতে-অগা এক-ভাষা-নিষ্ঠ (মনোগ্লট্) ইংরেজকে তাক লাগাবার কিশোরসুলভ প্রচেষ্টা আছে, তা দেখে আমি বে-এক্তেয়ার হব কেন—আমি ত এ সব-কটা ভাষা এলিয়টের মতই বিলক্ষণ মিসাণ্ডারস্টেণ্ড করতে পারি।[১] কাজেই কবিতাটি স্মরণ করতে যদি সময় লেগে থাকে তাহলে আশা করি, যাঁদের কাছে ঐ 'কবিতা' রামায়ণ মহাভারতের চেয়েও প্রণম্য তাঁরা অপরাধ নেবেন না।

ইংলণ্ডের প্রার্থনার কথা ওঠাতে যদি ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে এস্থলে কিঞ্চিৎ বাক্যবিন্যাস করি তবে, বিবেচনা করি, সেটা নিতান্ত

(১) "···they are simply the kind of thing that goes on in the head of a troubled man who has drunk at the best universities and is half-drugged with literature, who has studied a little Sanskrit at Harvard and done a certain amount of travelling in Europe······" E. Wilson.

বেখাপ্পা শোনাবে না, এবং সে-বাসনা যে আমার কিঞ্চিৎ আছেও, সেটা অস্বীকার করব না, কিন্তু তাহলে মূল বক্তব্য থেকে অনেকখানি দূরে চলে যাব বলে পাঠক হয়ত ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন। তাই শুধু এই প্রশ্নই শুধাই, ভোরবেলার পাদরী সায়েব বেছে বেছে আমাদের এলিয়ট সাহেবকেই স্মরণ করলেন কেন?

মার্কিন মুলুকের লেখককে ইংরেজ সহজে কল্কে দেয় না কাজেই এই কল্কে পাওয়ার জন্য এলিয়টকে বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বহু জায়গায় বিস্তর কল্কে পাওয়ার পর ইংলণ্ডের কনসারভেটিভ পার্টিতেও তজাতে ওঠবার জন্য তিনি লিখলেন "দি লিটারেচার অব পলিটিক্স" —"টি এস্ এলিয়ট ও এম কর্তৃক লিখিত, রাইট অনরেবল স্যর এন্টনি ঈডন, কে জি; এম সি; এম্ পি কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত"। এরকম ব্যাপার যে ইংলণ্ডে হতে পারে আমি জানতুম না। আজ যদি শ্রদ্ধেয় পরশুরাম "শ্রীরাজশেখর বসু রায়সাহেব কর্তৃক লিখিত এবং শ্রীযুত ভূতনাথ ভড় রায়বাহাদুর, বিধানসভার সদস্য, কাইসার-ই হিন্দ দ্বিতীয় শ্রেণী মেডলপ্রাপ্ত কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত" পুস্তক প্রকাশ করেন তবে যে-রকম বিস্মিত এবং বিরক্ত হব। সাহিত্যজগতে (এলিয়ট যে পলিটিশিয়ান নন, সে সবাই জানে) তিনি তার ও, এম উপাধিটি উল্লেখ করতে ভুললেন না, আর ঈডন ত সালঙ্কার থাকবেনই। মুসলমান বলে আমি ঠিক বলতে পারবো না, তবে অনুমান করি চাঁড়াল যদি পৈতে পেয়ে যায়, (স্বগুণেই বলছি) তবে বোধ হয় সে সেটা সর্বক্ষণ মাথায় জড়িয়ে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। আশা করি, এর পর যখন বাঙলার সাহিত্যিকরা রাজনীতিকদের দাওয়াত করে, সভাপতি বানিয়ে, তাদের দিয়ে সাহিত্য অথবা সাহিত্যিকদের চরিত্রের আনাড়ি সমালোচনা করাবেন, তখন শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ অনাদৃত খাঁটি সাহিত্যিকরা অহেতুক উষ্ণ-গোস্‌সা প্রদর্শন করবেন না। এঁদের গুরুঠাকুর

মহামান্যবর এলিয়ট সাহেব—এঁরা তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন মাত্র।

সাহিত্যজগতে কল্কে পেয়েই এলিয়ট সন্তুষ্ট নন। তিনি আরও বহু কল্কে বহু জায়গায় পেয়েছেন।[১] কিন্তু ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ কল্কে ধর্মচক্রে—কে না জানে সে দেশের রাজা বা রানীর অন্যতম জাঁদরেল উপাধি 'ডিফেণ্ডার অব ফেৎ'? স্বয়ং পোপ ইটি অষ্টম হেনরিকে দিয়েছিলেন। সেখানে কল্কে পাওয়া চাই-ই-চাই।

এলিয়ট তাঁর ধর্মবিশ্বাস পরিষ্কার ভাষাতেই প্রকাশ করেছেন—সেটা তাঁর কবিতার মত তেষট্টি রকমে বোঝা এবং বোঝান যায় না, এই রক্ষে। পাস্কাল্ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'ধর্মগুলোর ভিতর খ্রীষ্টধর্ম, এবং তার ভিতরে ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মই জগৎ এবং বিশেষ করে অধ্যাত্মজগতের সমস্যা এবং কার্য-কারণ সর্বোত্তম ভাবে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে ('টু অ্যাকাউন্ট্ মোস্ট্ সেটিসফেকটরিলি ফর দি ওয়ার্লড অ্যাণ্ড স্পেশালি দি মরাল ওয়ার্ল্ড উইদিন')। যীশুখ্রীষ্ট যে জলকে মদ্যরূপে পরিবর্তিত করেছিলেন, 'মৃতজনে প্রাণ' দিয়েছিলেন এসব অলৌকিক কার্যকলাপে তিনি বিশ্বাস করেন।[২] তিনি অ্যাংলো ক্যাথলিক গির্জায় (বিলাতের

(১) "Who is who"-তে আছে D. Litt of Oxford : a Litt. D. of Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Bristol, Leeds and Washington ; an LLD. of Edinburgh and St. Andrews ; a D. es L. of Paris ; Aix-Marseille, and Rennes ; a D. Phil of Munich ; an Honorary Fellow of Merton College and of Magdalene College, an officer de la Legion d' Honneur ; and a Foreign Member of the Accademia dei Lincei of Rome.

এ ছাড়া নবেল প্রাইজ ত আছেই।

(২) এ বাবদে বার্নার্ড শ'র ধারণা (ব্ল্যাকগার্ল) তুলনীয়। তিনি খ্রীষ্টকে 'ক্লেভার কনজিয়োরার' বা 'ঘড়েল ম্যাজিশিয়ান' বলে উল্লেখ করেছেন। রামমোহন রায় খ্রীষ্টের মহত্ত্ব স্বীকার করেও তাঁর অলৌকিক কার্য-কলাপে (মিরাক্ল্) বিশ্বাস করতেন না বলে পাদরী বন্ধুগণ কর্তৃক বর্জিত হন।

সরকারি, রাজারানীর প্রতিষ্ঠান) গিয়ে পূজোপাট করেন, মন্ত্রপুত রুটি এবং মদের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সঙ্গে অশরীরীভাবে 'হরিহরাত্মা' হন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাতে কারও কোনও আপত্তি থাকার নয়। আমাদের মডার্ন কবিরাও হয়ত ইতু ঘেঁচুর পূজো করেন, নজরুল ইসলাম আজ যদি মোল্লার কাছ থেকে পানি-পড়া তাবিজ-কবজ নিয়ে ব্যামো সারাতে চান তবে আমরা উল্লাসই অনুভব করব—ডাক্তার-কবরেজ ত হার মেনেছেন—কিন্তু এ-বাবদে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই উদয় হয়।

গোঁড়া ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করেন, অ-খ্রীষ্টানরা অনন্ত নরকের আগুনে জ্বলবে। গোঁড়া মুসলমানরা অতখানি ঠিক করেন না—তাঁদের মতে কোনও অনৈসলামিক ধর্মের মূলতত্ত্ব (ফাণ্ডামেণ্টলস্) যদি ইসলামের সঙ্গে মেলে তবে সে-ধর্মের লোক স্বর্গে না গেলেও অনন্ত নরকে জ্বলবে না। এখন প্রশ্ন এলিয়ট কি বিশ্বাস করেন, তাঁর বাঙালী হিন্দুমুসলমান চেলারা অনন্ত নরকের আগুনে রোস্ট মটন্ কিংবা তন্দুরী মুর্গী ভাজা হবে? যাঁরা তাঁর সঙ্গরস পেয়েছেন তাঁরা যদি বাৎলে দেন, তবে উপকৃত হব।

কিন্তু ইহুদীদের সম্বন্ধে এলিয়ট তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। পাঠক স্মরণ রাখবেন, ইহুদির ধর্মগ্রন্থ 'প্রাচীন নিয়ম' (ওল্ড টেস্টামেণ্ট) খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থও বটে এবং খ্রীষ্টানদের একেশ্বরবাদ, প্রতিমাবর্জন, স্বর্গনরক, শেষ বিচার, গির্জার প্রার্থনা-পদ্ধতি ইহুদীদের কাছ থেকে নেওয়া, এবং সবচেয়ে বড় কথা স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট ইহুদী-সন্তান—মথিলিখিত সুসমাচারে আরম্ভই যীশুর কুলজি নিয়ে; তিনি ইহুদীদের বংশপিতা আব্রাহামের (ইব্রাহিমের) বংশধর।

এলিয়ট আদর্শ সমাজব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, 'যে সে আদর্শ সমাজে 'রক্ত ও ধর্ম' এই দু'য়ে মিলে মুক্তচিন্তাশীল ইহুদীদের (আদর্শ সমাজে) বেশী সংখ্যায় থাকা অবাঞ্ছনীয়।'

(Reasons of race and religion combine to make any large number of free-thinking Jews undesirable)

সোজা বাঙলায় প্রকাশ করতে গেলে দাঁড়ায় :—যেমন মনে করুন রবীন্দ্রনাথ যদি বলে যেতেন, 'পার্সীদের ধর্ম এবং রক্ত আলাদা (এবং এটাও লক্ষণীয় যে, ইহুদী ও পার্সী উভয় সম্প্রদায়ই বিত্তশালী) ; এ দু'য়ে মিলে গিয়ে এমনই এক বিপর্যয় ঘটেছে যে এদের থেকে বেশী লোক ভারতীয় সমাজে থাকুক এটা বাঞ্ছনীয় নয়।'!!!

অ্যান্টনি ঈডনের ভূমিকাসম্বলিত এলিয়টের যে 'লিটরেচার অব্ পলিটিক্স্' বইয়ের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তাতে এলিয়ট চারজন কন্‌সারভেটিভ সাহিত্যিকের উল্লেখ করেন ; বলিংব্রুক্, বার্ক, কোল্‌রিজ্ এবং ডিজ্‌রেলি। ডিজ্‌রেলির কথা বলতে গিয়ে এলিয়ট বলছেন, 'হ্যাঁ, ইনি (এখানে বোধ হয় এলিয়ট একটু থেমে গিয়ে মৃদু গলাখাঁকরি দিয়েছিলেন) একটা সাদামাটা পাশ পেতে পারেন মাত্র ; আমি অবশ্য গির্জার সদস্য গ্লাডস্টনকেই পছন্দ করি বেশী।'

সমালোচক উইলসন কাষ্ঠহাসি হেসে এস্থলে বলছেন, 'হ্যাঁ, একজন মুক্তচিন্তাশীল ইহুদী চললেও চলতে পারে, অবশ্য তিনি যদি কনসারভেটিভের স্বার্থে কাজ করেন।'

অনেকটা রবিঠাকুর যেন বলছেন, 'নৌরজী চললেও চলতে পারেন ; আমি কিন্তু গোঁড়া টিলককেই পছন্দ করি।'

এ-আলোচনা উঠেছিল যখন বিবিসি দর্শনে যাই—হাজার হোক এ-জীবনের চারটি বছর দিশী বেতারে নষ্ট করেছি ত !

পারশ্যে প্রখ্যাত কবি মুশর্‌রফ্‌ উদ্দীন বিন্‌ মুস্‌লিহ্‌ উদ্দীন শেখ সাদীকে একদিন দেখা গেল ভর সন্ধেবেলা গোরস্তানের দেউড়ির সামনে। এ সময়টা মৃতের সদ্গতি-প্রত্যাশাকামী উপাসনার জন্য প্রশস্ত নয়; তাই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কবির এক বন্ধু তাঁকে দেখতে পেয়ে শুধালেন, 'অবেলায় এখানে কি করছেন, শেখ সায়েব?' দীর্ঘ দাড়ি দুলিয়ে, দীর্ঘতর নিশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ বললেন, 'আর বলো না ভাই, গেরো, গেরো। জানো তো অমুককে। আমার কাছ থেকে একশ' তুমান ধার নিয়েছিল বছরটাক হয়ে গেল। ফেরৎ পাইনে। পাড়ায় পাড়ায় খেদিয়ে বেড়িয়েও তাকে ধরতে পাইনে। তখন আমার এক গুরুভাই আমাকে পরামর্শ দিয়েছে এখানে এসে অপেক্ষা করতে। গোরস্তানে নাকি সবাইকে একদিন আসতে হয়।'

বিবিসি লণ্ডন তথা ইংলণ্ড, এমন কি লণ্ডনাগত বিদেশী গুণী-জ্ঞানীর জ্যান্ত গোরস্তান। গাইয়ে, বাজিয়ে, নাট্যকার, বক্তৃতাবাজ, পাহাড়-চড়নে-ওলা, চোরের সেরা, ডাকাতের-বাড়া (এরাও ইণ্টারভু দেয়) হেন প্রাণী নেই যে এখানে একদিন না একদিন না-আসে।

আমার জন্মভূমি সোনার দেশ ভারতবর্ষে অবশ্য ভিন্ন ব্যবস্থা। তার সম্বন্ধে অন্য গল্প আছে। সেটা কিন্তু বাজারে চালু হয়নি। 'আকাশবাণীতে' সামান্য যেটুকু প্রোগ্রাম পায় তাও কাটা যাবার ভয়ে সে গল্পটি কেউ বলতে চায় না, শুনলেও ভুলে যেতে চায়।

এটম্‌ বম্‌ পড়লে কি কি কাণ্ড হতে পারে তারই রগরগে বর্ণনা শুনে এক নিরীহ বঙ্গসন্তান তার বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে শুধালে, 'এ সব কি সত্যি?'

'এক দম্! বরঞ্চ কমিয়ে সমিয়ে বলেছে।'

'তা হলে উপায়? দূরদূরান্তে, লড়াইয়ের আওতার বাইরে কোনো নির্জন দ্বীপে চলে গেলে হয় না?'

'হয়। কিন্তু এদেশের সরকার এটম বমের বিরুদ্ধে উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। বম ফাটার সম্ভাবনা দেখলেই, আকাশবাণীর কোনো স্টুডিয়োতে ঢুকে পড়ো। সেখানে কোনো রেডিয়ো-এ্যাক্‌টিভিটি নেই।'

আমি অবশ্য মৌলানা সাদীর মত দেনাদারকে পাকড়াবার জন্য বিবিসিতে যাইনি। আমি গিয়েছিলুম আপন ঋণ শোধ করতে। পূর্বেই বলেছি, একদা আমি বেতারে বাঁধা ছিলুম। সে সুবাদে দু'একজন কর্মীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এমন কি দহরম-মহরম হয়। দেশে নিষ্কর্মা বিবেচিত হওয়ার পর বিবিসি এদের লুফে নিয়েছে—পাড়ার মেধো ওপাড়ার মধুসূদন তুচ্ছার্থে বলা হয়, এখানে কিন্তু সত্যই।

জর্মনির জন্য বিবিসি যে জর্মন প্রোগ্রাম করে তারই বড় কর্তা আসলে ভিয়েনাবাসী জর্মনভাষী ডঃ ভল্‌ফের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে আমাদের সিন্‌হা (আসলে সাদামাটা কায়েতের পো 'সিঙ্গি', নিতান্ত সম্মানার্থে 'সিংহ', কিন্তু ছোকরা হামেশাই একটু সায়েবী ঘেঁষা ছিল বলে আমরা বাঙলাতে কথা কইবার সময়ও 'সিন্‌হা' বলতুম)। লোকটি অসাধারণ পণ্ডিত এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর দৈনন্দিন সর্ব সমস্যা সম্বন্ধে অহরহ সচেতন। এ সমন্বয় সচরাচর চোখে পড়ে না।

আশ কথা পাশ কথার পর আমিই বললুম, বিবিসির জর্মন কর্মচারীদের উচ্চারণ জর্মনি থেকে সম্প্রসারিত খাস জর্মন বেতার বাণীর চেয়ে ভালো। প্রিয় অসত্য আমি যে একেবারেই বলিনে তা নয়, কিন্তু প্রিয় সত্য বলবার সুযোগ পেলে আত্মপ্রসাদ হয় ঢের ঢের বেশী।

হিটলার বরিশালের লোক। অর্থাৎ বরিশালের লোক কলকাতার ভাষা বলতে গেলে যে রকম তার কথায় আড় থেকে যায়, হিটলারের পোশাকী জর্মনে তেমনি শুধু আড় নয়, তাঁর জন্ম-ভূমি অষ্ট্রীয় উপভাষার বোটকা গন্ধ পাওয়া যেত। হিটলার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো যান নি, শিক্ষিত আচার্য পণ্ডিতদের তিনি ছ'চোক্ষে দেখতে পারতেন না, তদুপরি নূতন ভাষা শেখা বাবদে তিনি ছিলেন ষোল আনা অগা। (মুসসোলীনি চমৎকার জর্মন বলতে পারতেন এবং একমাত্র তাঁর সঙ্গেই কথা কইতে তাঁর দোভাষীর প্রয়োজন হ'ত না। ওদিকে আবার স্তালিনের রুশ উচ্চারণে ককে-সাসের গুরুভার ছিল বলে তিনি লেকচরবাজী করতে ভালো-বাসতেন না কিন্তু এৎস্কি ছিলেন বহু ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত। কাজেই এসব উল্টোপাল্টা নমুনা থেকে আমি কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পারিনি।) হিটলার যখন রাজ-রাজেশ্বর হয়ে গেলেন তখন যে তাঁর চেলাচামুণ্ডারা শুধু তাঁর উচ্চারণ নকল করতে আরম্ভ করলেন তাই নয়, তাঁরই মত কর্কশ গলায় (হিটলার টন্‌সিলে ভুগতেন) দাবড়ে দাবড়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন—এক গ্যোবেল্‌স্ ছাড়া। জর্মনির খানদানী শিক্ষিত পরিবারে যে ঋজু, স্বচ্ছ, চাঁচা-ছোলা উচ্চারণ প্রচলিত ছিল, অধ্যাপকরা যে ভাষায় কথা বলতেন, থিয়েটার অপেরাতে যে উচ্চারণ আদর্শ বলে ধরা হত, সেটা প্রায় লোপ পাবার উপক্রম করলো। যুদ্ধ লাগার পূর্বে এবং পরে যারা লণ্ডনে পালিয়ে গিয়ে বিবিসির জর্মন সেকশনের ভার নিলো তারা প্রধানতঃ ঐ সব শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। আজকের দিনে যারা বিবিসিতে জর্মন বলে তারা ওদেরই ঐতিহ্যে চলে। ওদিকে যদিও জর্মনরা হিটলারী রাজত্বের বারো বৎসরের দুঃস্বপ্ন যত তাড়াতাড়ি পারে ভুলে যেতে চায় তবু পুরনো দিনের অভ্যেস অত সহজে যাবে কেন?

তাই বিবিসির জর্মন উচ্চারণ এখন খাস জর্মনির চেয়ে খানদানী।

অভ্যাস যে সহজে যেতে চায় না তার উদাহরণ যত্রতত্র সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। বাঙলা দেশ থেকেই তার একটা অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে আরম্ভ করি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এদেশে কাপড়ের কি অনটন পড়েছিল সে-কথা আমরা ভুলিনি। তারই ফলে পাঞ্জাবির ঝুল কমে কমে প্রায় গেঞ্জির মত কোমরে উঠে গিয়েছিল। তারপর লড়াই শেষ হওয়ার পর যখন বাজারে আর আদ্দির অভাব রইল না, তখনো কিন্তু ঝুল আর নামে না। ইতি-মধ্যে ঐটেই হয়ে গিয়েছে ফ্যাশান।

ইংলণ্ডেও তাই। সেই যে যুদ্ধের সময় কাপড়ের অভাবে মেয়েরা অল্প ঘেরের স্কার্ট বানাতে বাধ্য হয়েছিল আজ সেটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং তার ঘের এতই মারাত্মক রকমের অল্প যে বাসের পাদানিতে পা তোলা যায় না। বাসের হ্যাণ্ডিল ধরে মেম-সায়েবদের লাফ দিয়ে এক সঙ্গে দু'পা তুলে বাসে উঠতে হয়। আমারই চোখের সামনে একদিন একটা কেলেঙ্কারি হয়ে গেল। একটি 'ফুল্ স্লিম' (আজকাল 'মোটা' বলা অসভ্যতা—সেটা 'সংস্কৃত' পদ্ধতিতে 'ফুল্-স্লিম্' বলাটা যে আইনস্টাইন আবিষ্কার করেছেন তাঁকে বার বার নমস্কার।) মহিলা বাসে উঠতে গিয়ে লাফ না দিয়ে পুরুষদের মত পা তুলতেই চড় চড় করে স্কার্টটি প্রায় ইস্-পার উস্-পার।

যাদের কম ঘেরের লুঙ্গি পরার অভ্যাস আছে তাদের নিশ্চয়ই এ অভিজ্ঞতাটি একাধিকবার হয়েছে—প্রধানত লুঙ্গীর বার্ধক্যে।

ঘটনাটা নিত্যি নিত্যি এ-দেশে হয় কি না বলতে পারবো না, কারণ যে কটি লোক কাণ্ডটা দেখলে তারা মৃদু হাস্য করা দূরে থাক, তাদের নয়নের উদাস দৃষ্টি যেন সঙ্গে সঙ্গে উদাসতর হয়ে গেল। আমিও ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ শহুরে হয়ে গিয়েছি। মাথা নিচু করে গভীর মনোযোগ সহকারে খবরের কাগজে বভরিলের বিজ্ঞাপন -- বিজ্ঞাপন তো বিজ্ঞাপনই সই—পড়তে লাগলুম।

ঘটনাটি প্রচুর 'ধ্বনি' ও ব্যঞ্জনা সহকারে এক ইংরেজ বন্ধুকে যখন বাখানিয়া বললুম, তখন তিনি বললেন, 'কেন, এ ব্যাপার তো এখন ক্লাসিক্‌সের পর্যায়ে উঠে গেছে। শোনো। এক কক্‌নি আর এক কক্‌নিকে উপদেশ দিচ্ছে, মিলের শেয়ার না কিনতে। "কি হবে কিনে? কাপড়ের এখন আর কতখানি প্রয়োজন? এই দেখ না, আমি আমার স্ত্রীর গেল বছরের স্কার্ট দিয়ে নেকটাই বানিয়েছি, আর তিনি আমার গেল বছরের টাই দিয়ে এ বছরের স্কার্ট বানিয়েছেন।"

কিন্তু এহ বাহ্য। এসব জিনিস দিয়ে ইংরেজ চরিত্রের অদল-বদল হয়েছে কি না সে কথা বলা অসম্ভব না হলেও কঠিন। এক মার্কিন সেপাই যুদ্ধের সময় বাঙলা দেশের ভিতর দিয়ে যাবার সময় দেখে, যেখানেই পুকুর কাটা হয়েছে সেখানেই পুকুরের মাঝখানে মাটির কোনিকাল থাম রাখা হয়েছে—আসলে এটা কতখানি মাটি কাটা হয়েছে তার মাপ রাখবার জন্য এবং মাটি-কাটাদের মজুরী চুকিয়ে দেবার পর এ থামগুলোও কেটে ফেলা হয়—কিন্তু মার্কিন তার ভ্রমণ কাহিনীতে লিখলে, 'বাঙলা দেশের লোকই সব চেয়ে বেশী শিবলিঙ্গ পূজো করে। এন্তের পয়সা খরচ করে বিরাট বিরাট পুকুর খুঁড়ে মাঝখানে শিবলিঙ্গ স্থাপনা করে।'

এটা শুনে আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। না হলে ক্লিয়োপাত্রার নীড্‌ল্ (অবিলিস্ক) ইয়োরোপে যে সম্মানের সঙ্গে রাখা হয়েছে তার থেকে মীমাংসা করে আমিও বলে দিতাম, ইয়োরোপেও লিঙ্গ-পূজা হয়।

যতই খবরের কাগজ পড়ি, রেডিয়ো শুনি, টেলিভিজন্ দেখি, 'পাবে' কথাবার্তা কই, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে লঞ্চ-ডিনার খাই, মোটরে করে গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে যাই, ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে অবরে সবরে রসালাপ করি (তার সুযোগ বিস্তর, কারণ ট্রাফিক জামের ঠেলায়

ঘাটে ঘাটে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়) বাঁকা নয়নে সব কিছু দেখি, খাড়া কানে অধর্মাচরণে অন্য লোকের কথাবার্তা শুনি ততই মনে হয়, সেই পুরনো ফরাসী প্রবাদ, প্ল্যু সা শাঁজ, প্ল্যু সে লা মেম্ শোজ (দি মোর ইট চেঞ্জেস, দি মোর ইট ইজ দি সেম্ থিং), খোল নলচে বদলেও সেই পুরনো হুঁকো।

এই যে জর্মনির হাতে ইংরেজ বেধড়ক বম্ খেল, কই, কথায় কথায় তো জর্মনিকে কটুকাটব্য করে না; দু' এক জায়গায় যে কালোয়-ধলায় মারামারি হচ্ছে, কই সাধারণ ইংরেজ তো সাদার পিছনে দাঁড়ায়নি, উল্টে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, এমন কি শুনতে পেলুম পার্লিমেণ্টে নাকি কে যেন বিল আনবেন, যে সব হোটেল-গুলো কালো-ধলায় ফারাক করে তাদের সায়েস্তা করবার জন্য; নানা প্রকার আমদানী রপ্তানীর উপর যদিও বাধ্য হয়ে কিছু কিছু আইন কাম্নুন জারি করতে হচ্ছে তবু তো ইংরেজ আরো কয়েকটা জাত নিয়ে একটা 'খোলা বাজার' তৈরী করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে। ত্রিশ বছর আগেও মনে হয়েছে, এখনো মনে হলো, ইংলণ্ডে কনসার-ভেটিভও লিব্রেল, লেবারও লিব্রেল হয়ে গিয়েছে। তাই বোধ হয় খাস লিব্রেল দলের জেল্লাই সেখানে কমে গিয়েছে। যে দেশের সবাই ভাত খায় সেখানে তো আর ভাতখেকোদের আলাদা হোটেল হয় না।

তাই তাজ্জব মানি, এ্যালেয়ট এত অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন কি করে?

সিন্হা না ভলফ শুধিয়েছিলেন সে কথাটা মনে নেই।

আজ যখন এ্যারোপ্লেনে করে অষ্টপ্রহরই অষ্টপ্রহরে কলকাতা থেকে লণ্ডনে যেতে পারি, প্যারিসের লোক আর কয়েকদিনের ভিতরেই দেশে খাবে ব্রেকফাস্ট—নিউ ইয়র্কে খাবে লাঞ্চ, সর্বদেশের ভৌগোলিক গণ্ডি যায় যায়, শঙ্কর দর্শন আলোচনা করতে হলে প্লাতোর উল্লেখ না করলে সমালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, ক্রোচের

সমালোচনায় অভিনব গুপ্তের নামোল্লেখ অভিনব বলে মনে হয় না, লণ্ডন পৌণ্ডের দাম কমালে আর পাঁচটা দেশ পড়িমরি হয়ে সেই কর্ম করে, জর্মনিতে নতুন দাওয়াই বেরলে সেটা কলকাতার কালোবাজারে ঢোকে সাত দিনের ভিতর, বিলিতি ফিল্মের 'মরমিয়া' কেঁই কেঁই সুরের দিশী ভেজাল 'হণ্টরওয়ালীতে' শোনা যায় পক্ষাধিক কালে, তখন শুনতে হবে খৃষ্টধর্মের, একমাত্র খৃষ্টধর্মের, তাও চর্চ অব ইংলণ্ডের খৃষ্ট-ধর্মের জয়গান? সেইটে বরণ না করলে পৃথিবীর আদর্শ সমাজে আমাদের স্থান নেই? কারণ এলিয়ট অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'আমাকে যদি ধর্মান্ধ বলা হয় তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যদি খৃষ্টীয় সমাজই চাও তবে তাতে মেলা স্বাধীন পন্থা, স্বাধীন মতবাদের ঝামেলা লাগালে চলবে না (ইউ ক্যানোট এলাও কনজেরীজ অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট সেক্‌টস্)। ইংলণ্ডের নৈতিক পন্থা এবং বৈদেশিক নীতি ঠিক করে দেবে চার্চই।' আর তার আদর্শ রাষ্ট্রে ইহুদিদের সংখ্যা যে অতিশয় সীমাবদ্ধ থাকবে সে কথা তো পূর্বেই নিবেদন করেছি। (এখানে বলে দেওয়া ভালো আমি পাপী, সে আদর্শ সমাজে স্থান চাইনে; আমি শুধু তাঁর বাঙালী শিষ্যদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলুম।)

আমি তো আশা করেছিলুম, ভৌগোলিক গণ্ডি যখন জেরিকোর দেয়ালের মত ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে তখন শিক্ষিত মানুষ সেই ধর্মেরই অনুসন্ধান করবে যে ধর্ম তার 'বিরাট বাহু মেলে' সবাইকে আলিঙ্গন করতে চায়। আমার তো মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ডে 'মানবধর্মের' জয়গান গেয়েছিলেন তখন তিনি বলদের সামনে বেদপাঠ কিম্বা মোষের সামনে বীণা বাজাননি।

'ইংরেজের বাড়ি, হিন্দুর শাড়ি, মুসমানের হাঁড়ি'—অর্থাৎ ইংরেজ বাড়িঘর ছিমছাম রাখে, হিন্দু মেয়েরা জামা-কাপড় (বিশেষ করে গয়না-গাটি) পরে ভালো, আর মুসলমানের কুল্লে পয়লা যায় তার হাঁড়িতে, উত্তম আহারাদি করে তার দিন কাটে। তাই সিব্রামদা একদিন আপন মনে প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন, 'মুসলমানদের ভিতর এত শিক্ষাভাব কেন?' তারপর আপন মনেই উত্তর দিয়েছেন, 'যেখানে শিক্-কাবাব বেশী সেখানে শিক্ষাভাব তো হবেই।'

বিবিসির অন্যতম বাঙালী মুসলমান কর্মী আমাকে বার্টাণ্ড রাসেলের দর্শন সম্বন্ধে প্রশ্ন শোধাননি জর্মন প্রেসিডেণ্ট হয়েসের আসন্ন লণ্ডনাগমনের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমার সুপক্ক মতামত জানতে চাননি, এমনকি ইংরেজ নারীর নমনীয়তা কমনীয়তা সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন। আমাকে শুধালেন, 'আহারাদি?'

আমি বললুম, 'ইংরেজের তো বাড়ি; দুনিয়ার "হাঁড়ির খবর" রেখেও তার হাঁড়ি শূন্যই থেকে গেছে।'

তারপর বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে জর্মন অধ্যাপকদের বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গীতে আরম্ভ করলুম, 'নরমানরা আলবিয়ন ভূমি জয় করার ফলে ধর্ম, রাজনীতি তথা সাহিত্যজগতে যেসব বহুবিধ ঘূর্ণিবাত্যা, ভূমিকম্প, প্লাবনান্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বহুতর পুস্তক, সংখ্যাতীত প্রবন্ধ এবং ভুরি ভুরি গবেষণামূলক কোষ লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু ওহো হতোস্মি, ইহলোক পরলোক উভয় লোকের সঙ্গমভূমি এই যে উদর (পিতৃলোকের একমাত্র কাম্য পিণ্ড, এ তথ্য কুলাঙ্গারও স্মরণ রাখে।) তদ্বিষয়ে অতিশয় যৎসামান্য স্মৃতিশ্রুতি বর্তমান। পরম মনস্তাপের বিষয় অদ্যাবধি আলবিয়ন ভূমির

শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এই সর্বোত্তম সনাতন মার্গ সম্বন্ধে সম্যক সংবিদিত হয়নি।'

কর্মী বললেন, 'বাংলা অভিধান হাতের কাছে নেই।'

ত্রিতাল থেকে একতালে যাওয়া অশাস্ত্রীয়। কিন্তু শাস্ত্র মেনে কি হবে? পূর্বেই নিবেদন করেছি, রবীন্দ্রনাথের সর্বশাস্ত্রসম্মত 'মানবধর্ম' শ্বেতভূমিতে অনাদৃত।

আমি বললুম, 'নরমানরা আসার পূর্বে এদেশের লোক বোধহয় কাঁচা মাংস খেত। এই দেখুন জ্যান্ত ভেড়ার নাম ইংরিজিতে 'শীপ', তার মাংস রান্না করে খেতে হলে সেটা হয়ে যায় 'মটন'। 'শীপ' শব্দ খাস ইংরিজি, 'মটন' শব্দ ফরাসী, নরমান যা খুশী বলতে পারেন; 'কাউ' ইংরিজি কিন্তু খেতে হলে (তোবা, তোবা!) ফরাসী শব্দ বীফ; 'কাফ' ইংরিজি কিন্তু খেতে হলে ফরাসী শব্দ 'ভীল'; ঠিক সেইরকম 'সুয়াইন' ইংরিজি কিন্তু খেতে হলে (রাম রাম!) ফরাসী শব্দ 'পোর্ক'; ইংরিজি 'ডিয়ার' ফরাসী 'ভেনজন' ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কি যেসব রসবস্তু দিয়ে এগুলোকে সুস্বাদু করা হয়, যথা 'সস', 'সেভারি, 'ভিনিগার', 'মায়োনেজ', সেগুলোও ফরাসী শব্দ। খাবার 'মেনু' ফরাসী; তার প্রধান প্রধান ভাগ 'অরদ্যভ্র' (অবতরণিকা) 'কঁসমে-পতাজ' (শুরুয়া বিভাগ), আঁত্রে (প্রবেশ), পিয়েস দ্য রেজিসতাঁস (পীস্ অব রেজিসটেনস্ অর্থাৎ প্রধান খাদ্য, যা দিয়ে পেট ভরাবে), 'স্যালাড', 'ডেসের' (ফলমূল, মিষ্টি), 'সেভরি' (শেষ চাট) সবই ফরাসী। আর পদগুলোর নাম, 'কঁসমে জুলেয়্যান', 'পটাজ ও ফেরমিয়ে' (চাষাদের (!) সুপ), 'অমলেট ওর্জেব' (পেঁয়াজ পুদিনার অমলেট) এখানেও দেখুন 'এগ' ইংরিজি শব্দ কিন্তু 'অমলেট' ফরাসী। এসব আরম্ভ করলে তো রাত কাবার হয়ে যাবে। (আশু ইংলণ্ডগামী এর কটিঙ্‌টা রাখলে উপকৃত হবেন; আমাকে নিমন্ত্রণ করে সঙ্গে নিয়ে গেলে আরো বেশী উপকৃত হবেন। কারণ যেগুলোর নাম করলুম এগুলো ভোজনতীর্থের বিখ্যাত কাশী

বৃন্দাবন—'হিংলাজ' 'গোটাটিকরে' নিয়ে যেতে হয় হাতে ধরে)।

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। মহানগরী কলকাতার হিন্দু-সন্তান যখন পোশাকী মাংস খায় তখন সে 'ভাত খায়' না, সে তখন বেরোয় 'খানা খেতে' এবং 'যবনের হাতে' কিন্তু স্বেচ্ছায়। কোর্মা, কালিয়া, বিরয়ানি, কাবাব, দোলমা এ সবকটি শব্দই বিদেশী; বাঙলা প্রতিশব্দ নেই। চপ, কাটলেট, মমলেটও বিদেশী শব্দ। তফাৎ এই যে ইংরিজিগুলো হিন্দু হেঁসেলে ঢুকেছে, মুসলমানীগুলো ঢুকতে পারেনি। তার কারণ, মুসলমানীগুলো রান্না একটু বেশী শক্ত।

শেষোক্তগুলো কলকাতার মুসলমানরাও খেতে শিখেছেন।

এক মুসলমান্ গেছেন হোটেলে। 'বয় এক কাটলেস লে আও।'

'হুজুর আজ মীট লেস।'

সায়েব বললেন, 'কুছ পরোয়া নাহী; সো হী লাও।'

সায়েব ভেবেছেন 'মীট লেস', (দিন) বুঝি কাটলেসের এক নবীন সংস্করণ।

মূল কথায় ফিরে যাই।

নরমান জয়ের পর ক্রমে ক্রমে যেসব বিদেশী খাদ্যরাজি বিলাতে প্রবর্তিত হল, তার ইতিহাস এখনো আমার চোখে পড়েনি—পক্ষান্তরে ফরাসী খাদ্যের সর্বাঙ্গসুন্দর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে উত্তম উত্তম পুস্তক দেখেছি। শুনেছি, মহানাম্বর স্বর্গীয় আগা খান এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভোজন-রসিক ছিলেন। তাঁর নাকি একখানি বিশাল বিরাট এটলাস ছিল—তাতে পৃথিবীর কোন জায়গায় কোন সময় কোন খাদ্য উত্তমরূপে প্রস্তুত হয় সেগুলো চিহ্নিত ছিল। এ পৃথিবীর সব খাদ্যই যখন তিনি একাধিকবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন তখন নূতন রসের সন্ধানে অন্য লোকে চলে গেলেন। আমার হাজার আপসোস তাঁর সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি বলে।

তা সে যাই হোক, একথা মোটামুটি বলা যেতে পারে বর্বর ইংরেজি রান্নার প্রতীক ছিল 'ক্রুয়েট স্ট্যাণ্ড' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি। এতে থাকতো সিরকা, অলিভ-তেল, উস্টার সস আর সরষে। নুন গোলমরিচ তো আছেই। বস্তুত এর কোনো একটা কিংবা একাধিক বস্তু না মিশিয়ে অধিকাংশই খাওয়া যেত না। নিতান্ত খরগোশ গোত্রজাতরাই ইংরেজের স্যালাড কচর কচর করে চিবুতে পারতো। পার্ক সার্কাসের রদ্দিতম ধনে কিংবা পুদিনা স্যালাড এর তুলনায় অমৃতগন্ধী মধুমঞ্জরী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেপাইরা ট্রেঞ্চে শুয়ে শুয়ে অখাদ্য খেয়ে খেয়ে স্বপ্ন দেখতো, ছুটিতে প্যারিসে ছিমছাম রেস্তোরাঁয় করকরে টেবিলক্লথওলা ছোট্ট টেবিলের উপর 'মেডফুড' —অর্থাৎ তৈরী খাবারের; ইংরিজি ধরনে নুন লঙ্কা তেল সস মিশিয়ে খেতে হয় না, ফরাসী শেফ্ এসব বস্তু রান্নাঘরেই পরিপাটিরূপে 'তৈরী' করে দিয়েছে—আমাদের মা মাসীরা যেরকম মাছের ঝোল কিংবা চালতের অম্বল করে দেন। তারই ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরিজি রান্নার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন হয়। সেইটে আমি চোখে দেখি ১৯৩০ সনে। অখাদ্য লেগেছিল কারণ, সদ্য গিয়েছি লণ্ডনে—প্যারিস থেকে।

ইন্‌ভেশনের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্বসংসারের জাত-বেজাত জড়ো করা হল ইংলণ্ডে—আলেকজাণ্ডারের সময় মেসিডোনিয়ায় কিংবা রোমের মধ্যাহ্ন দীপ্তির সময়ও ঐ শহরে বোধ হয় এরকম সাড়ে বত্রিশ ভাজা কখনো হয়নি। ফলে লণ্ডনের রান্না আপাদমস্তক বদলে গিয়েছে।

সেইটে চাখলুম '৫৮-এ।

সব-কিছু বেবাক বদলে গিয়েছে। ইস্তেক ক্রুয়েট তার মালমসলাসুদ্ধ গায়েব। যেদিন নুন লঙ্কার শিশিও যাবে, সেদিনই ইংরিজি রান্না তার চরম মোক্ষে পৌঁছবে। কে না জানে, ভালো রাঁধুনি কাউকে ফালতো নুন নিতে দেখলে বেদনা পায়। প্যারিসে

শোনা যায়, ভোজরাজ সম্রাট আগা খান এক বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় মনের ভুলে একটু ফালতো নুন নিয়েছিল বলে রেস্তোরাঁর রাঁধুনি মনের দুঃখে আত্মহত্যা করে। ইংলণ্ডে এখন পাচকই রান্নাঘরে আহারাদি তৈরী করে। গাহককে ডাইনিং হলে টেবিলের উপর পি সি সরকারের মত নিপুণ যাদুকরী হস্তে সিরকা সস ঢেলে কাঁচা-সেদ্ধ মালকে সুস্বাদ করতে হয় না। পৃথিবীর আর পাঁচটা জাত—মায় বাণ্টু হটেনটট—এতকাল যা করে আসছে।

এবং জাত-বেজাতের নূতন নূতন পদও তার রান্না ঘরে ঢুকতে দিয়েছে।

ত্রিশ বছর আগে রাইস-কারি খেতে হলে আপনাকে লিভিংস্টোনের মতো ছ'মাসের চালচিঁড়ে পুরনো ধুতিতে বেঁধে বেরতে হত তারই আবিষ্কারে। বহু বাজে লোক কর্তৃক বেপথে চালিত হয়ে, বহু পুলিসমেনের 'সক্রিয় সহযোগিতার' ফলে, 'অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জিয়া' আপনি যখন মোকামে পৌঁছতেন তখন রাইস-কারি খতম! সেই লক্ষ্মীছাড়া বীফস্টেক খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। মনে পড়তো সেই গরীব মোল্লার কাহিনী। চেয়ে চিন্তে অতি কষ্টে খেয়ার একটি পয়সা জোগাড় করে সে যখন ওপারে ফাতেহার (শ্রাদ্ধের) ভোজে পৌঁছল তখন সব-কিছু ফুরিয়ে গিয়েছে। মেহ্‌মানকে তো আর অভুক্ত ফেরানো যায় না—তাড়াতাড়ি ভাত আর মসুর ডাল সেদ্ধ করে তাকে খাওয়ানো হল। মনের দুঃখে সে বললো, 'ওরে ডাল, আমি না হয় খেয়ার পয়সা ধার করে জোগাড় করলুম; তুই পেলি কোথায়?' আপনিও স্টেককে শুধাবেন, 'এপথ তুই পেলি কোন্‌ পুলিশকে শুধিয়ে?'

একদম পয়লা নম্বরী হোটেলে—অর্থাৎ যেখানে গ্লস্টারের ড্যুক্, কেন্টের ডাচেস খেতে যান—আমি যাইনি। তার অধিকাংশই দামের ঠেলায় ফাঁকা। বিরাট হলের এখানে দু'জন ওখানে চারজন লোক খাচ্ছে, আর বেকার ওয়েটারগুলো ঈভনিং ড্রেস পরে হেথা-

হোথা জটলা পাকাচ্ছে, বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে—এমন জায়গায় খেয়ে সুখ নেই। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল চ্যারিটি ম্যাচে যদি গিয়ে দেখেন মাত্র আপনি আর ওপাড়ার গোবর্ধন উপস্থিত, আর কেউ নেই, তখন কি খেলা দেখাটা জমে? অবশ্য যেখানে এমন ভিড় যে পলায়মান বয়ের কাছাতে হ্যাঁচকা টান না দেওয়া পর্যন্ত একটা হাফ-সিঙ্গিল চা জোটে না সেখানেও 'গব্বযন্ত্রণা'। বাচ্চা এবং চা আসি-আসি করে না এলে কি পীড়া তা শুধু পোয়াতী আর গাহকরাই জানে।

অতএব যেতে হয় দুই নম্বরী হোটেলে। এবং সেখানে আপনি হরবকৎ রাইস-কারি পাবেন—পয়লা নম্বরীতে পান আর না-ই পান। আর কোনো কোনো রেস্তোরাঁয় লেখা আছে 'পাটনা রাইস।' পাটনা রাইসের প্রতি এ দুর্বলতা কেন? রাষ্ট্রপতির শহর বলে?

আর যারা খাচ্ছে তারা বাঙালী নয়, ভারতীয় নয়—দুনিয়ার চিড়িয়া।

এইসব খাস বিলিতি রেস্তোরাঁতেই যদি রাইসকারি জামাইয়ের কদর পাচ্ছে তবে তার আপন বাড়িতে অবস্থাটা কিরকম?

সে এক অভিজ্ঞতা।

লণ্ডনের বুকের উপর তবে ঠিক বড় রাস্তায় নয়। ভালোই। হট্টগোল কম। এই আমাদের বড়বাজারে যতখানি। তবে বড় রাস্তায় গোলমাল কত? মুখুয্যেকে শোধাবেন। সে বেচারী ঘুমুতে পারতো না।

ইয়া লম্বা, উর্দী পরা, মাথায় পাঠানী পাগড়ী, ছ'ফুটি দরোয়ান। যেখানে হ্যাট রেনকোট ছাড়তে হয় সেখানেও তদ্বৎ। ঢুকেই লাউঞ্জ—ককটেলটা-আসটা খাবার জন্য; ভাগ্যিস ওটা মুরারজী ভাই চালান না। সাজসজ্জা পুরো ভারতীয়। হেথায় নটরাজের ব্রোঞ্জ, হোথায় পেতলের ভারতীয় অ্যাসট্রে, আরো এটা সেটা, ধূপকাঠিও জ্বলছে।

এগিয়ে এলেন এক খাপসুরৎ শ্যামাঙ্গী, পরনে মুর্শিদাবাদী, চুলে তেল পড়েছে—মেমেদের শন-পাটের মত স্নেহহীন নয়—খোঁপাটিও ন'সিকে বাঙালোরী, ব্লাউজ ব্লাউজেরই কাজ করছে—চোলীর প্রক্সি দিচ্ছে না—চোখেমুখে খুশী, ভারি চটপটে। একটা 'নমস্তে' ভী পেশ করলে।

বাঃ, এ-তো বেড়ে ব্যবস্থা।

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!

তাহলে উত্তম আহারাদি হবে।

ফারসী গুণী রশফুকোল বলেছেন, 'আহার প্রয়োজনীয় বটে· কিন্তু রসিকজনের মত আহার করা আর্ট।' ভোভানার্গ বলেছেন, 'মহৎ চিন্তা পেটের ভিতর থেকে আসে।' গ্রীক দার্শনিক এপিকুর বলেছেন, 'প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি উত্তম কর্মে নিযুক্ত করবে এবং সুবুদ্ধিমানের মত পরিপাটি আহার করবে।' এবং ইক্লেসিয়াসটের মাধ্যমে নমস্য বাইবেল গ্রন্থ অনুশাসন দিয়েছেন, 'পান, আহার ও আনন্দ করার (ইট, ড্রিঙ্ক অ্যাণ্ড বি মেরি) চেয়ে মহত্তর কর্ম ত্রিভুবনে নেই।'

আর মলিয়ের যখন বলেন, 'আমরা বাচার জন্য খাই; খাওয়ার জন্য বাঁচিনে', তখন তিনি বর্বরজনসুলভ প্রলাপ বাক্য ব্যবহার করেছেন। 'আমরা খাওয়ার জন্য বাচি, বাঁচার জন্য খাই না।'

ভোজনাদি সম্বন্ধে আমি আলোচনা আরম্ভ করলেই কোনো কোনো উন্নাসিক পাঠক বিরক্ত হন, আবার কেউ কেউ বলেন, এ-সব কথা তো আগেও যেন শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। উত্তরে নিবেদন, সব কথা শোনেননি; আর শুনে থাকলেই বা কি? পুরনো জিনিসের পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে নীচশে একদা লিখেছেন, 'এ-কথা আমি পূর্বেও বলেছি, কিন্তু মানুষ শোনা কথাই শুনতে চায়, জানা কথাই বিশ্বাস করে।' একদম খাঁটি কথা। আমাদের মোহর বীবী, কণিকা ব্যানার্জিকে যখন শুধাই, 'সেই রেকর্ডে দেওয়া তোমার গান "ওগো তুমি পঞ্চদশী" ফের বেতারে গাইলে কেন? ওটা তো ইচ্ছে করলেই রেকর্ড বাজিয়ে আবার শোনা যায়', তখন সে বলে, 'কি করবো, সৈয়দদা, লোকে যে পুরনো গানই শুনতে চায়?' বুঝলুম, বাচ্চাদের কাছে নূতন গল্প বলতে চাইলে তারা যে রকম চেঁচিয়ে ওঠে, 'না, মামা, কালকের সেই বাঘের গল্পটা বলো।'

দ্বিতীয়ত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার রচনা বাঙলা দেশে অজরামর হয়ে থাকবে না, আমার রসনির্মাণপ্রচেষ্টা বাণী-সরস্বতীর অঙ্গদে কুণ্ডলে মাল্যরূপে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে না, কিন্তু এ-কথা স্থির-নিশ্চয় জানি, এই বঙ্গসন্তানদের যেদিন কাণ্ডজ্ঞান সম্যক্ প্রস্ফুরিত হবে, যেদিন তারা 'ভারতনাট্যম', 'পিকাস্‌সো,' 'সিংহেন্দ্র মাধ্যম' কিংবা 'ভাল্লুকপঞ্চমীর' পশ্চাদ্ধাবন কর্ম বর্বরস্য শক্তিক্ষয় বলে সুষ্ঠুরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে সেদিন সে উদরমার্গের সন্ধানে নব নব অভিযানের পথে নিষ্ক্রান্ত হবেই হবে। আজ যে রকম কচিৎ-জাগরিত বিহঙ্গকাকলীর ন্যায় কোনো কোনো বিদ্বজ্জন চৈতন্যচরিতামৃতের ভোজনামৃত খাদ্য-নিঘণ্টু অধ্যয়ন করতে করতে বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন উত্থাপন করেন 'কিমাশ্চর্যম্! ছানার সন্দেশের উল্লেখ তো

কুত্রাপি নেই ?'—ঠিক সেইরূপ অস্মদ্দেশে যেদিন রাজবর্ত্মে রাজবর্ত্মে চিৎকার প্রতিধ্বনিত হবে, 'আমাদের-দাবি মানতে হবে! ভোজনা-মার্গের-গীতা রচনা করো! ইন্‌কিলাব-জিন্দাবাদ! পেট-কিলাব-ঝাণ্ডা তোল্!' সেদিন, বলতে লজ্জা করছে, বিনয়ে বাধছে, সেদিন এই অধমের, হ্যাঁ এই অধমের বইয়ের সন্ধানেই বেরতে হবে বঙ্গের মাক্‌সম্যুলার মমজেনকে। আফগানিস্থানের সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস নির্মাণে মল্লিখিত 'দেশে-বিদেশে' ব্যবহৃত হবে কি না জানি না, কিন্তু এ বিষয়ে সুচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্নেন সন্দেহ নেই যে আজ আমরা যে রকম আমাদের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনার সময় নিরপেক্ষ পর্যটক পরিদর্শক হিউয়েন সাঙের শরণাপন্ন হই, ঠিক সেই রকম ইংলণ্ড-সন্তান যেদিন সভ্য হয়ে তার দেশের ভোজনেতিহাস লিপিবদ্ধ করবে সেদিন তাকে বেরতে হবে—পুনরায় ব্রীড়িত হচ্ছি—এই আমারই বইয়ের সন্ধানে, রাখাল বাঁড়ুয্যেকে যে রকম মোন্-জো-দড়োর সন্ধানে একদা বেরতে হয়েছিল; আপনাদের রবিঠাকুরের 'চাঁদ উঠেছিল গগনে'র সন্ধানে দেশে কেউ আসবে না। রায়গুণাকর অন্নদাশঙ্করের 'রত্ন ও শ্রীমতী'র জন্য তাঁর প্রকাশক মাত্র ইয়োরোপকে চ্যালেঞ্জ করেছে, আমার প্রকাশক বিশ্বভুবনকে ক্রৌঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করবে, কাজী সায়েবের ভাষায় (আল্লা তাঁর বিমারী বরবাদ করে জিন্দেগী দরাজ করুন!) ত্রিভুবনেশ্বরের সিংহাসন নিয়ে আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ আরম্ভ করবে।

সেই রত্নসমা শ্রীমতী তো ফরাসিস পানীয়ের কথা ওঠাতে আরেকবার 'বিলক্ষণ' বলে অন্তর্ধান করলেন; আমি ভাবলুম, 'ঐ য্‌যা। ব্যাকরণে বুঝি গলতি হয়ে গেল। এ যে সম্ভ্রান্ত ভারতীয় ভোজনালয়! এ সব বিদগ্ধ পানীয় বোধহয় এখানে নিষিদ্ধ। আবার বাঙাল বনে গেলুম নাকি?

নাঃ! কোনো ভয় নেই। ভাতিজা, চ্যাংড়া মুখুয্যে ঘটিচ্ছ

ঘটি। সে দেখি দিব্য তার টুথব্রাশ গোঁপে আঙ্গুল বুলোতে বুলোতে নিশ্চিন্ত মনে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে—চোখ দুটো যেন ব্লটিং পেপার—সব-কিছু শুষে নিচ্ছে।

পুরীর সমুদ্রপারে ঢেউ দেখে অবনঠাকুর ভীত হয়ে যখন পালাবার পথ খুঁজছিলেন, তখন তাঁর এক স্যানা বন্ধু তাঁকে বলেন, 'ভয় কিসের? সায়েবসুবোরা তো চতুর্দ্দিকে রয়েছেন।' অর্থাৎ তেমন কিছু বিপজ্জনক পরিস্থিতি হলে পুলিশ আগেই তাঁদের খবর দিতেন, তাঁরাও কাটতেন।

যাক্‌। এদেশে আনাকোরা আগত মুখুয্যে যখন নিশ্চিন্ত তবে আর আমার ভয় কি? তখন কি আর ছাই জানতুম, সে আমারই ভরসায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।

কিন্তু, সায়েব-সুবোরা তো রয়েছেনই। তেনারা তো 'পানীয়' বেগর ভোজন করতে পারেন না।

এবং সাতিশয় উল্লাসের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, কোনো ভারতীয় লাউঞ্জে নেই। তারা নিশ্চয়ই মনুনিষিদ্ধ এই পানে লিপ্ত হয়ে পাপবিদ্ধ হয় না। সোজা ডাইনিংরুমে ভোজন করতে গিয়েছে। তাদের চরিত্রবল দেখে উল্লাস বোধ করলুম।

ওদিকে দেখি শ্রীমতী অন্য খদ্দেরকে স্বাগত জানাচ্ছেন। ভারী বিরক্তিবোধ হল। এ যে দেখি হুবহু বাঙালী দোকানের মতো। আপনাকে জিনিস দেখাতে দেখাতে হঠাৎ অন্য খদ্দের ঢুকছে দেখে দিল ছুট তার দিকে—আপনাকে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলিয়ে রেখে, কিংবা যে রকম নির্মল সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত জানান যে আপনার পরীক্ষার ফল পরে বেরুবে।

নাঃ। আমারই ভুল। দেখি হেলে দুলে একটি মোটাসোটা ভারিক্কি ধরনের লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এর গলায় গলাবন্ধ কোটের উপর ঝোলানো মসীকৃষ্ণ উপবীত ও তৎসংলগ্ন কুঞ্চিকা দেখে এর জাতগোত্র বুঝতে আমার কণামাত্র সময় লাগলো।

না যাঁরা সংস্কৃতে লেখা 'প্রতিমালক্ষণ' সংক্রান্ত অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই জানেন, প্রতিমা দেখে কোন্‌টা কোন্ দেব না দেবীর জানতে হলে স্মরণ রাখতে হয়, কোন দেবীর দক্ষিণ হস্তে কুবলয় বলয়, কার বাম হস্তে চক্র, কার মস্তকে উষ্ণীষ, কার পদে নূপুর।

কুঞ্চিকাসমন্বিত কৃষ্ণোপবীত 'ওয়াইন মাস্টারের' লক্ষণ।

আপনি যদি চাষাড়ে হুইস্কি বিয়ার রাম্ জিন্ না খেয়ে উত্তম বিদগ্ধ ফরাসী কিংবা জর্মন অথবা ইতালিয় 'ওয়াইন' খেতে চান, তবে এই ভদ্রসন্তান আপনাকে পরম বান্ধবের ন্যায় তাবৎ সন্ধিসুড়ুক বাতলে দেবেন। চাণক্য বলেছেন, 'ব্যসনে (এবং মদ্যপান ব্যসন-বিশেষ) যে সঙ্গে থাকে সে বান্ধব।' ইনি তাই করে থাকেন। তবে চাণক্যের বান্ধব আপনাকে কোনগতিকে ঠেকিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবার চেষ্টা করে; ইনি মোকা পেলে ওস্কাবার চেষ্টা করেন—এই যা তফাৎ।

মৃত্যুঞ্জয় যে রকম কৈলাসে বিহার করেন, রাশান ডিকটেটর যে রকম ক্রেমলিনে বাস করেন, ভেজাল যে রকম খাদ্যে বিরাজ করেন, এই 'ওয়াইন মাস্টারটি' ঠিক তেমনি বিচরণ করেন অতিশয় পয়লানম্বরী খানদানী 'ভয়ঙ্কুর' রেস্তোরাঁতে। 'ভয়াঙ্কুর' বললুম ইচ্ছে করেই। এখানে অঙ্কুর পর্যন্ত বিনষ্ট হয়। ইনি আপনার সর্বস্ব অপহরণ করেন। পাতলুন বন্ধক দিয়ে বিল্ শোধ করতে হয়।

ভীতকণ্ঠে ভাতিজাকে শুধালাম 'ওরে, রেস্ত আছে তো?'

ভিতরের বুক-পকেটের উপর থাবড়ামারার মুদ্রা দেখিয়ে বললে, 'কুছ্ পরোয়া নেই; আপনি চালান।'

সোনার চাঁদ ছেলে। একেই বলে বান্ধব। ব্যসনে সঙ্গে থাকে।

এ-জীবনে আর যদি কখনো চাকরি নিই তবে উমেদার হব এই 'ওয়াইন মাস্টারের' চাকরির জন্য—বেতারের কাজ হয়ে গিয়েছে

সেখানে শুধু খাপসুরৎ কলাবতীর ঝামেলা; তারা আমাকে যথেষ্ট 'কল্‌চরড্‌' বলে বিবেচনা করেন না।

খানদানী রেস্তোরাঁর চার ইঞ্চি পুরু মহামূল্যবান ইরানী গাল্‌চের উপর মৃদু পদসঞ্চরণ করে কাটবে আপনার জীবন—ভ্রমর যে রকম তন্বঙ্গীর বিম্বাধরে পদক্ষেপ করে ঠিক সেই রকম (বিশ্বাস না হলে কালিদাস পশ্য) এক জোড়া চার আউন্স ওজনের ঈভনিং শূতে কেটে যাবে ঝাড়া দশটি বছর—হাপসোল পর্যন্ত বদলাতে হবে না। এ টেবিলে গিয়ে কাউকে বলবেন, 'তিপান্নের "নীরেনস্টাইনার"—সে একটি স্বপ্ন, স্বপ্ন। ১৯৫৩-এ সেখানকার আঙ্গুর মোলায়েম রৌদ্রে যা রসে টইটম্বুর হয়েছিল, সে রকম ধারা আর কখনো হয়নি। তাই দিয়ে এ সুধা নির্মিত হয়েছে।' কখনো বা অন্য টেবিলে গিয়ে ফিস ফিস্‌ করবেন, 'মাদাম, দেখুন, দেখুন, এই শ্যাম্পেনের বুদ্বুদ কি রকম লক্ষ লক্ষ পরীর মত সলোমনের বোতল-বদ্ধ জিনের ন্যায় নিষ্কৃতি পেয়ে লক্ষ লক্ষ হাওয়ার ডানা মেলে উর্ধ্বপানে উড়ে যাচ্ছে। এ বস্তু গলা দিয়ে নাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনিও ইহলোকের সর্ববন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে নীলাম্বরের মর্মমাঝে উধাও হয়ে যাবেন।' তারপর একটু মৃদু হাসি হেসে বলবেন, 'তাই, মাদাম, এ শ্যাম্পেন যিনি অর্ডার দেন তাঁর কাছ থেকে আমরা আগেভাগেই বিলটা আদায় করে নি, অবশ্য; আপনাদের বেলা সে কথাই উঠছে না।'

এ তো হ'ল। তারপর আপনি ঘড়ি ঘড়ি 'বারে' সেলারে গিয়ে তদারক করবেন, সর্ববস্তু রাজসিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত রয়েছে কি না। রাঁধুনিকে যে রকম সে-সব জিনিস মাঝে মাঝে চেখে দেখতে হয় আপনাকেও 'নিতান্ত বাধ্য হয়ে', 'অতিশয় অনিচ্ছায়'—আমাদের বরকর্তারা যে রকম পণ নেন—অল্প-স্বল্প মাঝে-মধ্যে চেখে দেখতে হবে বইকি?

তাও হ'ল। ওদিকে আপনাকে প্রতি শরতে ফ্রান্স যেতে হবে, সেখান থেকে নিলামে পানীয় কিনে সেলার পূর্ণ করার জন্য।

আপনার কমিশনটা-আসটা ঠেকায় কে? আপনার ভারী ভারী গাহক খদ্দেরের বাড়ির জন্য তাদের প্রাইভেট অর্ডারও সাপ্লাই করবেন। তাতেই বা কম কি? ওনরা হাত উপু করলেই আমাদের পর্বত-প্রমাণ।

আমাদের 'ওয়াইন মাস্টারটি' এসে নমস্তে জানালেন। চমৎকার চেহারা। নেয়াপতি ভুঁড়ি, চোখ দুটি জবাকুসুমসঙ্কাশং যা হওয়ার কথা।

আমি সবিনয়ে বললুম, 'ত্রিশ বছর পরে এসেছি। ইতিমধ্যে একটা লড়াই হয়ে গিয়েছে। জর্মনরা ফ্রান্স ছাড়ার সময় প্যারিসের 'নত্র দাম্' গির্জে সঙ্গে নিয়ে যায়নি বটে, কিন্তু ফ্রান্সের সেলারে সেলারে ঢুকে তার উত্তম-অধম সর্বপানীয় খতম করে যায়। এখন যা ফ্রান্স ইংলণ্ডে পাওয়া যাচ্ছে, তার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। আপনি পথপ্রদর্শন করুন। তবে এইটুকু বলতে পারি, বর্দো এবং শান্ত।'

'শান্ত' মানে যে বস্তু সোডার মতো বুজ্‌বুজ্‌ করে না, তেলের মত শুয়ে থাকে।

চাকুরে যে রকম পেন্‌সন্‌ধারীকে খাতির করে, 'মাস্টার' আমাকে সেই রকম কদর করলে। আহা, এককালে লোকটা সব-কিছু জানতো। এখন না হয় আউট অব্‌ ডেট্‌!

মাক্‌স্‌ম্যুলার নাকি আমাদের সংস্কৃত শিখে ভশচাযদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, হরিনাথ দে নাকি গ্রীক শিখে গ্রীকদের চিত্তহরণ করেন—এসব শোনা যায়, কিন্তু আমাদের এই 'পানের প্রভু' দেখলুম, সত্যিই পেটে এলেম ধরে। দেখলুম হেন পানীয় নেই, যার ঠিকুজি-কুলজি তার বিদ্যাচৌহদ্দীর বাইরে পড়ে। কবে কোন্‌ বৎসরে কোন্‌ গাঁয়ের আঙ্গুরে এ জিনিস তৈরী, সে বৎসর আঙ্গুর পাকার সময় সেখানে বৃষ্টি হয়েছিল না মেঘ ও রৌদ্র না মোলায়েম মোলায়েম মিঠে রোদ্দুর ছিল, কার চাপযন্ত্রে তার রস

বের করা হয়, তাই দিয়ে সবশুদ্ধ ক' বোতল তৈরী হয়েছিল, তার কটা গেল মার্কিন মুল্লুকে কটা এল এ দেশে, এর 'বডি' কি রকম 'বুকে' (bouquet)-টাই বা রমণীয় কিনা—সব-কিছু জিহ্বাগ্রদর্পণে, এবং উভয়ার্থে।

'নগণ্য' ভারতীয় যে এই বিলিতি বিদ্যে এতখানি হাসিল ক'রেছে তার কাছে মাক্‌স্‌ম্যূলারের সংস্কৃতজ্ঞান শিশু।

শুধালুম, 'ভদ্র, এ কর্মে কতদিন ধরে আছেন।'

সবিনয়ে বললে, 'আজ্ঞে, পঞ্চাশ বছর পূর্বে যখন এ রেস্তোরাঁ খোলা হয় তখন থেকে। সে আমলের আর কেউ নেই।'

তবে কি এসব জিনিস খেলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়? অর্থাৎ ওয়াইন—যে বস্তু আঙ্গুরের রস দিয়ে তৈরী হয়েছে; হুইস্কি বিয়ারেব কথা উঠছে না।

জানি রসভঙ্গ হবে, তবু হুইস্কি ওয়াইন কোনো জিনিসই ভালো নয়। অতিশয় শীতের দেশে, কিংবা ডাক্তারের হুকুমে খাওয়া উচিত কিনা, সে কথা আমি বলতে পারবো না। অতখানি শীতের দেশে আমি কখনো যাইনি—বিলেতে গরম দুধ, চা, কফি খেলেই চলে—আর অতখানি অসুস্থও আমি জীবনে কখনো হইনি। মদ্যপান করলে ভালো লেখা বেরোয় এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে। মেঘনাদ কাব্য রচনার সময় মাইকেল ক্লান্তি দূর করার জন্য অল্প খেতেন, শেষের দিকে যখন মাত্রা বেড়ে গেল, তখন দু'চার পাতা লেখার পরেই বেএক্তেয়ার হয়ে ঢলে পড়তেন—তাঁর গ্রন্থাবলী সে সব অসামাপ্ত লেখায় ভর্তি। এবং তার চেয়েও বড় কথা, আপনি আমি মাইকেল নই। একখানা মেঘনাদ লিখুন; তারপর না হয় মদ খেয়ে লিভার পচান—কেউ আপত্তি করবে না।

এবং সব চেয়ে মারাত্মক তত্ত্ব শুনেছি কোনো কোনো কলেজের ছোকরার কাছে। বিয়ার নাকি মদ নয়, ওতে নাকি নেশা হয় না, ও বস্তু খেলে নাকি পরীক্ষার পড়া করার সুবিধে।

বটে! বিয়ারে নেশা হয় না? লণ্ডন প্যারিসে রাস্তায় যারা মাতলামো করে তারা কি খায়? কোকা কোলা? অগা আর কারে কয়! ওদের পনেরো আনা বিয়ার খেয়েই মাতাল হয়। আমাকে ওসব বলো না; ঠাকুরমাকে ডিম চোষা শেখাতে হবে না।

মূল ফার্সীতে আছে,

গর্ দস্ত দহদ্‌জ্ মগ্‌জ্-ই-গন্দুম্
নানি,
ওয়াজ ময় দো মনী জ্ গোসফন্দী
রানি,
ওয়ানগাহ মন্ ওয়া তো নিশস্‌তে
দর্ ওয়েরানি
আয়েশী বোদ্ আন্ ন্ হদ্ হর্
সুলতানি

এর ইংরিজি—

Here with a loaf of bread
beneath the bough,
A flask of wine, a book of
verse—and Thou
Beside me singing in the
Wilderness—
And Wilderness is Paradise
enow.

(ফিট্‌স্‌জেরাল্ড্)

তার বাঙলা—

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে
　　　　　　　　শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে
　　　　　　　　দিনটা যায়!
মৌন ভাঙি তার পাশেতে গুঞ্জে
　　　　　　　　তব মঞ্জু সুর—
সেই তো, সখি, স্বপ্ন আমার,
　　　　　　　　সেই বনানী স্বর্গপুর।

(কান্তি ঘোষ)

কিংবা

বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি
　　　　　　পাই যদি একখানি
পাই যদি এক পাত্র মদিরা আর
　　　　　　　　যদি তুমি রানী
সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া
　　　　　　　　গাহো গো মধুর গান
বিজন হইবে স্বর্গ আমার
　　　　　　　　তৃপ্তি লভিবে প্রাণ।

(সত্যেন দত্ত)

যার প্রাণে যা চায় তিনি সেইভাবে অনুবাদ করেছেন। খৈয়ামের খড়বাঁশের কাঠামোর উপর যে যার আপন মানসমূর্তি স্বপ্নপ্রতিমা গড়েছেন; আসলে কিন্তু আছে,

উত্তম ময়দার তৈরি রুটি যদি
　　　　　　　　হাতে থাকে,
আর যদি থাকে দু' মণ মদ এবং
বাচ্চা ভেড়ার আস্ত একখানা ঠ্যাং (রান),

ঘুঘু-চরা পোড়ো বাড়িতে কাছাকাছি বসে
তুমি আমি দু'জনা
সে আনন্দ বহু সুলতানেরও ভাগ্যে
জোটে না।

খৈয়াম এ কবিতায় 'কবিত্ব' করেন নি। তিনি সাদামাটা ভাষায় বলছেন, তাঁর কি কি চাই। মোলায়েম কবিতায় বিলকুল অচল হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভেড়ার একখানা আস্ত ঠ্যাং (রান্ কথাটা আসলে ফার্সী এবং তিনি ইটি এস্থলে নির্ভয়ে ব্যবহার করেছেন) অর্ডার দিয়েছেন এবং পাছে নেশা জমবার আগে মদ ফুরিয়ে যায় তাই পাক্কা দু'মণ খাঁটি চেয়েছেন। এবং লক্ষ্য করার বিষয় তিনি কবিতার বই আদপেই চান নি। যে জিনিস যে পারে সেটা সে চায় না। মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে যে দড়ির উপর নাচতে পারে সে প্রিয়াকে নিয়ে বোটানিক্সে পিক্‌নিক্ করতে যাওয়ার সময় ডাণ্ডা দড়ি বগলে করে নিয়ে যায় না। এবং আসল কথাটা দুই বাঙালী অনুবাদকই ঘুলিয়ে ফেলেছেন। খৈয়াম বলেছেন, 'যা সব চাইলুম তা পেলে আমি জাহান্নমেও যেতে রাজী আছি; ওরকম 'জাহান্নম' রাজা-বাদশার কপালেও জোটে না।'

যে ইরান-সন্তান চতুষ্পদীটির ফরাসী অনুবাদ করেছেন তিনি মূলতত্ত্বটি ধরতে পেরেছেন বলে খৈয়ামের প্রতি অবিচার করেননি।[১]

---

(১) স্বরাজ লাভের পর দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল বেড়েছে। বিশেষ করে ইরান, আরব ভূখণ্ড যখন নানা রকম আন্দোলন-আলোড়নের সৃষ্টি করে তখন এদেশের বহুলোক জানতে চান, এর পিছনে তত্ত্ব কতটুকু। এমন কি এদেশের চিত্রকররা পর্যন্ত জানতে চান, ইরান তুরানে ছবি কিভাবে আঁকা হচ্ছে?—সেই পুরানো পদ্ধতি, না মডার্ন প্রভাব তার উপর এসেছে। আমার কাছে তেহরানে প্রকাশিত যে সচিত্র খৈয়াম আছে তার ছবি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, এর কলাকার প্রাক্ রবি বর্মা (আমাদের হিসাবে) যুগের। চিত্রকর

Pour celui qui possede un
morceau de bon pain.
Un gigot de mouton, un grand
flacon de vin,
Vivre avec une belle au milieu
des ruines,
Vaut mieux que d'un Empire
etre le souverain.

(এতেস্সাম-জাদে)

কিন্তু আমার মূল বক্তব্য এখানে তা নয়।

আমি বলতে চাই, কবিতা বা অন্য কোনো বস্তু অনুবাদ করার সময় এ শুচিবাই কেন? কেন লোকে ধরে নেয় যে কাব্যে ভেড়ার ঠ্যাং চলতে পারে না। ইংরেজ এ শুচিবাই শিখেছে গ্রীকদের কাছে। তাদের 'ভিনাস' মূর্তি দেখে এক সরলা নীগ্রো রমণী শুধিয়েছিল, 'শরীরের নিচের আধা সম্বন্ধে মেয়েটার অত লজ্জা কেন? ওটা ছালা দিয়ে ঢেকেছে কেন?'

যুগে যুগে রুচি বদলায়। অনুবাদ করার সময় যদি আপন যুগের রুচি দিয়ে পূর্ববর্তী যুগের রুচির উপর সেনসর চালাই তবে কবির প্রতি তো অবিচার করা হয়ই, পরবর্তী যুগের রসিকজনের প্রতিও অমর্যাদা দেখানো হয়। কোনারকের মন্দির বহু সায়েব-সুবোর রুচিতে বাধে। তাই বলে আমরা তো আর মূর্তিগুলোর মুণ্ডু বাইরে রেখে বাকি ধড় কম্বল চাপা দিয়ে রাখিনে।

ওমরের স্মরণে আমি একখানা পুরো রানই অর্ডার করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল, পরশু রাতের শিক্ষা।

ফিট্সজেরাল্ডের স্মরণে খৈয়ামের হাতে একখানা কবিতার বই দিয়েছেন, পুরো রান্ না দিয়ে পেলেটে একখানা ছোট্ট মটন চপ রেখেছেন, এবং মদের বোতলটি খড়ে মোড়া—ইতালিয়ান কিয়ান্টি বোতলের মত!

তখন সন্ধ্যে আটটা। দেশের হিসেবে রাত দেড়টা। সবে এদেশে এসেছি ; শরীরটা এদেশের টাইমে ধাতস্থ হয়নি। ভাতিজাকে বললুম, 'বাবাজী, আমি আর বেরুচ্ছি নি। তুমি আলুসেদ্ধ-ফেদ্দ কিছু একটা নিয়ে এস—রুটি মাখন ঘরেই আছে। তাই দিয়ে দিব্য চলে যাবে।'

মুখুজ্যে মশাই যখন ফিরে এলেন তখন দেখি তাঁর হাতে এক ঢাউস থলতে—বাঙাল দেশে বলে ঢোঙ্গা।

মিনির মতো সরল চিত্তে শুধালুম, 'এর ভিতর কি হাতি?'

বললে, 'সব্বনাশ হয়েছে, স্যার।'

এস্থলে বলে রাখা ভালো, মুখুজ্যের 'সব্বনাশ'টা খাস কলকাত্তাই। মোকামে পৌঁছে যখন দেখলে তার বহু পয়সার মাল শান্তিনিকেতনের একটা ডকুমেণ্টরি ফিলম বেমালুম গায়েব হয়ে গিয়েছে, তখন 'টুথব্রাশমুস্টাশে' হাত বুলিয়ে বলে, 'যাকগে', আবার যখন পাতলুনের পকেট খুঁজে পায় না তখন বলে সব্বনাশ হয়েছে।

আমি তার সব্বনাশে বিলক্ষণ অভ্যস্ত বলে হাই তুলতে তুলতে নিশ্চিন্ত মনে শুধালুম, 'কি সব্বনাশ হয়েছে? দেশলাই খুঁজে পাচ্ছো না?'

'কি করে জানবো বলুন, এদেশে মুর্গীর সাইজ হয় দেশের খাসির? আপনি তো আলুসেদ্ধ চেয়েছিলেন,—রেস্তোরাঁওলা বললে, 'কাবার'। আমি বললুম, 'আলুসেদ্ধ নেই তো নেই—চিকেন্‌সেদ্ধ দাও।' ভাগ্যিস 'হাফ-এ-চিকেন' বলেছিলুম, তাই রক্ষে। দেখুন।'

সেই চিকেন আমরা দুই পুরুষ্টু পাঁঠায় দেড় বেলায় শেষ করি।

তারই স্মরণে অতখানি অর্ডার না করে যৎসামান্যের হুকুম দিলুম।

চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখি, সবাই গোরার পাল। একটি মাত্র

ভারতীয়ও নেই। মেনুর দিকে নজর যেতেই কারণটা বুঝতে পারলুম। এক একটি পদের যা দাম তাই দিয়ে যে কোন লণ্ডনবাসী ভারতীয় ছাত্রের আড়াইখানা পুরো লাঞ্চ হয়! মুদ্রার মত পিস্টন না থাকলে এরা এখানে আসতে পারে না।

বিলেতফের্তা বাঙালীদের নিয়ে দেশে বহু আলোচনা হয়ে গিয়েছে। এককালে এদের অনেকেই আর দিশী ডালভাত ধুতি-চাদরে ফিরতেন না। তারপর বিশেষ করে চিত্তরঞ্জন দাস যে তেজ্বিবাজি দেখালেন তা দেখে আর বিলিতিয়ানা করার সাহস অল্প 'সায়েবেরই' রইল। কিন্তু যেসব ইংরেজ এদেশে বহু বছর কাটিয়ে বিলেত ফিরে যায় তাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই। তবে শুনেছি, ড্রাইভার রাখার মত পয়সা ছিল না বলে লর্ড রোনাল্‌ড্‌শেকে ট্রামেবাসে দেখা যেত। এদের সম্বন্ধে সব চেয়ে ভালো লিখেছেন উড্‌হাউস্‌। তাঁর ধারণা এদের মাথায় ছিট ধরে। কেউ কেউ নাকি ডিনার আরম্ভ করে পুডিং দিয়ে ও শেষ করে সূপ দিয়ে!

তবে একথা বিলক্ষণ জানি এদেশ থেকে তারা দুটো অভ্যাস নিয়ে যায়। স্নান করা ও মশলাদার খাদ্য খাওয়া। এই যে আজ ইংলেণ্ড জর্মনিতে বাথরুমের ছড়াছড়ি না হোক, ব্যবস্থাটা অন্তত আছে (জর্মনিতে ম্যুনিসিপালিটির আইন হয়েছে, কটা শোবার ঘর হলে কটা বাথরুম অবশ্য তৈরী করতে হবে) তার প্রধান বাহক চা-বাগানের ইংরেজ। আমার এক বন্ধুর কাছে শোনা, তাঁর সময়ে অর্থাৎ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সমস্ত অক্‌স্‌ফর্ডে নাকি মাত্র দুটি বাথরুম ছিল। তাই নিয়ে এক বাগিচার সায়েবের ছেলে কর্তৃপক্ষকে ফরিয়াদ জানালে তাঁদের একজন বলেন, 'তোমরা তো এখানে একনাগাড়ে থাকো ছ' হপ্তা (তখন বোধ হয় এক টার্ম বলতে ঐ সময়ই বোঝাতো); ছুটিতে বাড়ি ফিরে চান করলেই পারো।'

অর্থাৎ ছ' সপ্তাহে একটা স্নানই ইংরেজ বাচ্চার জন্য যথেষ্ট।

ধেড়েদের জন্য বোধহয় ছ' বছরে একটা। ফরাসীরা তো শুনেছি চান করে নদীতে আত্মহত্যা করার সময়।

কেন? তারা তাদের কলনি ইন্দোচীনে চান করতে শিখল না কেন?—এখনো তা ফ্রান্সের চোদ্দ আনা বাড়িতে চানের ঘর নেই। বলতে পারবো না। তবে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কাছে শুনেছি, তিনি চীন দেশের বিরাট নদী দিয়ে জাহাজে করে গিয়েছেন কিন্তু কোনো চীনাকে নদীর জলে স্নান করতে দেখেন নি।

আর এদেশের মশলামাখা রান্না খেয়ে ইংরেজের স্বভাব এমনই বিগড়ে যায় যে, দেশে ফিরে তাকে যেতে হয় ভারতীয় রেস্তোরাঁতে। এদের পয়সাও প্রচুর; তাই বোধ হয় খাস করে এদেরই জন্য এই তালু-পোড়া দামের রেস্তোরাঁ!

ইংরেজের যে কটি প্যারা সস্—যথা উস্টার, এইচ বি—এগুলো নাকি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষেই তৈরী হয়েছিল। এগুলো বানাতে যেসব মশলার প্রয়োজন হয়, সেগুলো যে ইয়োরোপে গজায় না সেকথা ভালো করেই জানি। এমনকি আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে যেসব তরকারি গজায় সেগুলো আপন দেশে গজাতে পারে না বলে সাউথ অ্যামেরিকা থেকে আনিয়ে খায়। ঠিক বলতে পারবো না, তবে বেগুন খেতে শিখেছে বোধ হয় মাত্র ত্রিশ বৎসর।

আবার বলছি, এসব তত্ত্বের মাহাত্ম্য আমার বহু পাঠক দেবেন না। কিন্তু আমি সাধারণ জিনিসের খেই ধরে তত্ত্বচিন্তা করতে ভালোবাসি। যেমন ইংরেজ বেগুন খেতে শিখেছে বটে, কিন্তু সেটা খায় সেদ্ধ করে যতদূর সম্ভব বিস্বাদ বানিয়ে। বেগুন-পোড়া যে তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি, সে তত্ত্ব এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি। ঠিক তেমনি মার্কিন জাত রেড্ ইণ্ডিয়ানের কাছ থেকে মুড়ি খেতে শিখেছে বটে, কিন্তু তেল, পেঁয়াজকুচি (পাঁপরভাজা বাদ দিন) দিয়ে খেতে শেখেনি।

আমি শুধু ভাবি ওসব 'সামান্য' জিনিষ আবিষ্কার করতে মানুষের কত শতবৎসর লাগে।

ফার্পোতে যখন কেউ বাঁ হাতে ছুরি নেয় তখন তার কাবেল বন্ধুরা ফিস্-ফিস্ করে ভুল বাংলে দেয়। এখানে দেখি 'উল্ট-পুরাণ'। পোলাও খেয়ে যাচ্ছে তো খেয়েই যাচ্ছে। মাংসের কারিটা পাশে পড়ে আছে। মেশাবার কথা মাথায় আসেনি। কাবাব খাচ্ছে তো খাচ্ছেই—পাশে চাপাতি পড়ে পড়ে জুড়িয়ে হিম হয়ে গেল। ওকিব-হালরা তখন ফিস্‌ফিস্ করে অ্যামেচারদের তালিম দিয়ে দুরুস্ত করার চেষ্টা করছেন।

এইবারে রসভঙ্গ করতে হল। আর চেপে রাখতে পারলুম না।

রান্না পছন্দ হল না।

মাদ্রাজী মশলা দিয়ে মোগলাই খানা এই আমি প্রথম খেলুম। এ যেন সেমেন্ট দিয়ে তাজমহল বানানো, কিম্বা মাইকেলি অমিত্রাক্ষরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া, অথবা—মাদ্রাজী মোগলাই মাল-মশলাই থাক—দক্ষিণের রাজগোপাল-আচারীকে উত্তরের চোগা-চাপকান পরানো।

কিন্তু তবু খেতে খুব মন্দ না। এতো হাড্ডিসার মুর্গী তেজাল দালদা দিয়ে রান্না নয়। মুর্গীটা যেন চর্বিওলা খাসী আর যে মাখন দিয়ে রান্না করা হয়েছে সেটা এদেশে সত্যযুগে পাওয়া যেত। দেশে থাকতে আমি তো একবার প্রস্তাব করেছিলুম, কোনোগতিকে একটুখানি খাঁটি গাওয়া ঘি যোগাড় করে মিউজিয়ামে রাখার জন্য—যাতে করে ভবিষ্যদ্বংশীয়রা জানতে পারে এককালে বাঙলা দেশের লোক কি খেত।

তখন প্রায় রাত দুপুর। রাস্তায় বেরিয়ে পিকাডেলি। সচরাচর যাকে পৃথিবীর সব চেয়ে পুরনো ব্যবসা বলা হয়, তার সঙ্গে সেখানে মুখোমুখি মোলাকাৎ।

এ ব্যবসা সম্বন্ধে লিখবো কি না মনঃস্থির করতে পারছি নে।

শ্যামবাজারের মামা নাকি হেদো না পেরিয়ে ছ' বছরে তিন লাখ টাকা ফুঁকে দেওয়ার পর বিলেতগামী ভাগনেকে সদুপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'কোথায় যাবি বাবা, সেই জল, সেই ঘাস, সেই গাছ। ওগুলো দেখবার জন্য আবার বিদেশ যাবি কেন?'

আমাদের গ্রামের ভিতর যখন প্রথম ইঞ্জিন এসে রাতের বাসা বাঁধলো, তখন ছেলেবুড়ো সবাই হদ্দমুদ্দ হয়ে সেই কলের গাড়ি দেখতে গেল। ফিরে এসে সবাই যখন ইঞ্জিনের প্রশংসায় অষ্টপ্রহর পঞ্চমুখ তখন মুরুব্বি কলীমুল্লা বলেছিলেন, 'যা বলো যা কও, উই আমাদের আগুন উই আমাদের জল ছাড়া বাবুদের চলে না। আকাণ্ঠা পবনের নৌকোই বানাও, আর চিল্লীমারা "ইঞ্জিলই" বানাও সেই আগুন, সেই জল।'

এ তো সাধারণ লোকের কথা। স্বয়ং বাইবেল বলেছেন, সেই ঋষির মুখ দিয়েই, যিনি 'ইট, ড্রিঙ্ক অ্যাণ্ড বি মেরি' হতে সদুপদেশ দিয়েছেন, 'যা ছিল তাই হবে, যা করা হয়ে গিয়েছে তাই আবার করা হবে; এ সংসারে নূতন কিছু নেই।'

বেশীর ভাগ লোক দেশভ্রমণে যায় নূতন কিছু দেখবার জন্য। এবং গিয়ে দেখে সেই জল, সেই ঘাস। আবার অন্য অনেক লোক বিদেশ গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেশের সন্ধানে লেগে যায়। প্যারিস গিয়ে খবর নেয়, সেখানে আপন দেশের কেউ আছে কি না। তাকে খুঁজে বের করে শুধায়, 'রাইস-কারি' কোথায় পাওয়া যায়? সেই খেয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরতে বেরতে বলে, 'চলো, দাদা, চট করে মোড়ের যতুর দোকান হয়ে যাই।'—পাড়ার যতুর পান বিখ্যাত!

আমি দেশভ্রমণে উপকারিতার চেয়ে অপকারিতাই দেখতে পাই বেশী। সে বিষয়ে অন্যত্র সবিস্তর আলোচনা করেছি। তবে এ

বাবদে বলতে পারি, ভালো করে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায়, সব-কিছু পুরোতন হলেও নূতন। বিলেতের ঘাস ঘাস, কিন্তু সে ঘাস আমাদের ঘাসের মত ঘন সবুজ নয়, একটুখানি ফিকে, কেমন যেন হলদে ভাগটা বেশী। গাছপালার তো কথাই নেই। জলের স্বাদও অন্যরকম। একমাত্র আগুনে আগুনে কোনো পার্থক্য দেখিনি! তাই বোধ হয় পৃথিবীতে অগ্নি-উপাসকের সংখ্যা এখনো প্রচুর।

সেটা অবশ্য প্রথম যৌবনের প্রথম সফরে লক্ষ্য করিনি।

প্রথমবারের কথা বলছি।

এক টানা জর্মনিতে থাকার পর অচেনা জিনিস দেখে দেখে যখন মন ক্লান্ত তখন গিয়েছি নেপল্‌সে—জাহাজে করে দেশে ফিরবো বলে। জাহাজ লেট্‌। দু'দিনের তরে সেই নির্বান্ধব বন্দরে আটকা পড়ে গেলুম। নিতান্ত কোনো কিছু করবার ছিল না বলে গেলুম পম্পেই দেখতে। (এস্থলে কিঞ্চিৎ অবান্তর এবং নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও বলি, আমি স্বেচ্ছায় কেবলমাত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কখনো বাড়ি থেকে বেরইনি—বেরিয়েছি প্রয়োজনের তাগিদে। মাত্র একবার আমি কাইরো থেকে স্বেচ্ছায় পুণ্যভূমি প্যালেস্টাইন দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমানের সঙ্গম। ধর্মচর্চাতে (আচরণে নয়) আমার চিরকালের শখ।)

পম্পেই মধ্য কিম্বা দক্ষিণ ইতালিতেও বলতে পারেন। আবহাওয়া একটুখানি গরম।

পম্পেই টিলার নীচে বাস থামতে হঠাৎ দেখি সামনে একবন করবীগাছ।

ওঃ! সে কী আনন্দ হয়েছিল! এ-জীবনে প্রথম যে গাছ চিনতে শিখি সেটি করবী। আমাদের দেশে বলে ঘন্টা ফুল। মা আমায় চিনিয়ে দিয়েছিল। তারপর যখন তিনখানা বই পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন চাচা বললেন, 'করবী' আর 'কবরী'তে যেন গোবলেট না পাকাই! তারপর নিজের থেকেই শিখলুম, করবী পাঁচ

রকমের হয় ;—শ্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ এবং পাটল—কৃষ্ণকরবী এখনো দেখিনি। সর্বশেষে শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনলাম 'যক্ষপুরী'। পরে তার নাম হল 'রক্তকরবী'। এখন শিখলুম, ইতালির ভাষাতে ওলে-আন্দ্রো।

এ ফুলটি তাই কত স্মৃতি বিস্মৃতিতে বিজড়িত। 'বিস্মৃতি' বলার কারণ সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলুম, ছেলেবেলায় নান্নুরে চণ্ডীদাসের ভিটে দেখতে গিয়ে পেলুম ডাক-বাঙলোর একপাশে অজস্র করবী-গাছ—এই শুকনো খোয়াই-ভাঙার দেশ বীরভূমে।

কিন্তু করবীর সঙ্গে আমার পরিচয়ের দীর্ঘ ফিরিস্তিতে কার কোন্ কৌতূহল ? কৌতূহল তখনই হয় যখন কেউ সেই পম্পেইতে হঠাৎ দেখা করবীকে নৈর্ব্যক্তিক স্তরে তুলে রস-স্বরূপে প্রকাশ করতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথ দেশে বসেই গাইলেন,—

'আবেশ লাগে বনে
শ্বেত-করবীর অকাল জাগরণে—'[১]

সঙ্গে সঙ্গে রসের মাধ্যমে করবী এসে আমাদের হৃদয় দখল করে বসে। সার্থক ভ্রমণকাহিনী-লেখক তাই নতুন পুরাতন উভয় অভিজ্ঞতাকে সমাহিত চিত্তে স্মরণ করে রসস্বরূপ প্রকাশ করেন। ভ্রমণ উপলক্ষ মাত্র।

কিম্বা হয়তো তথ্য পরিবেশন করেন। সেটা যদি রসরূপে প্রকাশিত হয়, তবে আরো ভালো। কিন্তু রস নেই, এবং তদুপরি যদি সে তথ্য কারো কোনো কাজে না লাগে তবে সেটা বলে কি লাভ আমি ঠিক বুঝতে পারিনে। কাবুলের অনৈসর্গিক যৌন সম্পর্কের কাহিনী এদেশে কেউ কেউ শুনেছেন, সেখানে অল্পবিস্তর গণিকাবৃত্তিও আছে, কিন্তু সেসব তথ্য কারো কোনো কাজে লাগবে

(১) হেমন্ত ছাড়া অন্য কোনো সময় গাইতে হলে রবীন্দ্রনাথ এ-গানের 'হেমন্তে'র বদলে 'নিকুঞ্জে' ও 'অকালের' বদলে 'হঠাৎ' করে গাইতেন। তথ্যটি অন্য কোথাও ছাপাতে দেখিনি বলে উল্লেখ করলুম।

বলে আমার মনে হয়নি। এই নিয়ে আমার চারবার ইয়োরোপ যাওয়া হল। গণিকাবৃত্তি চোখে পড়ার কথা। এ নিয়ে সে-দেশের ছাত্রসমাজে নানা আলোচনাও হয়ে থাকে। বিশেষ করে যারা আইন ও ডাক্তারি পড়ে। সেগুলো অনেক সময় শুনতে হয়। সতীর্থরা হয়তো বা জিজ্ঞেস করে বসে, 'তোমাদের দেশে কি রকম ?'

তবু এ সম্বন্ধে আমি কোনো কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করিনি। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, যার পর হয়তো অল্প কিছু বলার সময় এসেছে।

গত বৎসর হঠাৎ খবর এল সরকার সোনাগাছির (কথাটা আসলে 'সোনাগাজী'—হুতোমে আছে) গণিকাদের প্রতি আদেশ করেছেন, তারা যেন ওপাড়া ছেড়ে চলে যায়।

তাহলে প্রথম প্রশ্ন, তারা যাবে কোথায় ? তারা যদি ভদ্রপাড়াতে একজন কিম্বা ছ'জনে মিলে ঘর ভাড়া নেয়, তবে সরকার কোন্ আইনে তাদের ধরবেন, কিম্বা যে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে তার বিরুদ্ধে সরকার কোনো মোকদ্দমা আনবেন কি না, এসব কথা খবরের কাগজে ভালো করে বেরয়নি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এরা উদ্বাস্তু হয়ে বেশী ভাড়া দিতে রাজী হবে, এবং কলকাতাতেও লোভী বাড়ি-ওলার অভাব নেই। প্রায় ঠিক এই ধরনের একটা ব্যাপার ঘটে কিছুদিন পূর্বে দিল্লী শহরে। সরকার আইন করে রেস্তোরাঁ এবং মদের দোকানে মদ, অর্থাৎ প্রকাশ্যে মদ্যপান বারণ করে দিলেন, কিন্তু দোকানে মদ কিনে বাড়িতে গিয়ে খাওয়া নিষিদ্ধ করলেন না। ফলে যে পাপকর্ম সে বাইরে করতো, পুত্রকন্যা জানতে পারতো না, সেইটে অনেক বাড়ির ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেল। ফলে পুত্র এবং কোনো কোনো স্থলে কন্যাও যদি মদ খেতে শেখে, তবে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আমি সমাজ-সংস্কারক নই তবু তখন কাগজে লিখেছিলুম, মদ্যপান এদেশে এখনো এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি, যার

জন্য জুজুর ভয় দেখাতে হবে। আসল প্রয়োজন, যেন নতুন কনভার্ট না হয়, অর্থাৎ আজকের ছেলে-ছোকরারা যেন মদ খেতে না শেখে। যে রকম আফিঙের বেলায় নতুন পারমিট না দেওয়ার ফলে আসাম থেকে আফিঙ খাওয়া উঠে যাচ্ছে। দোকানে মদ না খেতে পেয়ে কর্তা যদি বাড়িতে মদ খেতে আরম্ভ করেন, তবে তো কনভার্টের সংখ্যা বাড়বে! এ বাবদে বিধানবাবু সাউথ ক্লাব থেকে মদ তুলে দিয়ে অতি উত্তম কর্ম করেছেন। ছেলে-ছোকরারা সেখানে যেত টেনিস খেলতে। 'বারে' যেতো শরবৎ খেতে। শরবৎ থেকে শরাব প্রয়াণ কঠিন কর্ম নয়—দুটো শব্দই আরবী 'শারাবা' = 'পান করা' থেকে এসেছে।

এসব অবান্তর নয়। সরকার যদি মনে করে থাকেন যে, সোনাগাছি-বাসিন্দাদের ভিটেছাড়া করতে পারলেই সর্ব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তবে তাঁরা মারাত্মক ভুল করছেন। ভদ্র গৃহস্থ উদ্বাস্তুদের নিয়েই আমরা কি রকম হিমসিম খাচ্ছি—সেটা শেয়ালদাতে না নেমেও স্পষ্ট বোঝা যায়। এত সহজে এ সমস্যার সমাধান হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'দীর্ঘতম পন্থা অনুসরণ করলেই স্বল্পতম সময়ে পৌঁছান যায়।' এটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না বলা কঠিন, কারণ গোল্ডেন রুল ইজ দ্যাট দেয়ার ইজ নো গোল্ডেন রুল, কিন্তু সচরাচর যে ব্যবসাকে সংসারের প্রাচীনতম ব্যবসা বলে বহু পণ্ডিত স্বীকার করে নিয়েছেন তার ওষুধ একটি বড়িতেই হয়ে যাবে এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

আসলে আমরা বিলেতের অনুকরণ করছি। বিলেত, ব্রথেল বা গণিকালয় তুলে দিয়েছে, আমরাও দিয়েছি। ফলে লণ্ডনের গণিকারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে—আমাদের ছড়ায়নি। বোঝা গেল, ওষুধ না ধরাতেই আমরা উপকৃত হয়েছি বেশী।

এস্থলে একটি কথা না বললে কলকাতার প্রতি অবিচার করা হবে।

কলকাতার আপন জন না হয়েও আমি তার শত দোষ স্বীকার করি। কলকাতার শিশুরা সস্তায় খাঁটি দুধ পায় না, রুগীরা হাসপাতালে স্থান পায় না, ওষুধ কালাবাজারে ঢুকেছে, ভেজালের অন্ত নেই, এরকম অবর্ণনীয় নোংরা শহর ত্রিভুবনে নেই, ট্রাম-বাসে পায়লোয়ানরাই শুধু উঠতে পারে, শেয়ালদা-হাওড়াতে ট্রেন যা লেট হয়, তাও পানকুয়চুয়ালি হয় না—অবস্থা অবর্ণনীয়।

কিন্তু এই যে কলকাতা শহরে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত—এত বেশী পুরুষ এবং এত কম মেয়ে—এ অনুপাত পৃথিবীর কোনো বড় শহরই দেখাতে পারবে না। এটা কিছু গর্বের বিষয় নয়, কিন্তু আমি বিদেশ থেকে ফিরে বার বার গর্ব অনুভব করেছি যে, এ শহরের লোক যৌন-ক্ষুধা সম্বন্ধে কতখানি অচেতন, কিম্বা তারা সুযোগ পায়নি, সেটা কেন তৈরী করেনি, তা জানিনে।

ইয়োরোপে যখনই যুদ্ধের ফলে বা কোনো কারণে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় এবং বিদেশী সৈন্যের মিত্র বা শত্রুভাবে আগমন হয়, সঙ্গে সঙ্গে জারজ সন্তানের সংখ্যা যে কী অসম্ভব রকম বেড়ে যায়, তা দেখে সমাজসেবীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এবারে সে সংখ্যা এমনই হিসেবের বাইরে চলে গেল যে শেষটায় পাদ্রীসায়েবরাই প্রস্তাব করলেন জারজ শিশুদের যেন সমাজ ও ধর্মপ্রতিষ্ঠান আইনত ন্যায্য বলে স্বীকার করে নেয়।

শান্তির সময়েও এরকম ধারা হয়। উত্তর ইয়োরোপের কোনো একটি দেশে অনুপাত অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়ায় দেখা গেল বহু পুরুষ একটি স্ত্রী এবং একটি করে 'রক্ষিতা' পুষছে। 'রক্ষিতা' বলা ভুল, কারণ এ রমণী ভদ্রঘরের মেয়ে, বেশ্যাবৃত্তি কখনো করেনি, তার প্রতিপালকের সঙ্গে তার স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক, তার পুত্রকন্যা আছে, সমাজে সে অপমানিত নয়। অনেক স্থলে তার আসল স্ত্রী এ রমণীর খবর জানেন, এবং কোনো কোনো স্থলে পালা-পরবে দুই পরিবার একত্র হয়ে আনন্দোল্লাস করেন। বস্তুত আমাদের দেশে

কোনো পুরুষের যদি দুই স্ত্রী থাকে এবং তারা যদি ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে থাকে তাহলে সচরাচর যা হয়ে থাকে।

কোনো কোনো বুদ্ধিমান সমাজসেবী তাই প্রস্তাব করেছেন, এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার চেয়ে ঢের ভালো হয়, এই সব লোকদের আইনত দুটি বিয়ে করার অধিকার দেওয়া। কিন্তু খৃষ্টধর্মে এক স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ বেআইনী—তাকে তালাক না দিয়ে। ক্যাথলিক ধর্মে আবার ঠিক তালাকের ব্যবস্থাও নেই—সেখানে প্রমাণ করতে হয়, বিবাহের আচার অনুষ্ঠানের ত্রুটি থাকায় বিয়েটা আদপেই হয়নি। ধর্মের অনুশাসন এড়াবার জন্যে কেউ কেউ তার সুবিধেও নিয়ে থাকেন।

অথচ ইয়োরোপে আমাদের বদনামের অন্ত নেই—আমরা বহুবিবাহে বিশ্বাস করি, আমরা হারেম পুষি!

দুশমন সকলেরই থাকে। খৃষ্টের ছিল, সক্রাতেসের ছিল। আমাদেরও আছে। ইয়োরোপেও আছে।

তাদেরই কেউ কেউ আপনাকে অপ্রস্তুত করার জন্যে পাঁচজনের সামনে শুধাবে, 'আপনাদের দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে—না?'

আমি কোথায় না লজ্জা পাবো, উল্টে একগাল হাসি। যেন বঙ্গ দু'কান কাটা। বলি, 'বিলক্ষণ! একটা, দুটো, চারটে—মুসলমান হলে—যত খুশী। আর হিন্দু হলে তো কথাই নেই। এক মুখুয্যের ছিল আটশ', বাঁড়ুয্যের ছ'শ', চাটুয্যের চারশ', বেচারী গাঙ্গুলীর মাত্র আশী—ঘোষালের ফর্দটা জানা নেই।'[১] কায়েতরা অতখানি না, তবে তাঁরাও ছেড়ে কথা কননি। বার্নার্ড শ এ-ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।'

তারপর হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলি, 'এ-ব্যবস্থা অতি

---

(১) বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বিধবা বিবাহ বইয়ে পুরো হিসেব আছে। আমি স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে বলছি। তবে হিসেবটা মোটামুটি এই।

অল্পকাল স্থায়ী ছিল। আসলে ভারতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক একটি মাত্র স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসে। যদিও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অধিকার আইনত তার ষোল আনা আছে।'[১]

তারপর ধীরে ধীরে রসকসহীন অতি শুকনো গলায় বলি, 'এবারে আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আপনাদের দেশে ক'জন লোক একদারনিষ্ঠ হয়ে, অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে বা পরে অন্য কোনো কুমারী বা বিবাহিতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না এসে জীবন কাটায়? যদিও একাধিক স্ত্রীগমনের অধিকার আইনত আপনাদের নেই।'

যেন ফতেহ্‌পুর সিক্রির বুলন্দ্‌ দরওয়াজের নিচে দিয়ে যাচ্ছি। এই বিশাল উন্নতশির দেউড়ি যেন স্থপতি ইচ্ছে করেই এমনভাবে বানিয়েছেন যে, নীচে দিয়ে যাবার সময় মানুষ বুঝতে পারে সে কত নগণ্য।

কেন্‌সিংটন গার্ডেনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। গাছগুলো এমনি বিরাট, এমনি উঁচু যে, যেতে যেতে আমার মনে পড়ল বুলন্দ্‌ দরওয়াজের কথা। সেখানেও শীতের প্রভাতে কাঁপতে কাঁপতে ঢুকেছিলাম; এখানেও হেমন্তের শীতে জবুথবু হয়ে সামনের দিকে এগচ্ছি।

আকাশে একরত্তি মেঘ নেই, বাতাসে এক ফোঁটা হিম নেই—সূর্যদেব তাঁর ভাণ্ডার উজাড় করে স্বর্ণরৌদ্র ঢেলে দিয়েছেন কিন্তু শীতের দাপট কমাতে পারেননি। পার্ক থেকেই দেখতে পাচ্ছি, বয়স্করা ওভারকোট পরেছে। কাল বৃষ্টি নেমেছিল—তখন জোয়ানরা পর্যন্ত কাঁধ কুঁচিয়ে, মাথা নীচু করে, হ্যাট সামনের দিকে

(১) এখন অবশ্য আইন বদলেছে।

নামিয়ে দিয়ে হন হন করে চলেছিল গায়ের গরম বাড়াবার জন্য। মেয়েরা কী করে হাঁটু পর্যন্ত ঐটুকু সিল্কের মোজা পরে শীত ভাঙায় সে এক সমস্যা। প্যারিসে দেখেছি, পেভমেণ্টে যারা পুরনো বই বিক্রি করে তাদের কোনও প্রকারের আশ্রয় নেই বলে দোকানের সামনে ঘন ঘন পাইচারি করে, আর দুই বাহু প্রসারিত, ডান হাত শরীরের বাঁ দিকে আর বাঁ হাত ডান দিকে থাবড়ায়। মাঝে মাঝে হাতের তেলো গরম করার জন্য দু' হাত আঁজলা করে মুখ দিয়ে জোর ফুঁ দেয়।

কাল রাতের বৃষ্টি না আজ ভোরের হিমে গাছের পাতা সব ভেজা। সেগুনকাঠের পাতার মত তারা ওজনে ভারী—সারা গ্রীষ্মকাল রোদ আর জল খেয়ে খেয়ে তারা যেন পেটের অসুখ করে কেউ হলদে, কেউ ফিকে, কেউ বা কালো হয়ে গিয়েছে। আর কেউ টকটকে লাল—শুনেছি, ঠিক মরার সময় কোনও কোনও মানুষের সব রক্ত এসে মুখে জড়ো হয়। টুপ করে কখনও এক ফোঁটা জল এসে নাকের উপর পড়ে, কখনও বা হাতের উপর। কী ঠাণ্ডা! সঙ্গে সঙ্গে অতি নিঃশব্দে দুটি লাল পাতা।

দু' দিকে সবুজ ঘাসের লন। ঠিক সবুজ বলা চলে না। নীলের ভাগটা কম, হলদেটাই বেশী। এখন না হয় হেমন্তের প্রথম শীতে তারা ফিকে হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ভর গ্রীষ্মকালেও আমি ইউরোপে কখনও দেশের কালো-সবুজ দেখিনি। আর ঘাসগুলোই বা কী অভদ্র রকমের লম্বা আর মোটা! একে ত তাদের যত্ন নেওয়া হয় প্রচুর তার উপর বোধ হয় এদের মাড়িয়ে পাইচারি করা বারণ বলে কী রকম উদ্ধতভাবে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। এরাও ভেজা। গায়ে হাত বুলতে ইচ্ছে করে না। দেশে শীতের সকালে নৌকো দিয়ে যাবার সময় যে রকম ভিজে সাপলা পাতায় হাত দিতে গা কির কির করে।

দু' দিকের সবুজ লনের মাঝখানে কালো পিচের রাস্তা। ছোট্ট,

এক ফালি। এঁকেবেঁকে একটুখানি এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে চলে গিয়েছে বিরাট হাইড্-পার্কে, বাঁ দিকে গিয়েছে এ-বাগানেরই 'গোলদিঘি'র দিকে। সেই ফালি রাস্তাটুকু আবার নিয়েছে নানা রঙের মোজায়িক, কেটেছে ঝরা পাতার আলপনা। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য আলপনা একরকমের থাকে না। মুখে পাইপ, হলদে গোঁপওলা বুড়ো মালী এসে ঝাঁট দিয়ে সাফ করে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাসে আরেক প্রস্থ রঙীন পাতা ঝরে পড়ে—আবার নূতন আলপনা আঁকা হয়।

বেলা এগারোটা। সমস্ত পার্কে মেরে কেটে দশ-বারো জন লোক হয় কি না-হয়। শুনেছি আরও সকালে, ছুটির দিনে এবং গ্রীষ্মকালে বেশী ভিড় হয়। লণ্ডন শহরের লোক যে কাজ করে, ছুটির দিন ছাড়া আলসেমি করে না, এ-তত্ত্বটা এদের ফাঁকা পার্ক দেখলেই বোঝা যায়। ইতালিতে অন্য ব্যবস্থা। তাদের পার্ক সব সময়েই ভর্তি—অবশ্য সে দেশে টুরিস্টও যায় বেশী—এবং তাদের 'পাব'ও সব সময়েই গুলজার। সকাল দশটাই হোক আর বিকেল চারটাই হোক—জোয়ান মদ্দেরা কাজকর্ম ছেড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সস্তা লাল মদ খায় আর 'ব্যাক্-গ্যামন্' খেলে। এ-খেলাটা আমি দেশে কখনও দেখিনি, অথচ ভূমধ্য সাগরের পারে পারে, ইতালি গ্রীস তুর্কি লেবানন প্যালেস্টাইন মিশর সর্বত্র প্রচলিত। তাই বোধ হয় এরা কেউ দাবা খেলাতে নাম কিনতে পারেনি।

'ব্যাক্-গ্যামনের' সুবাদে একটা কথা বলে নিই। মিশরে ঐ খেলাতে পয়েন্ট গোনা হয় ফার্সীতে—আরবীতে নয়। আমরা যে রকম টেনিস খেলার সময় 'থার্টি ফর্টি', 'লাভ ফিফ্‌টিন', 'থার্টি অল্' বলি—'ত্রিশ-চল্লিশ', 'ভালবাসার পনেরো' বা 'ত্রিশ সমস্ত' বলিনে। ফার্সীতে নম্বর গোনা থেকে বোঝা যায় খেলাটা আসলে ইরান থেকে মিশরে গিয়েছে। ঠিক তেমনি বাঙলা দেশের একাধিক গ্রাম্য খেলাতে দেখেছি, নম্বর গোনা হয় কিছু-জানা-কিছু-অজানা ভাষায়—

পুরোপুরি বাঙলায় নয়। এগুলো তবে কোন ভাষা থেকে এসেছে? আমার বিশ্বাস, সত্যকার রিসার্চ করলে তার থেকে বেরবে আর্যরা বাঙলা দেশে এসে কোন জাতি-উপজাতির সংস্পর্শে এসেছিল। অনেক পণ্ডিত বলেন, সিঁথির সিঁদুর আমরা সাঁওতালদের কাছ থেকে নিয়েছি। আমার বিশ্বাস, খেলার নম্বরের অনুসন্ধান করলে আরও বেশী তথ্য এবং তত্ত্ব বেরবে। মমাগ্রজ গ্রামের অবাঙলা নাম নিয়ে বহু বৎসর খেটে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন আর্যভাষীরা কোন্ কোন্ উপজাতির সংস্রবে এসেছিল। তাঁর ওসব লেখা কেউ পড়ে না। গবেষণা বলতে বাঙলা দেশে বোঝায়, তিনখানা বই পড়ে চতুর্থ বই লেখা। অর্থাৎ একখানা বই থেকে গাপ্-মারা চুরি; তিনখানা বই থেকে চুরি-করা গবেষণা।

বেশী হাঁটাহাঁটি করলে পাছে ভগবান আসছে জন্মে ডাকহরকরা বানিয়ে দেয় তাই গোলদিঘির কাছে এসে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লুম। পুকুরের জল স্বচ্ছ কালো। চতুর্দিকে অনেকখানি খোলা বলে জোর বাতাস শুকনো পাতা পুকুরের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে নিজেই ঢেউয়ে ঢেউয়ে এক পাড়ে জড়ো করছে। মালী সেখানে দাঁড়িয়ে লম্বা আঁকশি দিয়ে টেনে এনে পুকুর সাফ রাখছে। একপাল পাতিহাঁস ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। বাতাস হাড়ে হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে, স্বচ্ছ কালো জলের দিকে তাকিয়ে সে শীত যেন তার চরমে পৌঁছচ্ছে আর আহাম্মুকের মত ভাবছি, হাঁসগুলো ঐ হিমে থাকে কী করে? উত্তর সরল; হিমালয়ের সরোবরে যখন থাকতে পারে তখন এখানেই বা থাকতে পারবে না কেন? কিন্তু চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

হঠাৎ একটা ধেড়ে রাজহাঁস বিরাট দুটো পাখা এলোপাতাড়ি থাবড়াথাবড়ি করে পড়ি-পড়ি হয়ে হয়ে ধপ্ করে নামল পাতিগুলোর মাঝখানে। তারা ভয় পেয়ে প্যাঁক প্যাঁক। এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। কী দরকার ছিল এদের এই শান্তিভঙ্গ করার? রাজহাঁসটা

ভেবেছে, পাতিগুলো এতক্ষণ ধরে ঐ কোণে যখন জটলা পাকাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই ভাল খাবারের সন্ধান পেয়েছে।

তাই হবে। নিশ্চয়ই তাই। ইয়োরোপের পাতিজাতগুলো যখন এশিয়া আফ্রিকায় খাবার পেয়ে জটলা পাকাল তখন ধেড়ে ইংরেজ তাদের তাড়িয়ে দিয়ে রাজ্য বিস্তার করল। সাধে কি আর বিষ্ণুশর্মা এসব্ বলেছেন, পশুপক্ষীর কাছ থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয়। কিন্তু তাই করে কতকগুলো জাত যে পশুর মত আচরণ করলে, এবং এখনও করছে, তার কী?

আচ্ছা, যদি খুব শীত পড়ে আর পুকুরের জল জমে যায়—আমি স্বচক্ষে রাইনের মত নদী পর্যন্ত জমে যেতে দেখেছি—তাহলে এ হাঁসগুলো যায় কোথায়? কোথায় যেন পড়েছি, কবি দুঃখ করে বলছেন, 'আমি মানস সরোবরের যেন ডানা-ভাঙা রাজহাঁস। চতুর্দিকের জল জমে গিয়ে বরফ হয়ে হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, শেষটায় আমাকে পিষে মারবে। আমার সঙ্গী-সাথীরা অনেকদিন হল দক্ষিণে চলে গিয়েছে। আমার যাবার উপায় নেই।' হায়, আমাদের সকলেরই তাই। কারও পা খোঁড়া, কারও ডানা ভাঙা, কারও প্রিয়া পালিয়ে গিয়েছে, কাউকে বা সরকার জেলে পুরে দিয়েছে—সবাই যেন বলছে, 'পিছিয়ে পড়েছি আমি, যাব যে কী করে!'

এদের জন্য নিশ্চয়ই কোনও ব্যবস্থা আছে। লণ্ডন ত আর দেন্দেড়ে গ্রাম নয় যে, হাঁসগুলো গোলাবাড়ির খামার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেবে। পশুপ্রীতি ইংরেজের যথেষ্ট আছে। মিশর পরাধীন থাকাকালীন এক ইংরেজ হাকিম যখন এক মিশরী খচ্চরওলাকে জরিমানা করে জন্তুটাকে পিটিয়ে আধ-মরা করে দেওয়ার জন্য—তখন সে মনের দুঃখে বলেছিল, 'আমি ত জানতুম না রে খচ্চর, আদালতে তোর এক দরদী ভাই রয়েছে!'

সামনে দিয়ে একটি মেম সায়েব চলে গেল। লম্বা লম্বা পা

ফেলে—দেশের মা মাসীরা দেখতে পেলে বলতেন, 'হুনোমুখো'। না পরনে সে স্কার্ট নয় যা পরে বাসে উঠতে গেলে ছিঁড়ে যায়। এর পরনে হুবহু চীনা পাতলুন্। ক্লাইভ স্ট্রীটে বিস্তর দেখেছি। তবে চামড়ার সঙ্গে সেঁটে টাইট, মেরে কেটে পায়ের ডিম ছাড়ায় কি না-ছাড়ায়, আর লাল সবুজের মারাত্মক চেক্। শিলওয়ার বুঝি, বড়ী মোরী—অর্থাৎ ঢিলে পাজামা বুঝি, চীনে পাজামা বোঝাও অসম্ভব নয়, কিন্তু এই সৃষ্টিছাড়া পাজামা পরলে রমণীদেহের কোন্ সৌন্দর্যের কী যে খোলতাই হয় সেটা আদপেই বুঝতে পারলুম না। আর শরীরটাই না কী বাহারে! বার তিনেক না ঘোরালে বোঝা যায় না কোন্টা সামনের দিক, কোন্টা পিছন। যেন 'মডার্ন পেন্টিং'। গ্যালারিতে দেখে আমাদের মত বেকুবদের মনে সন্দ জাগে উল্টো টাঙায় নি ত?

যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা। যুবতী কখনও কুৎসিতা হয় না। তবে যার যেটা মানায় তাকে সেটা পরতে হয়। আজকাল ত আরও কত সব কল বেরিয়েছে, শুনতে পাই। তা না হয় নাই বা হল। একটু ফোলা ফাঁপার জামা কাপড়ও ত আছে। সাড়েবাইশ-গজী শিলওয়ার না-ই বা হল।

পিছনে আবার একটা কুকুর। মনিবের সেই মেলগাড়ির তেজে চলার সঙ্গে পাল্লা রাখতে গিয়ে এই শীতে হাঁপিয়ে উঠেছে। অতিশয় অপ্রিয়দর্শন। 'ডাক্‌সহুন্ট' না কী যেন নাম। পিপের মত দেহ। মনে হয় যেন দুটো কুকুর জুড়ে একটা বানানো হয়েছে। অথচ আস্তে আস্তে চললে একেও হয়ত মন্দ দেখাত না।

সবশুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে যাকে বলে 'কাল্ট্ অব দি আগ্‌লি' অর্থাৎ 'কুৎসিত ধর্ম'। মডার্ন কবিতা। যার বিষয়বস্তু, ডাস্টবিন্, পচা ইঁদুর, মরা ব্যাঙ।

বিরক্তি হয়নি, দুঃখ হয়েছিল। আসলে এরা ত কুৎসিত নয়। এসব গায়ে পড়ে করা। দেশকালপাত্র।

বাঁচালে। হাওয়াটা বন্ধ হয়েছে। ঐ হাওয়াটাই যত অনর্থের মূল। উনি বন্ধ হলে বেশ ওম ওম ভাবটা জমে আসে। বেঞ্চির হেলানে মাথাটা চিত করে আকাশমুখো করলুম। ধুপ করে হ্যাটটা পড়ে গেল। তা পড়ুক। বন্ধ চোখে লাগল রোদের কুসুম-কুসুম পরশ। দেশে গরমের দিনে চোখে ঠাণ্ডা জল দিলে যে রকম আরাম বোধ হয়। হাওয়া বন্ধ হয়েছে বলে পোড়া পেট্রলের গন্ধও নাকে আসছে না। এদেশের লোকের বোধ হয় অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। আমি ত সর্বক্ষণ হাতে গোঁপে চামেলি ঘষি। ভাগ্যিস খানিকটে আতর স্যুটকেসের পকেটে করে অজ্ঞানতে চলে এসেছে। এদেশের ও দ্য কলোন লেভেণ্ডার ছিটোলে শীতটা যেন আরও ছমছম করে ওঠে।

এবারে হেমন্তটা এই পোড়া লণ্ডনেও হেমন্ত বলেই ঠেকছে। কাল গিয়েছিলুম মোটরে করে লণ্ডনের উত্তরে, গ্রামাঞ্চলে মাইল বিশেক দূরে। তখন চোখে পড়েছিল সত্যকার হেমন্ত।

হেমন্ত নিয়ে এ-সংসারের সব কবিই বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় শ' দেড়েক গান রচেছেন বর্ষা নিয়ে। হেমন্ত নিয়ে পাঁচটি হয় কি না-হয়। কবিগুরু কালিদাস পর্যন্ত ঋতুসংহারে হেমন্তের বন্দনা করতে গিয়ে যা রচেছেন তার তুলনায় তাঁর বর্ষা বর্ণন শতগুণে শ্রেয়ঃ। তবু তাঁর কলম জোরদার। হেমন্ত ঋতুতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন তিনি মানসযাত্রী হংস ক্রৌঞ্চমিথুন আর মাটির দিকে দেখেছেন পরিপক্ক শস্যে গ্রামের প্রত্যন্ত প্রদেশ পরিপূর্ণ। হেমন্তের সেই সফল শান্তির পূর্ণতা দেখে প্রার্থনা করেছেন ;—

বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী
পরিণতবহুশালিব্যাকুলগ্রামসীমা।
সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চমালাপরীতঃ
প্রদিশতু হিমযুক্তঃ কাল এব সুখং বঃ॥

হঠাৎ শুনি ধমকের শব্দ। রমণীকণ্ঠে।

শিক্ষিত ভদ্রলোকের ইংরিজিই ভাল করে বুঝিনে, কক্‌নি বোঝা আমার কর্ম নয়। তাকিয়ে দেখি, আমার সামনে ডান দিকে একটি পেরেম্বুলেটর। তার পিছনে একটি ছোট্ট বাচ্চা। চলি-চলি-পা-পা করে গোলদিঘিতে ক্ষুদে একটি রবারের নৌকা ভাসাবার চেষ্টা করছে। ঢেউয়ের ধাক্কায় সেটা বার বার কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। ওদিকে তার আয়া অসহিষ্ণু হয়ে লাগিয়াছে তাকে এক বিকট ধমক: সে-ধমকের ধাক্কায় রাজ পাতি সব হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে পালাচ্ছে, নৌকোটা পর্যন্ত ডুবুডুবু।

শুনেছিলুম, এ-দেশে বাচ্চাদের ধমক দেওয়া হয় না। দেশের এক অতি আধুনিক পরিবারে। সেখানে অতিথি এলে এক ছেলে পিঠে পিন ফুটাত, অন্য ছেলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কাঁচি দিয়ে তাঁর টাইটি কাটতে আরম্ভ করত। ধমক দিতে গেলে বাপ-মা অতিথিকে বিলেতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

ফের ঘাড় ঝুলিয়ে দিলুম বেঞ্চির হেলানে, মুখ তুলে দিলুম আকাশের দিকে। অস্ফুট কণ্ঠে বললুম, 'হায় পেস্তালৎসি, হায় রে ফ্রোবেল্, কোথায় তুমি ফ্রয়েট! এই কক্‌নি রমণীকে পর্যন্ত তালিম দিয়ে শাবুদ করতে পারনি!'

এবারে শুনি বাঁদিক থেকে, 'বেগি পান্'। মানে? ওঃ—'বেগ ইয়োর পার্ডন'! হকচকিয়ে চোখ খুলে দেখি, আমার অজানতে এক ভদ্রলোক বেঞ্চির অন্য প্রান্তে আসন নিয়েছেন।

সুন্দর চেহারা। ঢেউ-খেলানো সোনলী ব্লণ্ড চুল—হাওয়াতে অল্প উস্কোখুস্কো। নাকটি খাঁটি রোমান, ব্রিজের চিহ্নমাত্র নেই। মুখের রঙ পুরানো হাতির দাঁতের মত। শুধু গাল দুটিতে অতি অল্প

গোলাপির ছোঁয়াচ লেগেছে। একটুখানি গোঁপ—মাথার চুলের চেয়ে এক পোঁচ বেশী সোনালী।

আমি তাড়াতাড়ি বললুম 'আজ্ঞে না। আমি কিছু বলিনি।' তারপর আমতা আমতা করে বললুম, 'আমি শুধু পেস্তালৎসির কথা স্মরণ করছিলুম।'

হাত দু'খানি জানুর উপর ভারী শান্তভাবে রাখা, যেন রেমব্রান্টের ছবিতে আঁকা। সরু লম্বা লম্বা। নখে লালের আভাস। চমৎকার মেনিকোর করা। বয়স ৩০।৩৫। ঠিক বলতে পারব না। সায়েব সুবোদের বয়েস আমি অনুমান করতে পারিনে।

এবারে আমার পালা। সায়েব কী যেন বললে। বুঝতে না পেরে বললুম, 'বেগি পান্।' সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বুঝে গেলুম বলেছে, 'থ্যাঙ্ক গড্' ধরনের কিছু একটা। কিন্তু তখন ত আর 'বেগ্ ইয়োর পার্ডন'টা ফের বেগ্ করে ফেরত নেওয়া যায় না।

পাশে বেঞ্চির উপর অত্যুৎকৃষ্ট শোলার হ্যাট, তার ভিতরে দু'খানা দাস্তানা। পরনে হেরিং মাছের কাঁটার নক্সা-কাটা নূতন সুট। শক্ত কলার, ডোরা কাটা টাই—কোন পাবলিক স্কুলের নিশান-মারা হতেও পারে—কফের বোতাম ঝিনুকের, মাঝখানে কী একটা ঝক্ঝক্ করছে। পায়ে ছুঁচলো কালো জুতো। এবং বিশ্বাস করবেন না, তার উপর স্প্যাট!

ত্রিশ বৎসর পূর্বে এ-রকম বেশভূষা মাঝে-মধ্যে দেখেছি। বইয়ে বর্ণনা পড়েছি। এ কি বিংশ শতাব্দীর রিপ্ ভান্ উইন্‌ক্‌ল্?

তখন মনে পড়ল কেনসিংটন গার্ডেনের আশেপাশে থাকেন এদেশের খানদানীরা। কাশ্মীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে হিন্দী কবি গেয়েছেন,

'য়হী স্বর্গ সুরলোক
য়হী সুরকানন সুন্দর।
য়হাঁ অমরোকা ওক,
য়হাঁ কঁহী বসত পুরন্দর॥'

এইটেই স্বর্গসুরলোক, এইখানেই কোথাও পুরন্দর বাস করেন। শুনেছি, এরই আশপাশে চার্চিল থাকেন, এপস্টাইন বাস করেন তবে ইনি খানদানী লোক। কাজকর্ম নেই। অবেলায় পার্কে রোঁদ মারতে বেরিয়েছেন।

ছিঃ। তখন দেখি তাঁর বা দিকে একটা ক্রাচ—খোঁড়ারা যার উপর ভর করে হাঁটে। নিজের মনকে কষে কান মলে দিলুম—উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ না করে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য।

বললেন, 'পেস্তালৎসি কিন্তু শেষ বয়সে আপন মত অনেকখানি পরিবর্তন করেছিলেন। বলতেন, বাচ্চাদের বড্ড বেশী যা-তা করতে দিতে নেই।'

আমি অবাক। আমি ত শুনেছি ইংরেজ অচেনার সঙ্গে কথা কয় না। ইনি আবার খানদানী।

ভদ্রলোক কিন্তু পাঁচ সিকে সপ্রতিভ। কঞ্জুস যে রকম চুনের কৌটো থেকে খুঁটে খুঁটে শেষ রত্তি বের করে, ইনি ঠিক তেমনি দুটি নীল চোখ দিয়ে আমার চোখ দুটি খুঁটে খুঁটে শেষ চিন্তা বের করে নিচ্ছেন।

বললেন, 'সে আমি বেশ জানি, প্রাচ্যদেশীয়দের সঙ্গে বিনা পরিচয়েই কথা আরম্ভ করা যায়।' মুখে অল্প অল্প হাসি-খুশির ভাব।

আমি শুধালুম, 'আপনি কি অনেক প্রাচ্যদেশীয়দের চেনেন।'

বললেন, 'আদপেই না। আপনিই প্রথম।'

আমি বললুম, 'সে কী? এখন ত লণ্ডনে বিদেশীই বেশী বলে মনে হয়। আমি ত ভেবেছিলুম পাছে এদের ঠেলায় খাস লণ্ডন-বাসীরা শহরছাড়া হয় তাই ম্যাক্‌মিলানকে প্রস্তাব করে পাঠাব কাঁটার তার দিয়ে দিয়ে লণ্ডনের আদিবাসীদের জন্য (আমি 'এবরো-জিনালস্' শব্দটি প্রয়োগ করেছিলুম) আলাদা মহল্লা করে দেবার জন্য। সাইনবোর্ডে লেখা থাকবে, "প্রাণীদের খাবার দেওয়া বারণ। হুকুম অমান্য করলে এক পৌণ্ড জরিমানা।" কী বলেন?'

বললেন, 'খাঁটি কথা। আমাদের পাড়া ত যায়-যায়।'

ইচ্ছে যাচ্ছিল শুধাই কোন্ পাড়া। কিন্তু ইনি যখন প্রাচ্য কায়দায় বিনা পরিচয়ে আলাপ আরম্ভ করেছেন, তখন আমার উচিত প্রতীচ্য কায়দা অনুসরণ করা।

বললুম, 'কলকাতায় ত তাই হয়েছে। আমরা কলকাতার আদিবাসীদের কোণ-ঠাসা করে এনেছি।'

তিনি শুধালেন, '"আমরা" মানে কারা?'

এ ত তোফা ব্যবস্থা। উনি প্রাচ্য পদ্ধতিতে দিব্য প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুধিয়ে যাচ্ছেন, আর আমি নেটিভ ছুরি-কাঁটা নিয়ে আনাড়ীর মত কিছুই মুখে তুলতে পারছিনে। ঠিকই ত। সেই কথামালার গল্প। বক তার লম্বা ঠোঁট চালিয়ে কুঁজো থেকে টপাটপ খাবার তুলে নিচ্ছে আর আমি খেঁকশেয়ালটার মত শুধু কুঁজোটার গা চাটছি। আর ব্যবস্থাটা করেছে বকই।

কিন্তু হলে কি হয়? ইংরেজের বাচ্চা। বেশীক্ষণ প্রশ্ন শুধোবে কী করে? অনভ্যাসের ফোঁটা নয়, অনভ্যাসের লাল লঙ্কা। খাবে কতক্ষণ!

আমি বললুম, 'আমি শিক্ষাবিদ্ নই, তবু জানতে ইচ্ছা করে এ দেশের শিক্ষিত পরিবারে বাচ্চারা কতটুকু যাচ্ছেতাই করার সুযোগ পেয়েছে!'

এবারে ইংরেজের ইংরিজিপনা আরম্ভ হল। অনেকগুলো সব্‌জনক্‌টিভ মূড ব্যবহার করতে পেরে ভদ্রলোক যেন বেঁচে গেলেন। ঐ মূডটাই ইংরিজিতে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয়, কারণ এতে প্রকাশ পায় অনিশ্চয়তা। 'শুড' 'উডে'র ছড়াছড়ি—'আই শুড সে,' 'ইট্ উড্ অ্যাপিয়ার', 'ওয়ান মাইট থিনক্' থাকলেই বুঝতে হবে ইংরেজ পাকাপাকি কিছু বলতে চায় না, কিংবা ভদ্রতা প্রকাশ করতে চায়—ফাউলার যা বলুন, বলুন। আমরা এ-জিনিসটেই প্রকাশ করি অতীতকাল দিয়ে। শ্বশুরমশাই যখন জিজ্ঞেস করেন, 'তা হলে

বাবাজী আসছ কবে?' আমরা ঘাড় নীচু করে বলি, 'আজ্ঞে আমি ত ভেবেছিলুম ভাদ্র মাসে এলেই ভাল হয়।' আসলে কিন্তু বলতে চাই, 'আমি ভাবছি···।' তা বলিনে; অতীতে ফেললে বিনয় প্রকাশ হয় অনিশ্চয়তাও বোঝানো হয়, অর্থাৎ শ্বশুরমশাই ইচ্ছে করলেই আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা নাকচ করে দিতে পারেন।

ইংরেজ বললেন, 'অন্য লোকে যে আমাদের "দ্বীপবাসী" বলে সেটা কিছু মিথ্যে নয়! ঐ পেস্তালৎসি, ফ্রোবেলের কথা বলছিলেন না? এদের তত্ত্বকথা সর্বজনমান্য হয়ে গেলেও আমরা সেগুলো গ্রহণ করি সক্কলের পরে। চ্যানেলের ওপার থেকে যা-কিছু আসে তাই যেন আমরা একটু সন্দেহের চোখে দেখি। আর গ্রহণ করলেও সমাজের সব-শ্রেণী একই সময়ে নেয় না। আমাদের বাড়িতে—কিছু মনে করবেন না, একটু ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে—'

আমি বললুম, 'প্রাচ্য পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত হওয়াটাই রেওয়াজ।'

'ধন্যবাদ। আমাদের বাড়িতে এখনও প্রাচীন পন্থা চালু। দুনিয়ার আর সর্বত্র সেন্ট্রাল হীটিঙ কিংবা ইলেকট্রিক দিয়ে ঘর গরম করা হয়, আমাদের বাড়িতে এখনও "লগ্ ফইয়ার"—কাঠের আগুন। ওঃ! একটা ঘটনা মনে পড়ল। আপনি জাওয়ারব্রুখ্ ডাক্তারের কথা শুনেছেন?'

যদিও লোকটি অতিশয় ভদ্র, মাত্রাধিক ভদ্র বললেও ভুল বলা হবে না, তবু একটু বিরক্ত হলুম। এই ইংরেজরা কি আমাদের এতই অগা মনে করে? বললুম, 'সেই যিনি সর্বপ্রথম ফুস্‌ফুসের অপারেশন আরম্ভ করেন?'

ইংরেজের তারিফ করতে হয়—মানুষের গলা থেকে মনের ভাব চট করে বুঝে নেয়। ভদ্রলোক বার বার মাফ চাইতে আরম্ভ করলেন। আমিও একটু লজ্জা পেলুম।

বললেন, 'হাজারটা ইংরেজের একটা ইংরেজও ওঁর নাম জানে না। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম।'

আমিও ভদ্রতা করে বললুম, 'আমিও জানতুম না—যদি না এক জর্মন ডাক্তারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না হত। তারপর কী বলছিলেন, বলুন।'

'১৯২৮-এ যখন পঞ্চম জর্জের শক্ত ব্যামো হয়, তখন তাঁর কাছে ইংরেজ ডাক্তাররা পাঠালে রাজার এক্স-রে ছবি। ওঁর মতামত জানতে চাইলে—বুকে অপারেশন করা হবে, না শুধু ফুটো করলেই হবে, না ড্রেন করতে হবে, না কি? এবং এ-কথাও জাওয়ারব্রুখ বুঝে গেলেন যে, আর যা হয় হোক, কোনও বিদেশী সার্জনকে দিয়ে রাজার অপারেশন করা চলবে না। ইংরেজ ডাক্তারগোষ্ঠী তা হলে আপন দেশে মুখ দেখাতে পারবে না।'

আমি বললুম, 'আশ্চর্য! আমাদের গাঁধীকে ত ইংরেজ ডাক্তারই অপারেশন করেছিল।'

একটু চুপ থেকে বললেন, 'গল্পটা এখানেই শেষ নয়। কয়েক-দিন পর ডাচেস অব কনোট না কেণ্ট, কার জানি শক্ত ব্যামো হয়েছে। জাওয়ারব্রুখকে প্লেনে করে—এখন ত প্লেন ডাল-ভাত—লণ্ডন আনানো হল। অর্থাৎ ডাচেসের বেলা জর্মন ডাক্তার চললে চলতেও পারে, রাজার বেলা নয়!'

আমি বললুম, 'বা রে!'

বললেন, 'এখানেও শেষ নয়। জাওয়ারব্রুখ ত রুগীর ঘরে ঢুকে রেগে কাঁই। এ রুগী ত ভয়ে কাঁপছে না, কাঁপছে শীতে। রুগীর লেপ ত লেপ নয়, ভিজে কাঁথা। বললেন, এ-ঘরে রুগীর চিকিৎসা চলবে না। বেশ চড়া গলাতেই নাকি বলেছিলেন, মানুষ থাকার উপযোগী এবং ভদ্র (রিজনেব্‌ল) ঘরে ওঁকে নাকি নিয়ে যেতে হবে। একে জর্মন, তায় ডাক্তার—চড়া গলাতে বলবেই ত। তখন আরম্ভ হল তুল-কালাম কাণ্ড। বহু হট্টগোলের পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল অন্য ঘরে—সেখানে একটি ইলেক্‌ট্রিক হীটার কোনও গতিকে লাগানো হল।'

'ডাক্তার কী বললেন জানেন ? বললেন, "কিছু হয় নি ; কালই সেরে যাবেন।" এবং সেরে গেলেনও।'

আমি বললুম, 'আশ্চর্য !'

তিনি বললেন, 'এও শেষ নয়। পরদিন ড্যুক দিলেন ডাক্তারকে বিরাট ভোজ। তার পরিচিত লাট-বেলাট সবাইকে নেমন্তন্ন করা হল। স্বয়ং ডাচেস সেরে উঠে ব্যানকুয়েটে বসলেন। চার্চিলও ছিলেন। তারপর কী কাণ্ড হল জানেন ?'

'ভোজ খেয়ে হোটেলে ফিরে এসে জাওয়ারব্রুখ দেখেন সেখানে আরেক কাণ্ড। চেনা আধা-চেনা যে তাঁকে দেখে সেই মাথা নিচু করে বাও করে ? ওয়েটার, ম্যানেজার সবাই তাঁর পিছনে পিছনে ছুটছে ? "হুজুরের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না ত, হুজুরের কী চাই ?" ডাক্তার তো অবাক। ডাচেসের জন্য গরম ঘরের ব্যবস্থা করেই এতখানি ?'

'আসলে তা নয়। শোবার ঘরে গিয়ে ডাক্তার দেখেন, তাঁর টেবিলের উপর সন্ধ্যাবেলাকার কাগজ। তাতে মোটা মোটা হরফে লেখা "জর্মনির ডাক্তার জাওয়ারব্রুখ রাজাকে আজ সন্ধ্যায় অপারেশন করলেন !" খবরের কাগজ সব-কিছু জানে কি না ! জাওয়ারব্রুখ লণ্ডনে, ঐ সময়ে, টায়টায়।'

আমি আবার বললুম, 'আশ্চর্য ! জাওয়ারব্রুখ্ প্রতিবাদ করলেন না ?'

তিনি বললেন, 'পরের দিন ভোরেই তাঁকে প্লেনে তুলে দেওয়া হল—এ্যারপোর্টে ড্যুক ডাচেস সবাই উপস্থিত। হৈহৈ-রৈরৈ। দেশে গিয়ে দেখেন, ইতিমধ্যে মার্কিন কাগজগুলো বলতে আরম্ভ করেছে, জাওয়ারব্রুখ্ অস্তর করার জন্য এক মিলিয়ন পৌণ্ড পেয়েছেন। জর্মন কাগজরা আত্মম্ভরিতায় ফেটে যাবার উপক্রম। জাওয়ারব্রুখ্ এঁকে ওঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কী করা উচিত। সবাই বলে এই ডামাডোলের বাজারে কেউ তোমার প্রতিবাদ (দেমাঁতি) শুনবে না। চেপে যাও।'

'তারপর।'

ঠিক সেই সময়ে এক তাগড়া লম্বাচৌড়া নার্স এসে উপস্থিত তাঁকে তুলে ধরল। তিনি ক্রাচ তুলে নিয়ে এক দিকে ধরলেন, অন্য দিকে ভর করলেন নার্স। সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বারোটার ঘণ্টা। বললেন, 'ও রেভোয়া'—অর্থাৎ 'আবার দেখা হবে'। গুড্‌ বাই নয়। তার অর্থ অন্য।

কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন জাগল, জাওয়ারক্রুথ্‌ কি জানতেন তাঁকে ডাচেসের বাড়িতে আনা হয়েছিল তাঁর অসুখের ভান করে। ঐ সময়ে তিনি যেন লণ্ডনে হাতের কাছে থাকেন। অপারেশনে যদি গণ্ডগোল হয়, তাঁকে তখ্‌খুনি ডেকে পাঠাবার জন্য।

যাক্‌গে। কালই ত জর্মনি যাচ্ছি। আমার বন্ধু পাউলকে শুধব। সে গুণী, সব জানে।

বহু চেষ্টা করেও লণ্ডনের সঙ্গে দোস্তী জমাতে পারলুম না। পূর্বেও পারিনি। কারণ অনুসন্ধান করে আশ্চর্য বোধ হয়েছে, যে শহরকে দশ এগারো বছর বয়স থেকে ইংরিজি ভাষা ও সাহিত্যের মারফতে চিনতে শিখেছি তার সঙ্গে হৃদ্যতা হয় না কেন? বোধহয় ইংরেজ এদেশে রাজত্ব করেছে বলে। বোধ হয় বহুকাল ইংরেজের গোলামী করেছি বলে তার প্রতি রাগটা যেন যেতে চায় না। তার সদ্‌গুণ দেখলে রাগটা আরো যেন বেড়ে যায়। তখন মনে হয়, এর সঙ্গে দোস্তীটা জমাতে পারলে জীবনটা আরো মধুময় হতে পারতো।

কিন্তু আমি তো এ ফরিয়াদে একা নই। ফরাসীরা তো ইংরেজকে সোজাসুজি অনেক কথা বলে। মাদাম্‌ টাবউই বই লিখেছিলেন —'পারফিডিয়াস এলবিয়ন অর আঁতাঁৎ কর্দিয়াল।' জর্মন, হাঙ্গে-

রিয়ান এবং অন্যান্য জাত অত কড়াভাবে কথাটা বলেনি বটে, কিন্তু ইংরেজের প্রকৃতি যে আর পাঁচটা জাতের মত নয় সে কথা সবাই স্বীকার করে নেয়। কেউ ব্যঙ্গ করেছে, কেউ সহিষ্ণুতার সদয় হাসি হেসেছে। এ শুধু টুরিস্টদের সাধারণ অভিজ্ঞতা নয়, হাইনে, ভলতেয়ার, জোলার মত বিচক্ষণ মহাজনরা যা বলে গেছেন সে তো কিছু ঝেড়ে ফেলে দেবার মত নয়।

কিন্তু একটি কথা সবাই স্বীকার করেছেন। শেকস্‌পীয়রের মত কবি হয় না, ইস্‌কিলাস, দান্তে, গ্যোটে এদের কারো চেয়ে ইনি কম নন। আর এঁর মহত্ব এমনই বিরাট যে, তাঁকে নকল পর্যন্ত করার সাহস কারো হয় না।

কিন্তু এ তত্ত্ব নিয়ে অত্যধিক বাক্যব্যয় আমি করতে যাবো কেন?

আমাকে যে জিনিস সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে সেইটে বলে প্লেনে উঠি।

বৃটিশ মিউজিয়মের পাঠাগার। অনেক দেশে বিস্তর পুস্তকাগারে ঢুকেছি। থানাতেও দু' একবার গিয়েছি। দুটোতে কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারিনি। আমি যেন চোর। বই সরাবার মতলব ভিন্ন আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে এটা কেউই যেন বিশ্বাস করতে চায় না। কার্ড দেখানো থেকে আরম্ভ করে বই ফেরৎ দিয়ে বেরবার পরও মনে হয় পিঠের উপর ওদের চোখগুলো যেন সার্জেনের তুরপুনের মত কুরে কুরে ঢুকছে।

এর জন্য কে দায়ী বলা কঠিন। কিন্তু যেই হোক্, কিংবা যাঁরাই হোন্, এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, চোর-পুলিশের বাতাবরণে আর যা হয় হোক, জ্ঞানসঞ্চয় বিদ্যার্জন হয় না। তবে এর ব্যত্যয়ও আছে। এবং আমার বিশ্বাস, আমরা উন্নতির দিকেই চলেছি।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে কাউকে যে সন্দেহের চোখে দেখা হয় না তার প্রধান কারণ প্রায় সবাই বয়স্ক, অনেকেই পণ্ডিতরূপে বিশ্ববরেণ্য। এখানে কাজ করতে হলে সহজে অনুমতি পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়মের কর্তারা যে 'ডগ অ্যাণ্ড দি ম্যানজার', অর্থাৎ আমি খাবো না, তোকেও খেতে দেব না নীতি অবলম্বন করেন তা নয়। তাঁদের বক্তব্য, সাধারণ রিসার্চ, যেমন মনে করুন, ডক্টরেটের কাজ করার জন্য লণ্ডনে আরো বিস্তর লাইব্রেরী রয়েছে। সেখানে ভিড় কম, ও রিসার্চ একটি বিশেষ বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে আপনি আপনার বই পেয়ে যাবেন তাড়াতাড়ি। যেমন মনে করুন, আপনি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতেই আপনি আপনার প্রয়োজনীয় বই পেয়ে যাবেন। কিন্তু যেখানে গবেষণা একাধিক বিষয়বস্তু ছাড়িয়ে যায় সেখানে স্পেশেলাইজড লাইব্রেরী কুলিয়ে উঠতে পারে না—তখন ব্রিটিশ মিউজিয়ম আপনাকে স্বাগতম জানায়।

এবং সবচেয়ে বড় কথা—পৃথিবীর সর্ব জায়গা থেকে এত সব নামকরা পণ্ডিত এখানে আসেন যে, মিউজিয়ম তাঁদের নিরাশ করে অপেক্ষাকৃত, কিংবা সম্পূর্ণ অজানা গবেষককে স্থান দিতে চায় না—কারণ পাঠাগারের সাইজ দশ ডবল করে দিলেও সে তার মোহাকৃষ্ট গবেষকদের স্থান কুলান করতে পারবে না।

মিউজিয়মের চায়ের স্টলে একটি পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয়।

তিনি বললেন, 'রীডিং রুমে ঢুকেই একটি নিগ্রো ভদ্রলোককে লক্ষ্য করেছেন কি? আবলুষের মত রঙ আর বরফের মত সাদা চুল? নাগাড়ে বিশ বছর ধরে ঐ আসনে বসে কাজ করে যাচ্ছেন।'

আমি বললুম, 'আপনি ক' বছর ধরে?'

তিনি যেন একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'সামান্য। পনেরো হবে। আমার চেয়ে যারা ঢের প্রবীণ তাঁদের কাছে শোনা।'

আমি শুধালুম, 'ইনি কি কাজ করছেন?'

'হাবশী মুল্লুকে খৃষ্টধর্মের অভ্যুদয় কিংবা ওরই কাছাকাছি কিছু একটা। হীব্রু, আরাহমযিক, আহমরিক, সিরিয়াক এসব তাবৎ ভাষায় লেখা বই ঘাঁটতে হলে এখানে না এসে তো উপায় নেই।'

আমি সামান্য যে কদিন কাজ করেছিলুম সে ক'দিন নিগ্রো ভদ্রলোকের নিষ্ঠা দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। ন'টার সময় কাঁটায় কাঁটায় তাঁকে আসন নিতে দেখেছি, এবং উঠতেন ছ'টার সময়। এর ভিতরে আসন ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকলে আমার অজানতে। আর দেড়টা থেকে দুটো অবধি চেয়ারের হেলানে মাথা দিয়ে একটু-খানি ঘুমিয়ে নিতেন।

লিখতেন অল্পই। পড়তেন বেশী। চিন্তা করতেন তারো বেশী। দু' একবার চোখাচুখি হয়েছে। তিনি যেন আমাকে দেখতেই পাননি। চোখ দুটি কোন্ অসীম ভাবনার গভীর অতলে ডুবে আছে আমি জানবো কি করে? কিংবা তিনি হয়তো ছবি দেখছেন, সেই আদিম আবিসিনিয়ান সমাজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন খৃষ্টের দূত, শান্তির বাণী বহন করে। তখন তাঁদের সভ্যতা সংস্কৃতি কোন্ স্তরে ছিল, খৃষ্টের বাণী তাঁরা কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন—তারই ছবি দেখছেন। যেখানে ছবি অসম্পূর্ণ কিংবা ঝাপ্‌সা সেটাকে সম্পূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য এই সাধনা।

তাঁর বই লেখা শেষ হয়েছিল কি না, প্রকাশিত হলে ক'জন লোক সেটি পড়েছিল, বোঝবার মত শক্তি ক'জন পাঠকের ছিল তাও জানিনে। কারণ এরকম নিষ্ঠাবান সাধক পাঠাগারের অনেকেই।

এস্থলে পাঠক হয়তো ভাবছেন, আমি সেখানে ঠাঁই পেলুম কি করে? কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, আমি পণ্ডিত নই।

জর্মনিতে পড়াশোনা করবার সময় আমার কয়েকখানা বইয়ের প্রয়োজন হয়। সেদেশে সেগুলো পাওয়া যাচ্ছিল না বলে অধ্যাপক বললেন, 'ব্রিটিশ মিউজিয়মে যাও; সেই সুযোগে লণ্ডনও দেখা হয়ে যাবে।'

তিনি নিজে প্রায়ই লণ্ডনে এসে কাজ করে যেতেন। মিউ-জিয়মের কর্তারা ভালো করেই জানতেন, পণ্ডিত সমাজে তাঁর স্থান কতখানি উঁচুতে। তিনি যখন পরিচয়পত্র দিয়ে পাঠালেন তখন এঁরা আর কোনো প্রশ্ন শুধালেন না।

কিন্তু বার বার লজ্জা অনুভব করেছি।

প্রথম মুশকিল আসন নিয়ে। কোনো আসনে কেউ বসছেন বিশ বছর ধরে, কেউ ত্রিশ বছর ধরে। ঠিক সেদিনটাই হয়তো তিনি তখনো আসেননি। আপনি না জেনে বসে গেলেন তাঁরই আসনে—কারণ কোনো চেয়ার কারো জন্য রিজার্ভ করা হয় না। তিনি খানিকক্ষণ পরে এসে আপনাকে ঐ চেয়ারে দেখে চলে গেলেন কিছু না বলে। অন্য জায়গায় বসে তিনি ঠিক আরাম পেলেন না। আপনি কিন্তু জানতেই পেলেন না।

পরের দিন গিয়ে দেখলেন, অন্য কে একজন—তিনিই হবেন—ঐ আসনে বসে আছেন। আপনি নূতন আসনের সন্ধানে বেরলেন।

এসব বুঝতে বুঝতে কেটে যায় বেশ কয়েকদিন। যখন বুঝলুম, তখন শরণাপন্ন হলুম এক কর্মচারীর। তিনি অনেক ঘাড় চুলকে আমাকে একটি আসন দেখিয়ে বললেন, 'এ চেয়ারটায় এক ভদ্র-লোক বসছেন দশ বৎসর ধরে।'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্।'

তিনি বললেন, 'তবে মাসখানেক ধরে তিনি আসছেন না।'

আমি বললুম, 'তা হলে উপস্থিত এখানেই বসি। কিন্তু তিনি এলে আমায় বলে দেবেন কি?'

বিরাট গোল ঘর। মাঝখানে চক্রাকারে সাজানো ক্যাটলগ। আর একেবারে কেন্দ্রে বসে কয়েকজন কর্মচারী। এঁদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বড় একটা হয় না। বই আসে যায় কলের মত।

কেন্দ্র থেকে সারি সারি হয়ে দেয়াল অবধি বেরিয়েছে পাঠকদের আসনপঙ্‌ক্তি। উপরের কাঁচ দিয়ে যে আলো আসছে সেটুকু যথেষ্ট নয় বলে টেবিলে টেবিলে ল্যাম্প। পাঠকদের অনেকেই পরেছেন কপালের উপরে রবরে বাঁধা 'শেড্'—টেনিস খেলোয়াড়দের মত। সামান্য পাতা উল্টোনোর শব্দ, পাশের ভদ্রলোকের কলমের অতি অল্প খসখস। আর কোনো শব্দ কোনো দিক দিয়ে আসছে না। অখণ্ড মনোযোগের পরিপূর্ণ অবকাশ।

এ-জায়গা মানুষকে কাজ করতে শেখায়। আপনি হয়তো এলেন ন'টা পনেরো মিনিটে। এসে দেখেন আপনার পাশের ভদ্রলোক যেভাবে কাজ করছেন তার থেকে মনে হয়, তিনি অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। তারপর দশটা এগারোটা বারোটা একটা অবধি তিনি আর ঘাড় তোলেন না। আপনার ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে। তাঁর পায়নি। আপনারও রোখ চেপে গেল। উনি না উঠলে আপনিও উঠবেন না। ইতোমধ্যে বাইরে গিয়ে বার বার সিগরেট খাবার ইচ্ছে হয়েছে—সেটাও চেপে গিয়েছেন। ছুটোর সময় উনি উঠলেন। আপনি যখন সাত তাড়াতাড়িতে চা রুটি খেয়ে ফিরলেন, তিনি তখন ঘাড় গুঁজে ফের কাজে ডুব মেরেছেন। বোঝা গেল, বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি সঙ্গে-আনা ছুখানা স্যাণ্ডউইচ খেয়েই কাজ সেরেছেন। তারপর তিনি উঠলেন পাঠাগার বন্ধ হওয়ার সময়।

এরকম যদি একটা লোক পাশে বসে কাজ করে তবে কার না মাথায় খুন চাপে। কিছুদিনের ভিতর দেখতে পাবেন, আপনিও দিব্য ন'টা ছ'টা করে যাচ্ছেন। কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, কোনো ক্লান্তি আসছে না।

একেবারে কেন্দ্রে বসতেন একটি অতিশয় ছোটখাট বৃদ্ধ। পরনে মর্নিং স্যুট। লম্বা দাড়ি। আবার মাথায় টপ হ্যাট! ঘরের ভিতরে ইংরাজ হ্যাট পরে না। এঁকে কিন্তু কখনো হ্যাটটি নামাতে

দেখিনি। বোধ হয় হ্যাটের সামনের দিকটা দিয়ে তিনি শেডের কাজ চালিয়ে নিতেন।

সিন্ধী গুজরাতীতে মেশানো কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থের সন্ধান না পেয়ে তাঁর কাছে গেলুম। তিন মিনিটের ভিতর তিনি ক্যাটলগের ঠিক জায়গা বের করে দিলেন, এবং এটাও বললেন, 'বোধ হয় ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এ সম্বন্ধে আরো বই আছে।'

পরে এক ভারতীয়ের মুখে শুনলুম, হেন বই লাইব্রেরীতে নেই যার হদিশ তাঁর অজানা। মিউজিয়ামের চায়ের ঘরে কথা হচ্ছিল। লাইব্রেরীর দেশবিদেশের পাকা গাহক কয়েকজন ঘাড় নাড়িয়ে সায় দিলেন।

এই অশ্রান্ত অজস্র পরিশ্রম আর নিষ্ঠার শেষ কোথায়, ফল কি? এঁদের সকলের বই কি জনসমাজে সম্মান পায়? বহু-পরিশ্রমের পর যখন বই সম্মান পায় না তখন লেখকের মনে কি চিন্তার উদয় হয়? তিনি কি আবার নূতন করে কাজ আরম্ভ করেন, না ভগ্নহৃদয়ে শয্যাগ্রহণ করেন?

এর উত্তর দেবে কে?

শুধু এইটুকু জানি, মিউজিয়ম এ নিয়ে মাথা ঘামাক আর নাই ঘামাক সে সাদরে বংশপরম্পরাকে জ্ঞানের সন্ধানে সাহায্য করছে, আর পাঠাগারের কেন্দ্রটি বিশ্বের সর্বজ্ঞানের কেন্দ্র না হোক, অন্যতম কেন্দ্র।

ইংরেজকে এখানে নমস্কার।

বিশ্বজনের কাছে ভারতবর্ষ অপরিচিত দেশ নয়। প্রাচীন যুগে সে অপরিচিত ছিল না, এযুগেও নয়। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য অল্পসংখ্যক স্বার্থান্বেষী সাম্রাজ্যবাদী ভারতবর্ষের সম্বন্ধে প্রচার করেন যে, যদিও এদেশ একদা সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল আজ তার সর্বস্ব লোপ পেয়েছে এবং বৈদেশিক শাসন ভিন্ন এর পুনর্জীবন লাভের অন্য কোনও পন্থা নেই। এ-কুৎসা প্রচারের ফলে প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় মহাদেশেই বিস্তর কুফল ফলেছিল, এখনও কিছু কিছু ফলছে। এরজন্য সর্বপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই স্বল্প-সংখ্যক সাম্রাজ্যবাদীদের দেশই। কিন্তু এ-স্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য সে-দেশের মনীষিগণও তাই নিয়ে প্রচুর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

মাত্র একটি দেশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কখনও তার ভক্তিশ্রদ্ধা হারায়নি। সে-দেশ জর্মনি। এদেশের গুণীজ্ঞানীরা সে তত্ত্ব অবগত আছেন। আমাদের কবি মধুসূদন একশ' বছর পূর্বে লণ্ডনে থাকাকালীন জর্মন পণ্ডিত গণ্টস্ট্যুকারের সঙ্গে দেখা করতে যান; এমনকি যে স্বল্প-সংখ্যক জর্মন পণ্ডিতের মতবাদ আমাদের সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমাত্মক বলে মনে করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি আপন যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেছেন। পরবর্তী যুগে আমাদের শিক্ষাচার্য রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শাস্ত্র গবেষণার জন্য জর্মন পণ্ডিত উইন্টার-নিৎসকে নিমন্ত্রণ করে বিশ্বভারতীতে নিয়ে আসেন; তখনই অপরিচিতা শ্রীমতী ক্রামরিশ তাঁরই সৌজন্যে বিশ্বভারতীতে ভারতীয় কলাচর্চার সুযোগ পান।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এদেশের জনসাধারণ জর্মনির খবর পেল দুই অশুভ যোগাযোগের ফলে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে

ভারতবাসী জর্মনি সম্বন্ধে নানা অতিরঞ্জিত কাহিনী শুনে ঈষৎ পথ-ভ্রান্ত হয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এদেশের পণ্ডিতসমাজেও জর্মন ভাষা সুপ্রচলিত নয় বলে ভারতবর্ষীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা জর্মনিতে কী ভাবে হয়, তার কতখানি উন্নতি হয়েছে, সে বিষয় বাঙলায় অনূদিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। যে-সব বাঙালী বিপ্লবী জর্মনিতে আশ্রয় পেয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতাও সুস্পষ্ট কারণবশত এদেশে প্রসার লাভ করতে পারেনি।

ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান কলা-দর্শন সভ্যতা-সংস্কৃতি চর্চার জন্য ইয়োরোপে যে শব্দটি প্রচলিত তার নাম ইণ্ডলজি—জর্মন উচ্চারণ ইণ্ডলগী। শব্দটি অর্বাচীন ও গ্রীক গোত্রীয় (অবশ্য এর প্রথমাংশ 'ইন্দস' শব্দটি মূলে ভারতীয়) এবং জর্মনির শিক্ষিতজন মাত্রই এটির বহুল প্রয়োগ করে থাকেন; ইংলণ্ডের পণ্ডিতসমাজে এটি কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়—এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় শব্দটি নেই, জর্মন সাইক্লোপিডিয়ায় নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ আছে।

জর্মনিতে ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চা অর্থাৎ ইণ্ডলজি কতখানি প্রচার এবং প্রসার লাভ করেছে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বাঙলাতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ভ্রমণ কাহিনী তার জন্য প্রশস্ত স্থান নয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকলে জর্মন দেশ বৃত্তান্তের একটা বিরাট মহৎ দিক অবহেলিত হয়, এবং দ্বিতীয়ত আমার ছাত্রজীবনের প্রায় চার বৎসর সেখানে কাটিয়েছি বলে একাধিক জর্মন সংস্কৃতজ্ঞের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয় এবং ভ্রমণ কাহিনীতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইচ্ছা অনিচ্ছায় প্রকাশিত হবে বলেই এ-সব পণ্ডিত এবং তাঁদের সাধনা সম্বন্ধে এই সুযোগে যা না বললে নিতান্তই চলে না সেইটুকু বলে রাখি। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, ভবিষ্যতে আমি এ প্রলোভন সম্বরণ করব।

ইণ্ডলজি আরম্ভ করেন ইংরেজরাই—অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে। জোন্‌স্, কোলব্রুক্, উইল্‌সন্ এর প্রতিষ্ঠাতা। এর পরই

ফ্রান্সে সিলভেস্‌ৎর দ্য সাসি এ চর্চা আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে জর্মনিতে সেটা ব্যাপকতরভাবে আরম্ভ হয়। জর্মন পণ্ডিত শ্লেগেলই সর্বপ্রথম এ চর্চার ব্যাপকতা এবং কীভাবে এতে অগ্রসর হতে হবে তার কর্মসূচি তাঁর পুস্তক 'য়্যুবার ডি স্প্রাখে উন্‌ট্‌ ভাইজ্‌হাইট্‌ডের্‌ ইণ্ডার্‌' ('ভারতীয় ভাষা ও মনীষা') ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এর কয়েক বৎসর পরেই জর্মন পণ্ডিত বপ্‌ সংস্কৃত ধাতুরূপের সঙ্গে গ্রীক, লাতিন এবং প্রাচীন জর্মন ধাতুর তুলনা করে সপ্রমাণ করেন যে, ভবিষ্যতে আর্যগোষ্ঠীর যে-কোন ভাষার মূলে পৌঁছতে হলে সংস্কৃত ভাষা অপরিহার্য। বস্তুত তিনিই প্রথম তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের কেন্দ্রভূমিতে যে সংস্কৃতকে স্থাপনা করলেন এখনও সে সেখানেই আছে। তারই দু' বৎসর পরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জর্মনির বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয় এবং ঐ কর্মে নিয়োজিত হন পূর্বোল্লিখিত ফ্রীড্‌রিষ্‌ শ্লেগেলের ভ্রাতা ভিল্‌হেল্‌ম্‌ শ্লেগেল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বপ্‌ বার্লিনে নিযুক্ত হলেন।

ভারতবর্ষে তখন সংস্কৃত চর্চার কী দুর্দিন!

শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়, বপ্‌ যে শুধু ভারতীয় ব্যাকরণ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন তাই নয় তাঁরা তখন সংস্কৃত সাহিত্যের রসের দিক অনুবাদের মাধ্যমে জর্মনিতে পরিবেষণ করতে আরম্ভ করেছেন। ফলে তার প্রভাব গিয়ে পড়ল জর্মন সাহিত্যে। কবিগুরু গ্যোটে শকুন্তলার অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ। তিনি তখন যা বলেছিলেন তাই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন প্রায় একশ' বছর পরে। তিনি লিখলেন:

'য়ুরোপের কবিগুরু গ্যাটে একটিমাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি কাব্যকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়।' তিনি এক কথায় বলিয়াছিলেন, 'কেহ

যদি তরুণ বৎসরের ফুল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।'

এবং প্রবন্ধ শেষ করতে গিয়ে লিখলেন :

'গ্যোটের সমালোচনার অনুসরণ করিয়া পুনর্বার বলি, শকুন্তলায় আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্ত্যকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।'

গ্যোটের মত কবি যখন সংস্কৃত নাটক পড়ে উচ্ছ্বসিত তখন অন্যান্য কবিরা যে উৎসাহিত হবেন সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। গীতিকাব্যের রাজা হাইনে তখন দুঃখ-বেদনায় কাতর হলেই স্বপ্ন দেখতে লাগতেন সেই আনন্দনিকেতন, সেই স্বপ্নের ভুবন ভারতবর্ষ—শেলি কীট্স বায়রন যে অবস্থায় স্বপ্ন দেখতেন গ্রীসের।

'গঙ্গার পার—মধুর গন্ধ ত্রিভুবন আলো ভরা—
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতিধরা
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।'

আম্ গাঙেস্ ডুফটেট্স্ লয়েস্টেট্স
উন্ট্ রীজেন্বয়মে ব্ল্যুয়েন,
উন্ট্ শ্যোনে স্টিলে মেনশেন্
ফর্ লটসব্লুমেন ক্নীয়েন।

গঙ্গানদীতে আমি পদ্মফুল ফুটতে দেখিনি। কিন্তু এ ত স্বপ্নরাজ্য। এর কিছুটা সত্য কিছুটা কল্পনা। তাই পূব-বাঙলার কবিও মধ্য আরবের মরুভূমির ভিতর দিয়ে তার নায়িকা লায়লাকে যখন মজনূর কাছে নিয়ে যাচ্ছেন তখন তিনি যাচ্ছেন নৌকোয় চড়ে! এবং শুধু কি তাই? তিনি বিলের জল থেকে—সেই আরবদেশে—কুমুদকহ্লার তুলে তুলে খোঁপায় গুঁজছেন!

হাইনে জাত-ধর্মে ইহুদী। তাঁর ধমনীতে আর্যরক্ত নেই। কিন্তু আর্যজর্মনিতে তখন ভারতীয় আর্যের প্রতি যে সমবেদনা, গৌরবানুভূতির প্লাবন আরম্ভ হয়েছে তাতে তিনিও নিজকে ভাসিয়ে দিলেন। তাঁর বহু কবিতায় কখনও প্রচ্ছন্ন কভু বা প্রকাশ্যে ভারতের প্রতি আকুল ব্যাকুল হৃদয়াবেগ (জর্মন ভাষায় এই 'হৃদয়াবেগের' নাম 'শুয়ের্মেরাই।')

ঐ সময়ে ভারতের প্রতি জর্মনির কতখানি শুয়েৰ্মেরাই (ইংরিজিতেও এর প্রতিশব্দ নেই—'ফেনাটিক এনথুসিয়েজম'-এর অনেকটা কাছাকাছি) তার আরেকটি উদাহরণ দিই।

ভারতবর্ষে যখন কেউ জর্মন ভাষা শিখতে আরম্ভ করে তখন সাধারণত তাকে যে প্রথম ক্ষুদ্র উপন্যাস পড়তে দেওয়া হয় তার নাম 'ইমেনজে'। আমিও এই বই পূর্বোল্লিখিতা শ্রীযুক্তা ক্রামরিষের কাছে পড়ি। তাতে জর্মন বাচ্চাদের খেলাধুলোর একটি বর্ণনা আছে। তারা সবাই মিলে একটা ঠেলাগাড়ি তৈরি করে তার উপর কেউ বা চাপছে, কেউ বা দিচ্ছে ঠেলা। আর সবাই মিলে একসঙ্গে প্রাণপণ চেঁচাচ্ছে:

"নাখ্ ইণ্ডিয়েন, নাখ্ ইণ্ডিয়েন্!"
"ভারত চলো, ভারত চলো।"

ঠেলা গাড়ি চড়ে চড়েই তারা ভারতবর্ষে পৌঁছবে!

কবিরা শিশুপ্রকৃতি ধরেন, এবং শিশুরাও কবিপ্রকৃতি ধরে। দুজনারই বাস কল্পনারাজ্যে।

কিন্তু প্রশ্ন, তারা 'নাখ্ ইণ্ডিয়েন, নাখ্ ইণ্ডিয়েনই' করছে কেন, 'নাখ্ আমেরিকা' কিংবা 'নাখ্ চীনা' চেঁচাচ্ছে না কেন? জর্মনির কাচ্চাবাচ্চাদের ভিতরও তখন এই শুয়েৰ্মেরাই ছড়িয়ে পড়েছে। এ বইয়ের প্রকাশ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে।

ঐ সময়ে ইয়োরোপে যে সব পণ্ডিত বেদ চর্চায় মত্ত তাঁদের তিনজনই জর্মন: বেনফাই, মাক্সম্যুলার এবং ভেবার।

ম্যাক্স্মুলারকে সবাই চেনেন, ভেবারের লেখার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সুপরিচিত ছিলেন, কিন্তু বেন্‌ফাই সামবেদের অনুবাদ করেছিলেন বলেই বোধ হয় অতখানি খ্যাতি পাননি। তবে জর্মনির শিশুসাহিত্যে তিনি সম্রাট। তাঁর 'পঞ্চতন্ত্রে'র অনুবাদ প্রাতঃস্মরণীয়।

কাজ তখন এত এগিয়ে গিয়েছে যে একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্কৃত-জর্মন অভিধান না হলে আর চলে না। দুই জর্মন পণ্ডিত বোয়্‌টলিঙ্ক ও রোট্‌ তখন যে অভিধান প্রস্তুত করলেন সেটি প্রকাশিত হল রুশ সম্রাটের অর্থসাহায্যে সাত ভলুমে, ১৮৫২-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

এ অভিধান অতুলনীয়। কিয়দ্দিন পূর্বে পরলোকগত পণ্ডিতবর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার জানামতে একমাত্র বাঙলা আভিধানিক যিনি তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' রচনাকালে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন।

"ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি
কাঁদিছে ক্রন্দসী"

এস্থলে 'ক্রন্দসী' শব্দের অর্থ কি? ভাসা-ভাসাভাবে অনেকেই ভাবেন, 'ঐ চতুর্দিকে "কান্নাকাটি" হচ্ছে, আর কি?' অন্যায়টাই বা কি? স্বয়ং নজরুল ইসলাম লিখেছেন, 'কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে।' জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কোষ অনবদ্য। তাতেও দেখবেন, 'সংস্কৃত অভিধানে পাই নাই, কিন্তু "রোদসী" পাইয়াছি। তার অনুকরণে অনুপ্রাসানুরোধে (!) 'ক্রন্দসী'। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উদ্ভাবিত (!) এবং বাংলায় প্রথম ব্যবহৃত। কিন্তু এতখানি বলার পর জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রকৃত কোষকারের ন্যায় অর্থটি দিয়েছেন ঠিক। 'আকাশ ও পৃথিবী; স্বর্গমর্ত্য।'

বোয়টলিঙ্ক-রোটের সংস্কৃত-জর্মন অভিধানখানার প্রসঙ্গ উঠেছে

বলেই এ উদাহরণটির প্রয়োজন হল। এ অভিধান জর্মন দেশ ও বাঙলার যোগসেতু।

একটু ব্যক্তিগত হয়ে গেলে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

ছেলেবেলায় আমার মনে ধোঁকা লাগে 'ক্রন্দসী' শব্দ নিয়ে। সবে শান্তিনিকেতনে এসেছি। দূর থেকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছি। শুনে ভয় পেয়েছি, তিনি নাকি বিশ বছর ধরে একখানা বাঙলা অভিধান লিখছেন। বিশ বছর ধরে বাঙলা—সংস্কৃত নয়, গ্রীক নয়, বাঙলা অভিধান—বি···শ বছর ধরে। তখনো জানতুম না তারপরও তিনি আরো প্রায় বিশ বছর খাটবেন।

তাঁকে গিয়ে শুধাতে তিনি বড় আনন্দিত হলেন—আমি ভয় পেয়েছিলুম, তিনি বিরক্ত হতে পারেন। একাধিক বাঙলা অভিধান দেখালেন যাতে শব্দটা নেই। তারপর ব্যোটলিঙ্ক-রোট পাড়তে পাড়তে বললেন, 'এইবারে দেখো, জর্মনরা কি বলে।' তাতে দেখি, ডি টোবেণ্ডেন শ্লাখট্রাইয়েন, অর্থাৎ 'যে দুই সৈন্যবাহিনী হুঙ্কার করছে।' হরিবাবু বললেন, 'ঠিক, অর্থাৎ "দুই পক্ষ"—তার মানে উর্বশীর জন্য দু'পক্ষই কাঁদছে। কিন্তু তার পরেও এগোতে হয়। ঋগ্বেদের এই ২, ১২, ৮-এর টীকা দিতে গিয়ে সায়ণাচার্য "ক্রন্দসী" শব্দের অর্থ করেছেন "স্বর্গমর্ত্য"।'

উর্বশী কবিতায় রবীন্দ্রনাথও ক্রন্দসী শব্দ 'স্বর্গ ও মর্ত্য' এই মর্মে ব্যবহার করেছেন। কারণ স্বর্গের দেবতা এবং মর্ত্যের মানব দুই-ই যে তাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষী, তার বর্ণনা তিনি এ কবিতায় দিয়েছেন।

এস্থলে আর এগোবার দরকার নেই। জর্মনিতে ফিরে যাবার পূর্বে উল্লেখ করি হরিচরণ তাঁর সফল শব্দকোষ ব্যোটলিঙ্ক-রোটকৃত অভিধানের প্যাটার্নে নির্মাণ করেছেন।

এ অভিধান জর্মনিতে প্রসার লাভ করার ফলে সে দেশে ভারতীয় জ্ঞান-চর্চা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো এবং তারই ফলে তার পরিমাণ এমনই বিরাট রূপ ধরলো যে, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ

ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতদের হাতে সমর্পণ করতে হল। জর্মন পণ্ডিত বুলার তখন এক বিরাট পুস্তকের পরিকল্পনা করলেন। 'আর্য-প্রাচ্যতত্ত্বের পরিকল্পনা'—গ্রুণ্টরিস ডের ইণ্ডো-আরিশেন ফিললগি উণ্ট্ আলটেরটুমস্কুণ্ডে নামে এ-বই পরিচিত। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এর প্রথম ভলুম বেরয়; এ যাবৎ কুড়ি ভলুম বেরিয়েছে: প্রাগানত কীলহর্ন, ল্যুডার্স, ভাকেরনাগেল এবং আরও অসংখ্য পণ্ডিত এতে সাহায্য করেন।

এর পর আর হিসেব রাখা যায় না।

কারণ এতদিন ছিল ব্যাকরণ, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন নিয়ে চর্চা; তারপর আরম্ভ হল ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্র, নাট্য, নৃত্য, হস্তশিল্প, সঙ্গীত—আরো কত কী নিয়ে আলোচনা। শ্মিট সায়েব তো একটা জীবন কাটিয়ে দিলেন কামসূত্র নিয়ে। ব্যোটলিঙ্কের অভিধানে কামসূত্রের টেকনিকাল শব্দ বাদ পড়ে গিয়েছিল—শ্মিট সে অভিধানের প্রয়োজন খণ্ড প্রণয়নকালে এত বেশী কামসূত্রীয় শব্দ প্রবেশ করিয়ে দিলেন যে, তাই নিয়ে পণ্ডিতমহলে নানা রকমের 'শ্রুতিমধুর' মন্তব্য শোনা গেল। কৌটিল্য নিয়ে কী মাতামাতি! আর, আমি দেখেছি আমারই চোখের সামনে এক জর্মন মহিলা সপ্তাহে তিন দিন করে তিনটি বচ্ছর এলেন অধ্যাপক কির্ফেলের কাছে অষ্টাঙ্গের জর্মন অনুবাদে সাহায্যের জন্যে। তার পূর্বে তিনি মেডিকেল কলেজ পাশ করে ঐ বিষয়ে বোধ হয় ডক্টরেটও নিয়েছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ক' বছর খেটেছিলেন বলতে পারবো না। যে ডক্টর জাওয়ারব্রুখের কাহিনী পঞ্চম জর্জের অপারেশন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি, তিনি পর্যন্ত ক্যানসারের গবেষণা আরম্ভ করার পূর্বে জর্মন ইণ্ডলজিস্টের কাছ থেকে শুনে নিয়েছিলেন, ভারতীয় বৈদ্যরাজগণ এই মারাত্মক ব্যাধি সম্বন্ধে কোন্ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, কোন্ চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভারতীয় সঙ্গীত ও জর্মন সঙ্গীত ভিন্ন ভিন্ন মার্গে চলে। তৎসত্ত্বেও

ভারতীয় বিষয়বস্তু একাধিক সঙ্গীতকারকে ভারতীয় 'লাইট-মোতীফ' জুটিয়েছে, তুলনাত্মক আলোচনা প্রচুর হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জনৈক মজুমদার এ সম্বন্ধে একখানি উচ্চাঙ্গের পুস্তক লিখে ডক্টরেট পান। পরম পরিতাপের বিষয় ঐ যুদ্ধে তিনি তরুণ বয়সে প্রাণ হারান। বইখানির পাণ্ডুলিপি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এ যাবৎ সে বই কেন যে কোনো ভারতীয় বা ইংরিজি ভাষাতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়নি সে এক বিস্ময়।

মৃচ্ছকটিকা জর্মনদের প্রিয় নাট্য। তার একাধিক প্রাঞ্জল এবং মধুর জর্মন অনুবাদ আমি দেখেছি। এ নাট্যের ঘটনাপরম্পরার বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত যে রকম জর্মন মনকে চঞ্চলিত করে, ঠিক তেমনি তার গীতিরস—বিশেষ করে অকাল বর্ষায় বসন্তসেনার অভিসার ও দয়িত 'দরিদ্র-চারুদত্তের' সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর উভয়ের সে বর্ষণবর্ণন জর্মন হৃদয়কে নাট্যগৃহে বহুবার উল্লসিত উদ্বেলিত করেছে। জর্মন ভাষা ইংরিজির তুলনায় অনেক বেশি গম্ভীর ও প্রাচীনত্ব (আরকাঈক) ধরে বলে সে ভাষায় মূল সংস্কৃতের অনেকখানি স্বাদগন্ধ রক্ষা পায় এবং কাব্যরসাশ্রিত নাট্যরস সহজেই সে ভাষায় সঞ্চারিত হয়।

জর্মন সাহিত্যদর্শন তথা জাতীয় জীবন—এ দুয়ের উপর ভারতীয় সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের প্রভাব কতখানি হয়েছে তার সিংহাবলোকন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ জর্মনিতে যান। জর্মনি তখন মিত্রশক্তির পদদলিত, শব্দার্থে মর্মাহত। সেখানে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন, 'পরাজিতের সঙ্গীত'। তখন তিনি জর্মনিতে যেরূপ হার্দিক অভিনন্দন পেয়েছিলেন সে রকম অন্যত্র কোথাও পাননি। সে-কথার উল্লেখ তিনি নিজেই করে গিয়েছেন। আমি অন্যত্র একাধিকবার তাঁর প্রতি জর্মন প্রীতির নিদর্শন বর্ণন করার চেষ্টা করেছি। এখানে ক্তি নিষ্প্রয়োজন।

ভারণ্দিন জর্মনদের বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষ একদা সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্লে ত

উচ্চ শিখরে উঠেছিল বটে, কিন্তু বর্তমান যুগে সে দেশে শুধু ম্যালেরিয়া, গোখরো এবং ইংরেজ। (যদিও অবান্তর তবু বলে ফেলি; শেষের দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বেশী বেইমান সেটা পণ্ডিতরা এযাবৎ স্থির করে উঠতে পারেন নি।) রবীন্দ্রনাথের আগমনে এবং দু' তিন মাসের ভিতর তাঁর লক্ষাধিক পুস্তক জনসমাজে প্রচারিত হওয়ার ফলে তথা 'ডাকঘর' নাট্যরূপে দেখে তাদের এ ভুল ভাঙলো। নবীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের মনে কৌতূহল জাগলো। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা শেখানোর ব্যবস্থা হল। প্রথম অধ্যাপক ভাগনার অবশ্য বাঙলা শিখেছিলেন নিজের চেষ্টাতেই। জর্মনিতে অনূদিত তাঁর 'বাঙলা-গল্প-চয়নিকা' 'বেঙ্গালিযে এর্‌ৎসেলুঙ্গেন' সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা এবং প্রগাঢ় প্রীতি সম্বন্ধে বার্লিনে প্রবাসী বাঙালী মাত্রই সচেতন ছিলেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর দরদটি কেমন যেন ভীতি-ভরা বলে আমার মনে হত। আমার মনে হত, বিশ্বসাহিত্যের অপরিচিত এই সাহিত্যের প্রতি তাঁর মাত্রাতিরিক্ত প্রীতি (প্রায় 'শুয়েরমেরাই' বলা চলে) পাছে লোকে ভুল বোঝে, সেই ছলে পাছে লোকে সেটিকেও অনাদর করে ফেলে—এই ছিল তাঁর ভয়। দুঃখিনী মা লাজুক ছেলেকে যে রকম পরবের বাড়িতে নিয়ে যেতে ভয় পায়। শোকের বিষয় এই নিরীহ ভাবুকটিও মজুমদারের মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার পরও জর্মনি অনেক ভারতীয় রাজদ্রোহীকে আশ্রয় দিয়েছে। এ সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানিনে। তার কারণ এর সবকিছুটাই ঘটতো লোকচক্ষুর অগোচরে। তবে শুনেছি ইংরেজ যখন জর্মনির উপর চাপ আনতো, কোনো ভারতীয় বিদ্রোহীকে সে-দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য, তখন জর্মন পুলিশ তাকে কাতর কণ্ঠে বলতো, 'কেন বাপু একই ঠিকানায় বেশি দিন ধরে থাকো? ইংরেজ খবর জেনে আমাদের

উপর চোটপাট করে তোমাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য। আজই বাড়ি বদলাও।' আমরা বলবো, তোমার ঠিকানা জানিনে।' এ কথাটি আমি শুনেছি, নেতা লালা হরকিষণ লালের ছেলে মনোমোহনলাল গাওবার কাছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কিম্বা দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে আমার চেনার মধ্যে জর্মনিতে ছিলেন শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও বীরেন সেন (এঁর পুরো নাম ও পদবী আমার ঠিক মনে নেই)। এ সম্বন্ধে এঁরা সবিস্তর বলতে পারবেন এবং কিছু কিছু বলেছেনও। আর ছিলেন পরলোকগত মানবেন্দ্র রায়

ভারতের প্রতি হিটলারের শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না। তদুপরি জাপানকে হাতে আনবার জন্য তিনি চীন ভারত তাকে ('প্রভাব-ভূমি' বা স্ফিয়ার অব্ ইনফ্লুয়েন্স রূপে) দান করে বসেছিলেন বলে সুভাষচন্দ্রকে বাইরে আদর দেখিয়েও ঠিক মত সাহায্য করেননি। সুভাষচন্দ্র যে অতিশয় তেজস্বী মহাবীর এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বিচক্ষণ কূটনৈতিক ছিলেন সে-কথা আমার মত সামান্য প্রাণীর প্রশস্তি গেয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তিনি হিটলারের মনোভাব বুঝতে পেরে জাপান চলে যান। জাপানই যখন শেষমেষ ভারত আক্রমণ করবে, তখন জর্মনিতে বসে না থেকে জাপানে চলে যাওয়াই তো বিচক্ষণের কর্ম। এ সম্বন্ধে বাকি কথা প্রসঙ্গ এলে হবে।

জর্মন সাহিত্যদর্শন তথা তার জাতীয় জীবন—এ য়ের উপর ভারতীয় সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের প্রভাব কতখানি হয়েছে, এ সম্বন্ধে আলোচনা করার অধিকার আমার নেই। আশা করি শাস্ত্রাধিকারী ভবিষ্যতে এ নিয়ে প্রামাণিক পুস্তক লিখবেন। উপস্থিত আমি মাত্র একটি উদাহরণ দিয়ে এ-স্থলে ক্ষান্ত হই—

ইংরিজি এনসাইক্লোপিডিয়ায় টেগোর শব্দ খুললে পাবেন. মাত্র

রবীন্দ্রনাথের একটি অতি ক্ষুদ্র জীবনী। এবং তাঁর জীবনীকার হিসেবে একমাত্র টমসনের নাম।

জর্মন এনসাইক্লোপিডিয়া সাইজে তার ইংরিজি অগ্রজের অর্ধেক মাত্র। তবু তার প্রথমেই পাবেন, টেগোর শব্দের অর্থ। অনুবাদ দিচ্ছি—

'টাগোরে', আসলে ঠাকুর (Thakur) [সংস্কৃত ঠাকুর, 'প্রভু', সম্মতির প্রভু], পদবী (অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে), বর্তমানে পারিবারিক নাম। এ পরিবার দ্বাদশ শতাব্দীতে অযোধ্যা হতে বঙ্গে আগত ব্রাহ্মণদের বাঁড়ুয্যে পদবীধারী। পূর্বপুরুষ সংস্কৃত নাট্যকার ভট্টনারায়ণ (অষ্টম শতাব্দী)।'

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য তারপর একখানি পুস্তকের উল্লেখ আছে। নাম 'আর্বিভ ফ্যুর রাসেন উনট্ গেজেলশাফটস্-বিয়োলগী' অর্থাৎ 'আর্কাইভ ফর রেস এণ্ড বায়োলজি অব্ সোসাইটি'—'জাতি এবং সামাজিক জীববিদ্যার দলিল-দস্তাবেজ।'

এর পর আছে, অবনীন্দ্রনাথের জীবনী, তার পর দেবেন্দ্রনাথের এবং বিস্তৃত বিবরণের জন্য তাঁর আত্মজীবনীর উল্লেখ আছে।

বর্ণানুক্রমে সাজানো বলে সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের জীবনী। অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করে লেখক বলছেন, "১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁকে যে 'স্যর' উপাধি দেওয়া হয়, সেটা তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে রক্তগঙ্গা (জর্মনে ব্লুট-বাট=ব্লাড্-বাথ) প্রবাহিত হওয়ার পর বর্জন করেন।"[১]

---

(১) Encyclopaediaতে আছে : "He accepted a knighthood in 1915, but in 1919 resigned it as a protest against the methods adopted for the repression of disturbances in the Punjab. In later years, however, he offered no objection to the use of this title.'

কী দুষ্ট বুদ্ধিতে শেষ বাক্যটি লেখা! কবি যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু তখন আদালতে মোকদ্দমা করা ছাড়া অন্য কোনো পন্থা ছিল না।

এবং সর্বশেষে যে জীবনীগুলোর উল্লেখ আছে সেটি লক্ষ্যণীয়।

(1) H. Meyer-Benfey : Rabindranath Tagore (1921); (2) P. Natorp : Stunden mit Rabindranath Tagore (1921); (3) W. Graefe : Die Weltanschauung Rabindranath Tagores (1930); (4) R. Otto : Rabindranath Tagores Bekenntnis (1931); (5) M. Winternitz : Rabindranath Tagore, Religion und Weltanschauung des Dichters (Prag 1936) অতি উৎকৃষ্ট; এর বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিত (লেখক); (6) Marjorie Sykes : Rabindranath Tagore (1943); (7) E. J. Thompson : Rabindranath Tagore, Poet and dramatist (1948); (8) J. C. Ghosh : Bengali Literature (1948).

পাঠশালে গুরুমহাশয়ের কাছে প্রথম যে চড় খেয়েছিলুম সেটা আজও ভুলিনি। স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসছে সে দৃশ্যটা—কিন্তু তার কথা এখন ভাবতে গেলে কেমন যেন সদয় হাসি পায়। অথচ বার্লিনে নেমে যে চড় খেয়েছিলুম সেটা ত ভুলিনি বটেই, তদুপরি এখনও সেটা স্বপ্নে দেখি এবং এক গা ঘেমে জেগে উঠি। প্রত্যেকটি ঘটনা ঠাস ঠাস করে টাইপ রাইটারের মত গালে চড় মেরে যায়—এবং তার প্রত্যেকটি যেন মনের সাদা কাগজের উপর লাল রিবনের কালিতে এখনও জ্বলজ্বল করছে।

প্রথমবারের অভিজ্ঞতা। কাবুল থেকে দেশ হয়ে বার্লিন পৌঁছেছি। কাবুলে অনেক মার খেয়ে অনেক-কিছু শিখেছি, কিন্তু সেগুলো ত এখানে কোনও কাজে লাগবে না। বার্লিন মারাত্মক মডার্ন শহর। এখানে চলাফেরার কায়দা-কেতা একদম অজানা।

প্ল্যাটফর্মে অসহায় আমি দাঁড়িয়ে। রবিনসন ক্রুশো নিশ্চয়ই এতখানি অসহায় অনুভব করেননি। তিনি যে ভুলই করুন না কেন,

তার জন্য তাঁকে কারও কাছ থেকে চড় খেতে হবে না, জেলে যেতে হবে না। তিনি উদোম হয়ে ঘুরে বেড়ালেও কেউ কিছু বলবে না। আমি মার্সেলেস বন্দরে রাস্তার বাঁ দিকে চলতে গিয়ে প্রথম ধমক খেয়েছি। ফরাসী মাস্টার বলে দিয়েছিলেন বটে, কন্টিনেণ্টে 'কীপ টু দি রাইট'—আমাদের দেশে খাল-বিলেও মাঝিরা চিৎকার করে একে অন্যকে তম্বী করে 'আপন ডা-ই-ন !'—কিন্তু বন্দরের ধুন্দুমারের ভিতর কি অতশত মনে থাকে ?

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যাঁকে মার্সেলেস থেকে তার করেছিলুম, তিনি সে তার পান্‌নি কিংবা—সেগুলো আর বলে দরকার নেই। ভুক্তভোগীই জানেন, তখন সম্ভব অসম্ভব কত কারণই মনে আসে। আমি আসছি জেনে সে আত্মহত্যা করেনি ত ইস্তেক।

পোর্টারটি কিন্তু দেখলুম আমাদের কুলির মত ঘড়ি ঘড়ি তাড়া লাগালে না। আমার সেই বিরাট মাল-বহর—পরে দেখলুম বার্লিনে তার পনেরো আনাই কাজে লাগে না—ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে নির্বিকারচিত্তে পাইপ টানছে।

জর্মন ভাষা যে একেবারে জানিনে তা নয়। ঝাড়া পাঁচটি বচ্ছর উত্তম উত্তম গুরুর কাছে শান্তিনিকেতনে সে-ভাষার ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করেছি। কিন্তু বার্লিনের এই জীর্ণ শীতের সাঁঝে কোন জর্মন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বিদেশীর মুখে তারই মাতৃভাষার শব্দরূপ—তা ভুল উচ্চারণে—শুনতে যাবে ? হাওড়া স্টেশনে যদি কাবুলিওলা কোন বঙ্গসন্তানকে দাঁড় করিয়ে তার খাস কাবুলী উচ্চারণ সহযোগে লিট্‌, লুঙ, আশীর্লিঙ শোনাতে চায় তবে অবস্থাটা হয় কী রকম ?

বুদ্ধি করে ট্রেনে একটি ফরাসী-জাননেওলী মহিলাকে শুধিয়ে নিয়েছিলুম, স্টেশনে মালপত্র রাখার জায়গাটাকে জর্মনে কী বলে ? তিনি বলেছিলেন,

Gepaeckaufbewahrungsstelle

!!!

প্রথম ভেবেছিলুম তিনি মস্করা করছেন। তাই আমি সেটা টুকে নিয়েছিলুম। মাসখানেক পরে বার্লিনে গোছগাছ করে বসার পরে শব্দটিকে হামানদিস্তে দিয়ে টুকরো টুকরো করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার অর্থ বের করেছিলুম। উপস্থিত সেই চিরকুট টুকুন পোর্টারের হাতে দিলুম। সে একটা '[illegible]' করে গুম গুম করে ঠেলা-গাড়ি চালিয়ে এগোল। আমি মেরির লিট্‌ল্ ল্যামের মত পিছনে পিছনে চললুম।

মাল সঁপে দিয়ে রাস্তায় নামলুম।

দেখিনি, কিছুই দেখিনি। রাস্তা, বাড়ি, দোকান, গাড়ি, কিছুই দেখিনি। আমি ভাবছি, যাই কোথায়?

হুদো-হুদো কড়ি থাকলে কিচ্ছুটি ভাবনা নেই। 'ট্যাক্সি' এবং 'হোটেল' এ দুটি শব্দের প্রসাদাৎ স্পুটনিক-সহযোগে চন্দ্রলোকে নেমেও আশ্রয় মেলে। কিন্তু আমার বটুয়াতে তখন ছুঁচোর কেত্তন। স্কলারশিপের প্রথম কিস্তি না-পাওয়া পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। তখনও অবশ্য জানতুম না, মাটি পেতে হলে পাথর-ঢাকা বার্লিন থেকে অন্তত বারো মাইল দূরে যেতে হয়।

হঠাৎ শুনি, 'গুট্‌ন্ আবেন্ট!' তারপর 'গুড্ ঈভনিং', তারপর 'সোয়ার'। তাকিয়ে দেখি, আমার-চেয়ে-দু'-মাথা উঁচু এক পুলিশম্যান, কিংবা সেপাইও হতে পারে।

পরিষ্কার ইংরিজিতে শুধালে, 'আপনার কি কোনও সাহায্যের প্রয়োজন?'

ম্যাট্রিক ফেল বঙ্গসন্তান দু'শ টাকার চাকরি পেলেও বোধ হয় অতখানি খুশী হয় না।

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, 'হোটেল।'

লোকটা আমুদে। চলতে চলতে বললে, 'এ শব্দটা ত ইন্টারন্যাশনাল। আপনি অত অসহায় বোধ করছিলেন কেন?'

সত্যি কথা বলে দেব? প্রথম পরিচয়ের প্রথম জর্মনকে? বলেই ফেলি।

লোকটি দরদীও বটে। দাঁড়িয়ে বললে, 'সে ত অত্যন্ত স্বাভাবিক। স্টুডেন্ট মানুষ। পয়সা থাকার ত কথা নয়। তা হলে হসপিৎসে চলুন।'

আমি শুধালুম, 'সে আবার কী?'

'ও! হস্‌পিস্‌। ওটা ত ইংরিজিতেও চলে।'

হায় রে কপাল! শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ, অ্যাণ্ড্রুজ, কলিন্‌সের কাছ থেকে পাঁচ বছর ইংরিজি শিখেও যা জানিনে, জর্মন পুলিশ সেটাও জানে। কলকাতার ভোজপুরী পুলিশ তা হলে একদিন আমাকে আরবী শেখাবে।

'হোটেলেরই মত। তবে 'বার', 'ব্যুফে', 'ডান্স হল', 'কাবারে' নেই। খাবার-দাবার সাদাসিধে। ঘন্টি বাজালেই ওয়েটার আসে না। তাই সস্তা পড়ে।'

অর্থাৎ হোটেল জিনিসটি 'ডি লুক্স'—হস্‌পিস্‌ তারই গার্হস্থ্য সংস্করণ। ডাক-বাঙলো আর চট্টিতে যে তফাৎ তাই।

এতদিন পরও আমার স্পষ্ট মনে আছে লোকটি সঙ্গে যেতে যেতে তার মনের দুঃখ আমাকে বলেছিল। তার ছেলেটি ম্যাট্রিক পাস করেছে, কিন্তু পয়সার অভাব বলে কলেজে ঢুকতে পারেনি।

আমি ত অবাক। তিন-তিনটে ভাষা জানে। শিক্ষিত লোক বলেই মনে হচ্ছে। ফিটফাট য়ুনিফর্ম না হয় সরকারই দিয়েছে, কিন্তু তেমন কিছু গরিব বলে ত মনে হচ্ছে না। তবে কি এদেশেও গরিব লোক আছে?

বাকী কথা পরে হয়েছিল। হস্‌পিস্‌ কাছেই। পৌঁছে গিয়েছি।

পুলিশ মোকামে পৌঁছে দিল এই ত বিস্তর। কিন্তু এ-লোকটি শত্রু মিত্রে তফাত করে না। শত্রুর শেষ করতে হয়—শাস্ত্রে বলে—

এ-লোকটি মিত্রেরও শেষ ব্যবস্থা দেখে যেতে চায়। হোটেলওলার সঙ্গে আলাপচারী করে সুব্যবস্থা করে দিল। আমি ভাবলুম, এবারে বোধ হয় আমার খাটের পাশে বসে ঘুম-পাড়ানিয়া গান গাইবে।

যাবার সময় আমি বললুম, 'আপনার নাম কি?'

একখানা ভিজিটিং কার্ড বের করে দিলে।

পুলিশম্যানেরও ভিজিটিং কার্ড!

আমি শুধালুম, 'এদেশের সব পুলিশই কি ইংরিজি ফরাসী বলতে পারে?'

বললে, 'আদপেই না।' তারপর একটা ব্যাজ দেখিয়ে বললে, 'যাদের গায়ে এই ব্যাজ থাকে তারা একাধিক ভাষা বলতে পারে। যার ব্যাজে যটা ফুটকি, সে ততটা ভাষা জানে। আমার ব্যাজে তিনটে।'

ধন্যবাদ দেবার মত ভাষা খুঁজে পাইনি।

পরে জানলুম, একাধিক ভাষা জাননেওলা পুলিশ বিরল—আমার কপাল ভাল যে প্রথম ধাক্কাতেই তারই একজন জুটে গিয়েছিল।

চাটুয্যে অতিশয় সুদর্শন পুরুষ। সুন্দর ঢেউ-খেলানো চুল। বর্ণটি উজ্জ্বল শ্যাম। চোখ দুটি স্বপ্নালু—ঘন আঁখিপল্লব যেন অরণ্যানীর স্নিগ্ধচ্ছায়া নির্মাণ করেছে। সাধারণ বাঙালীর চেয়ে কাঁধ অনেক বেশী চওড়া—বুকের পাটা রীতিমত জোরদার। কোমরটি সরু—প্রায় মেয়েদের মত। পা দুটি সেই মাপে। তাই চলনটি ছিল চড়ুই পাখির মত। সেই চওড়া বুক নিয়ে চড়ুই পাখির চলনের মধ্যে যে একটা দ্বন্দ্ব থাকত তাকে দ্বন্দ্বমধুর বলা যেতে পারে।

কিন্তু বার্লিনের ভারতীয়-মহল এবং তার রায়ত-প্রজাদের ভিতর সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল তার আহনুলম্বিত দুটি মোলায়েম আকুঞ্চিত জুলপি—খ্যাতিতে হিণ্ডেনবুর্গের গোঁপের সঙ্গে এরা তাবৎ বার্লিনে

পাল্লা দিত। জর্মন ভাষায় জুলপিকে বলে 'কাট্‌লেট্'। 'হিন্দুস্থান হৌস্' রেস্তোরাঁয় চাটুয্যে খাবার কটলেটের অর্ডার দিলে আমাদের ঠিকে 'বাম্‌নী' রঙ্গ করে বলত, 'তুটো কাটলেটের জন্য একটা কাটলেট, প্লীজ!' সেই বামনী থেকে আরম্ভ করে বার্লিন সমাজের মশাইমোড়ল সবাই তাঁর নামে অজ্ঞান। চেহারা ছাড়া তার আরও তুটো কারণ ছিল। অতিশয় নম্র এবং স্বল্পভাষী। হাঙ্গাম হুজ্জত অপছন্দ করতেন বলে দিনযামিনীর অধিকাংশ তাঁর কাটত 'হিন্দুস্থান হৌসের' সুদূরতম কোণের বৃহত্তম সোফার নিবিড়তম আশ্রয়ে। ব্যসনের মধ্যে ছিল অবরে-সবরে বিপ্লবী ৺নলিনী গুপ্তের সঙ্গে এক গেলাস অতি পানসে বিয়ার পান। এস্থলে বলে রাখা ভাল যে, বিয়ার পান বার্লিনে ব্যসন নয়। খাঁটি খানদানী বার্লিনবাসী ভিরমি গেলেও তার গলা দিয়ে জল গলানো যায় না, এবং মৃতজনের মুখে বিয়ার পাত্র ধরলে সে চুকুস চুকুস দিব্য চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আর চ্যাটুয্যে ছিলেন মিঃ বার্লিন নম্বর ওয়ান।

খুব যে বিত্তশালী ছিলেন তা নয়, কিন্তু পরনে সব সময়ই সুরুচিসম্মত সুট টাই। ফরাসী মহিলাদের সঙ্গে সে দিক দিয়ে তাঁর মিল ছিল। শুনেছি, ইংরাজ রমণীর নাকি ক্ষোভ, ফরাসিনী কী করে এত অল্প খরচে এত সুন্দর জামাকাপড় পরে। কাঁচা বউ যে রকম পাকা শাশুড়ির কম তেল-ঘিয়ে রান্না করা দেখে অবাক হয়।

তিনি ছিলেন ভারতীয় সমাজের বেসরকারী অনারারি পাবলিক রিলেশন্‌স্ অফিসার। তাঁর অতিশয় অনিচ্ছাতে এ-কর্ম তাঁর স্কন্ধে এসে পড়েছিল বলে হিন্দুস্থান হৌসের টেলিফোন বাজলে তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাত নেড়ে যে ফোনের কাছে বসে আছে তাকে বোঝাতেন যে তিনি অনুপস্থিত। অবশ্য বামাকণ্ঠ হলে শিভালরির খাতিরে মাঝে মধ্যে ব্যত্যয় করা হ'ত।

সোফার হাতায় ডান হাত ঠেস দিয়ে তারই উপর গাল রেখে

দিনরাত চিন্তা করতেন। কী চিন্তা করতেন জানিনে—খোঁচাখুঁচি করেও বের করতে পারিনি।

হোটেলে বায়স-নিদ্রায় যামিনী-যাপন করে পরদিন বেরলুম বন্ধুর সন্ধানে। সে ঠিকানায় তিনি নেই। তারপর কলকাতার হিসেবে বলতে গেলে কখনও শেয়ালদা, কখনও আলিপুর, কখনও হাতিবাগান, কখনও টালিগঞ্জ করে করে বুঝলুম, বন্ধুর যে-ঠিকানা আমার কাছে ছিল, সেটা অন্তত এক বছরের পুরনো এবং ইতিমধ্যে তিনি প্রায় প্রতি মাসে বাড়ি বদল করেছেন। পাওনাদারের ভীতি তাঁর নেই, তবে যে কেন তিনি এই বার্লিন প্রদেশটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি চষেছেন পরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেও সেটা জানতে পাইনি। ইতিমধ্যে আমি ভুল বাসে উঠে, ভুল জায়গায় নেমে, ট্রামের নম্বরের সঙ্গে বাসের নম্বর ঘুলিয়ে ফেলে, বিরাট বিরাট বাড়ির আগাপাস্তলা ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে শীতে জবু-থবু হয়ে ককাতে ককাতে যখন নিতান্তই একটা বাড়ির সিঁড়িতে ভেঙে পড়লুম, তখন সন্ধান পেলুম সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের। তিনি নিয়ে গেলেন চাটুয্যের কাছে।

সেই শীতে আমি যেন মাঘের পানাপুকুরে চুবুনি খেয়ে দেখি সমুখের আঙিনায় খড়ের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। এক লহমায় সর্বাঙ্গ ওমে এলিয়ে পড়ল। দু' লহমায় কুল্লে সমস্যার সমাধান হল। সাধে কি রাঢ়ভূমি বলে, 'মুখুয্যে কুলীন শুতি, বন্দ্যো বটে সাদা, তার মাঝে বসে আছে চট্টো মহারাজা!'

পাঠান্তর প্রক্ষিপ্ত।[১]

(১) তুলনার জন্য সুশীল দের 'বাংলা প্রবাদ' নং ২৮৬০ ও ৬৮২৩ দ্রষ্টব্য।

আমাদের 'বটতলা'তে বই বিক্রি হয়, কলকাতা-মাদ্রাসা অঞ্চলের নাম তালতলা। সেখানে আরবী, ফার্সী, উর্দু বই বিক্রি হয়। এখানে 'লিণ্ডেনতলাতে' বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়। লিণ্ডেন মানে ইংরিজিতে 'লাইম', কিন্তু সে 'লাইম' আমাদের নেবু নয়, তাহলে ওটাকে স্বচ্ছন্দে নেবুতলা বলা যেত। বাঙ্গালীরা তৎসত্ত্বেও বলত।

আমাদের দেশ গরম। সেখানে না হয় পণ্ডিতমশাই অক্লেশে ক্লাস বসান। তারও বহু পূর্বে আরণ্যক হয়ে গিয়েছে। অরণ্যে পাঠ্য ব্রাহ্মণের অংশ বিশেষ। কিন্তু এই শীতের দেশে গাছতলাতে ক্লাস বসবে কী করে? নেবুতলা নাম তাহলে নিতান্তই কাকতালীয়। যেমন বেনেরা বটগাছতলায় বসত বলে ফিরিঙ্গিরা বট গাছের নাম দিল 'বানয়ান ট্রি'।

হিটলার যখন তাঁর 'হাজার বছরের জন্য রাষ্ট্র' গড়তে গিয়ে তার রাজধানী বার্লিন শহরের সংস্কার করতে আরম্ভ করলেন, তখন প্রথমেই হুকুম দিলেন লিণ্ডেন বা লাইম গাছগুলো কেটে ফেলতে। শত্রুপক্ষ রটালে, 'ইনি আবার আর্টিস্ট!' আসলে কিন্তু তাঁর দোষ নেই; গাছগুলো তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ জরাজীর্ণ। সেগুলো কাটার ফলে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলো বড্ড ক্যাটক্যাট করে চোখে পড়ল—শত্রু মিত্র-নিরপেক্ষ সবাই মিলে রাস্তাটার নূতন নামকরণ করলে 'উনটার ডেন্ লাটের্নেন্' অর্থাৎ 'লণ্ঠনতলা'! পরে অবশ্য হিটলার তামাম জর্মনি খুঁজে সবচেয়ে সেরা লিণ্ডেন চারা সেখানে পুঁতেছিলেন।

তুশ' বছরের পুরনো খানদানী রাজপথ। রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় এক মাইল অবধি গিয়ে ব্রাণ্ডেনবুর্গ গেট। বিরাট সুউচ্চ সেই তোরণের উপর রথাশ্ব সহ 'বিজয়িনী' বা 'ভিক্টোরিয়ার' (ইংলণ্ডের রানী না) ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তি। হিটলার এ রাস্তা বাড়িয়ে

দিয়ে শার্লটেনবুর্গ পেরিয়ে বহুদূর অবধি টেনে নিয়ে তার নাম দিয়েছিলেন 'ইস্ট-ওয়েস্ট এক্‌সিস্'। তাঁর আত্মহত্যা করার কয়েক দিন পূর্বে এ-রাস্তায় যান চলাচল যখন প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য এখানে উড়োজাহাজ পর্যন্ত একাধিকবার ওঠা-নামা করেছিল। এ্যার পোর্টগুলো তখন মিত্রশক্তির কব্জাতে চলে গিয়েছে বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন—হিটলারের পালাবার কোনও উপায় ছিল না, তাঁদের বিরুদ্ধে অন্যপক্ষ এই ইস্ট-ওয়েস্ট এক্‌সিস্ দেখিয়ে দেন। আজ অর্থাৎ ১৯৫৯ সনে এ রাস্তার পূর্বার্ধ রাশার হাতে, পশ্চিমার্ধ মিত্রশক্তির কিন্তু সে-সব অনেক পরের কথা।

এ-রাস্তায় দ্রুত জীবনের চরম গতিবেগের সঙ্গে শান্ত গ্রাম্য-জীবনের সুষুপ্তির অদ্ভুত সমন্বয়। দু'দিকে যান-চলাচলের রাস্তা; মাঝখানে লাইম গাছের বিস্তীর্ণ এভিন্যু—চলেছে ত চলেছে, তার যেন শেষ নেই। এদিকে পেভমেণ্টের উপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে একাধিক লোক, বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, স্টপেজে ওটাতে চাপবে বলে, আর এদিকে এভিন্যুর উপর দিয়ে মা চলেছেন পেরাম্বুলেটর ঠেলে ঠেলে সপ্তপদী চলার গতিতে। দশ কদম যেতে না যেতে বসে পড়ছেন হেলানদার বেঞ্চিতে। সেখানে পেনশনার চোখ বন্ধ করে পাইপ টানছেন, যুদ্ধে বিকলাঙ্গ বেঞ্চির গায়ে ক্রাচ খাড়া করে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে, এ-বাড়ির আয়া ও-পাড়ার রুটিওলার সঙ্গে রসালাপ করছে, আর বেঞ্চির হেলানে মাথা দিয়ে হেথাহোথা সর্বত্র ঘুমুচ্ছে অনেক লোক। এক বেঞ্চিতে দুটি কলেজের ছোকরা মৃদুকণ্ঠে আলোচনা করছে। আরেক বেঞ্চে একজন আরেকজনের পড়া নিচ্ছে।

দুই সারি বেঞ্চির মাঝখান দিয়ে স্কিপ করতে করতে চলে যাচ্ছে একটি মেয়ে। পিছনে ঠাকুরদা চলেছেন 'প্রেম্'টার চেয়েও মন্দ-গতিতে। মেয়েটি উই—ওখানে—এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্কিপ করছে; ঠাকুরদা গতিবেগ বাড়াবার প্রয়োজন বোধ করছেন না।

এরই এক পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়।

বেশী পুরনো দিনের নয়। একশ' বছরের একটু বেশী। এর চেয়ে ঢের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় জর্মনিতে আছে। আসলে বার্লিন খুব সম্ভ্রান্ত শহর নয়। সে বাবদে রোম, প্যারিস, ভিয়েনা—এমনকি প্রাগ; —যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ইস্তাম্বুলেরও নাম করেন। বার্লিন অনেকটা লণ্ডনের মত; বেশীর ভাগ জিনিসই নকল। সঙ্গীতের জন্য ভিয়েনা, চিত্রের জন্য প্যারিস, ভাস্কর্যের জন্য রোম। তবে কিনা বিজ্ঞান এ-যুগের কামনার ধন। সেখানে বার্লিনের নাম আছে, আর আছে জর্মনির রাজধানীরূপে। তারই প্রায় কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত বলে ব্যবসা-বাণিজ্য এখানে প্রচুর। টোকিও না ওঠা পর্যন্ত বার্লিন পৃথিবীর তৃতীয় নগরী ছিল।

য়ুনিভার্সিটির সামনেই প্রতিষ্ঠাতা ভিল্‌হেলম ফন্ হুম্‌বল্টের প্রতিমূর্তি। গ্যোটের বিশিষ্ট বন্ধু।

হায়, সে সত্যযুগ গিয়েছে।

ভারতবর্ষ, গ্রীস, আরব ভূখণ্ডে একদা জ্ঞানী বললে বোঝাত সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী। সর্ববিষয়ে সমান জ্ঞান থাকবে এমন কোনও কথা ছিল না, কিন্তু সর্ব জ্ঞানভাণ্ডার থেকে অল্পবিস্তর সঞ্চয় করে যিনি অখণ্ড সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্বদর্শনে উপনীত হতে পারতেন তাঁকেই বলা হত পণ্ডিত। এ তিন ভূখণ্ডের পাঠ্যনির্ঘণ্ট দেখলেই বোঝা যায়, আদর্শ ছিল মানবজীবনে পরিপূর্ণতায় পৌঁছনর জন্য পরিপূর্ণ জ্ঞানের সন্ধান। একদিকে আয়ুর্বেদ অন্য দিকে যোগশাস্ত্র, একদিকে ব্যাকরণ অন্য দিকে অলঙ্কার, একদিকে রসায়ন অন্য দিকে দর্শন, সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের প্রতি স্পর্শকাতরতা, নাট্যে প্রীতি, কৌটিল্যের কুটিলতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়, বসন্তসেনার নৃত্যগীতসঙ্গীতের সম্মুখে সহৃদয় বিস্ময়।

বস্তুত, এ সবই বাহ্য। কিন্তু এদের সন্নিবেশের মাধ্যমে কোন কোন গুণী হঠাৎ পেয়ে যান অনির্বচনীয়ের সন্ধান। সে সন্ধান ভূয়োদর্শনের, ভূমানন্দের।

সবাই পেত তা নয়, কিন্তু না পেলেও তাঁরা সাধকসমাজে সম্মানিত হতেন। সর্ববিষয়ে তাঁদের সহানুভূতি থাকত বলে তাঁরা প্রাজ্ঞসমাজের পৃষ্ঠপোষক বলে খ্যাত হতেন।

জর্মনিতে এ স্বর্ণযুগ আসে অষ্টাদশ শতকের শেষে ও ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে। তার অন্যতম প্রতীক ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ফন হুম্‌বল্ট।

আসলে ইনি কবি এবং আলঙ্কারিক। রসশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রামাণিক পুস্তক এবং গ্যোটের কাব্যালোচনা নিয়ে তিনি নামলেন আসরে। কিন্তু অল্পকাল যেতে না-যেতেই তাঁর রাজনৈতিক প্রাখর্য ধরা পড়তেই তাঁকে ডাকা হল রাজসভায়। ওদিকে তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করতেন—সর্বোচ্চ আদর্শ বলে ধরে তুলেছিলেন মানবচরিত্রের স্বাধীন এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশ। সেই আদর্শ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তাই তিনি আজ ভিয়েনা কাল লণ্ডনের রাজ-দরবারে যেতেন, কিংবা পরশু বার্লিনের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে কাজ করে গেলেন। ঐ সময়েই তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের বাস্‌ক্‌দের ভাষা নিয়ে আলোচনা করে দেখিয়ে দিলেন যে ভাষার মূলে ব্যাকরণ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ভাষার কাঠামো ভাল করে পরীক্ষা করলে পাওয়া যায় সে-ভাষাভাষীর পরিপূর্ণ ইতিহাস। যে-কোন সমাজের সর্বাঙ্গীন ইতিহাস লুকনো থাকে তার ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের মাঝখানে। তাই এক সমাজ যেমন অন্য সমাজ থেকে ভিন্ন ঠিক তেমনি এক ভাষা অন্য ভাষা থেকে। মূলে এক সমাজ হলেও তারা যদি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, তবে তাদের ভিন্ন ভিন্ন বিবর্তন তাদের আপন আপন ভাষাতে প্রতিবিম্বিত হয়।

সেই সূত্রে তিনি উপনীত হলেন চরম মীমাংসায়—মানুষের মননবৃত্তির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হয়েছে আর্য ভাষায়। মানব দেবতাত্মার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তার বাঙ্ময় ভুবনে।

ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ফন হুম্‌বল্ট ভাষাতত্ত্বের সর্বপ্রথম দার্শনিক।

তাঁর অনুজ আলেক্সাণ্ডার ফন হুম্‌বল্টের পরিচয় দেওয়া আরও কঠিন। সে-যুগের গুণীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, নেপোলিয়নের পরেই খ্যাতিতে এঁর স্থান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন শাখা-প্রশাখা ছিল না যাতে তিনি বিচরণ করেননি। এদিকে ভূতত্ত্ব উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, ওদিকে উত্তর মেরু থেকে আরম্ভ করে বিষ্‌বরেখা অবধি চুম্বকের আকর্ষণশক্তি-বিবর্তন, মহাকাশে উল্কাপিণ্ডের বিশেষ দিনে প্রবলতর বর্ষণ—বিজ্ঞানের একাধিক নবীন ক্ষেত্র তিনি আবিষ্কার করলেন। মহাপুরুষ মুহম্মদ বলেছিলেন, জ্ঞানের সন্ধানে যদি বেরুতে হয় তবে চীনেও যেয়ো। আরবীদের কাছে চীনই সবচেয়ে দূরের দেশ। এ মনীষী জর্মনি থেকে চীন, ওদিকে দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বত কিছুই বাদ দেননি। ষাট বছর বয়সে মানুষ যখন খ্যাতির মুকুট পরে সহাস্যবদনে জনগণের করতালিধ্বনি শোনে, তখন হঠাৎ অর্থানুকূল্য পেয়ে বেরলেন রাশিয়া ভ্রমণে—আবিষ্কার করলেন উরালে হীরকচিহ্ন। অথচ প্রথম যৌবনে প্রকাশিত তাঁর দার্শনিক রহস্যতত্ত্ব ও মাংসপেশীর স্নায়ু সম্বন্ধে রচনা তখনই পণ্ডিতমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

তাঁর 'কস্‌মস্‌' বা সৃষ্টি এখনও আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পড়া যায়। এ-ধরনের বই আজকাল আর লেখা হয় না। প্রাচীন দার্শনিক জ্ঞান ও সনাতন রসতত্ত্ব তিনি মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সে-যুগের নববিকশিত বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে এমন এক সংমিশ্রণে যাতে করে বিজ্ঞানের ক্ষুদ্রতম বিচ্ছিন্ন জ্ঞানবিন্দু ভূয়োদর্শনের অসীম সিন্ধুতে স্থান পায়। পক্ষান্তরে দার্শনিকের কল্পনা-বিলাসের ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা যেন বাস্তবের ধূলিকণাকে অবহেলা না করে।

তাই বোধ হয় নগণ্যজনের দৈন্য-দুর্দশা সম্বন্ধে তিনি যৌবন-প্রারম্ভেই সচেতন হন। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি দেখে উদ্ধত ভাষায় তার প্রতিবাদ জানিয়ে যে সংস্কার কর্ম আরম্ভ করলেন সে-কথা আজও জর্মনি ভোলেনি। পরবর্তীকালে দাস-প্রথার সঙ্গে

তাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন এই যুগধর্মসম্মত প্রথার বিরুদ্ধে। এবং আজীবন তাঁর প্রচেষ্টা ছিল, বিত্তহীন জ্ঞানার্থী দুঃস্থ পণ্ডিত যেন সংসারের তাড়নায় তার সাধনার মার্গ বর্জন না করে।

তাই যখন কৃতজ্ঞ জর্মনগণ বিত্তহীন জ্ঞানার্থীর জন্য 'ব্রহ্মোত্তর' বা 'ওয়াক্‌ফ্‌' অর্থাৎ 'ট্রাস্ট্' নির্মাণ করল তখন সেটিকে উৎসর্গ করা হল তাঁরই নামে—'আলেকজাণ্ডার ফন্ হুম্‌বল্ট স্টিফ্‌টুঙ্'। দেশে-বিদেশে এটি সুপরিচিত।

এদেশে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে এই ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ইনি এঁদের জীবনী ও কার্যকলাপের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন।

সে সত্যযুগ গেছে। মহাকবি গ্যোটেকে গুরুত্বে বরণ করে তাঁর চতুর্দিকে যে কেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর কোথাও হয়নি। শ্লেগেল, ফিষটে, শিলার, হুম্‌বল্ট-ভ্রাতৃদ্বয়, একেরমান ইত্যাদি ইত্যাদি বহু পণ্ডিত, গবেষক, কবি তাঁদের জীবন-বাতায়ন উন্মুক্ত করে পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞান-দর্শন, ঊর্ধ্ব-অধঃর বিজ্ঞান-বিশ্লেষণকে যে আবাহন করেছিলেন, তারই ফলে জর্মনির যে সর্বমুখী বিকাশ হল আজও সে বিশ্বজনের বিস্ময়।

লোকে শুধায়, যে জর্মনি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পদদলিত, নিঃস্ব, আজ সে বিশ্বের উত্তমর্ণ হল কী প্রকারে?

এর বুনিয়াদ বড় দড়।

জীবনের সেই তিনটি সপ্তাহ কী করে কেটেছে তার বর্ণনা দেবার শক্তি আমার নেই। যেন পাহাড়ের চূড়ায় হঠাৎ কুয়াশা নামল। হাতড়ে হাতড়ে আমি এদিক যাচ্ছি ওদিক যাচ্ছি আর দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা দেখছি; হঠাৎ পায়ের তলার শক্ত জমি খসে পড়েছে আর আমি সর্বনাশের অতল গভীরে বিলীন হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছি। এবারে 'ভাষা-পরীক্ষা'র শক্ত জমিতে পড়ার সঙ্গে সব কটা হাড়হাড্ডি গুঁড়িয়ে যাবে।

'ভাষা-পরীক্ষা'টা কী?

চাটুয্যে নিয়ে গেছেন ডঃ গ্যোপেলের কাছে। বলে রাখা ভাল, ইনি হিটলারের প্রোপাগাণ্ডা-মাস্টার ডঃ গ্যোবেল্‌স্ নন। হুম্‌বল্ট্ ফাউণ্ডেশনের সেক্রেটারি। অতিশয় নিরীহ লোক। ততোধিক সাদাসিদে জামা-কাপড়—যত দূর সস্তা হতে পারে। মোটাসোটা মানুষ এবং হাসি হাসি মুখ। মিষ্টি সুরে এত নিচু গলায় কথা কন যে, টেবিলের এপারে এসে পৌঁছয় না। দেশে থাকতে এঁর সঙ্গেই পত্রালাপ ছিল। ইনিই প্রাঞ্জল জর্মনে জানিয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সীট তৈরী; আমি এলেই হল। এখন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ সেই মিষ্টি গলাতেই বললেন, 'অবশ্য একটা অত্যন্ত সরল মামুলী পরীক্ষা দিতে হবে যে, কলেজের লেকচার বোঝার মত জর্মন ভাষায় ক খ গ ঘ আপনি জানেন।'

বলে কী! পরীক্ষা দেব কী করে? ফেল মারব নিশ্চিত। পড়তে পারি—খানিকটা। কিন্তু কেউ কথা বললে সেটা বুঝতে ত পারিনে। না হলে চাটুয্যেকে দোভাষী বানিয়ে আনব কেন?

আর এ ত বড় বিদকুটে ব্যবস্থা। পড়াশুনোর পর পরীক্ষা দিতে রাজী আছি, কিন্তু এখানে বুঝি আগে পরীক্ষা, তারপর লেখাপড়ি? আগে ফাঁসি তারপর বিচার। হটেনটটের রাজত্বেও ত এ-রকম ধারা

হয় না। হ্যাঁ, দার্শনিক শোপেনহাওয়ার নামকরা জর্মন লেখকদের ভাষাতে ব্যাকরণের ভুল দেখে একবার বলেছিলেন, 'শুধু জর্মন আর হটেন্‌টটরাই আপন মাতৃভাষা নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলে।'

আমাদের রঙ কালো বলে মুখের ভাব-পরিবর্তন ইয়োরোপীয়রা চট করে ধরতে পারে না। তাই তারা বলে, আমরা দুর্জ্ঞেয়, অবোধ্য। আমার চেহারা কিন্তু তখন এমনি ফ্যাকাশে মেরে গিয়েছে, শুকনো গলা-তালু থেকে এমনি চেরা বাঁশের শব্দে আওয়াজ বেরুচ্ছে যে, ভাল মানুষ ডঃ গ্যোপেল পর্যন্ত সেটা লক্ষ্য করে আমাকে দিলাশা-সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করেছেন। পরীক্ষাটা নাকি একেবারে কিস্‌সুটি নয়, ছেলেখেলা, এলিমেণ্টারী, ছ'মাসের কোর্স, এখনও তিন সপ্তাহ রয়েছে, এন্তের সময় পড়ে আছে।

'মানে?'

'অর্থাৎ বিদেশীদের জন্য জর্মন ভাষার ক্লাস হয়। ছ' মাসের কোর্স। আর তিন সপ্তাহ বাদে পরীক্ষা। আপনি কাল থেকে ঢুকে যান—সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অর্থাৎ ছ' মাসের কোর্স আমাকে তিন হপ্তায় শেষ করতে হবে। ওঃ! কী সুখবর!

কিন্তু আমি আপত্তি জানাই কি করে? বৃত্তির জন্য দরখাস্ত পেশ করার সময় কবুল জানিয়েছি যে, আমি জর্মন জানি, প্রোফেসারের সার্টিফিকেটও সঙ্গে ছিল। এখন সেগুলো বদবদল করি কি প্রকারে?

গ্যোপেল মিষ্টি গলায় হাসিমুখে আমাকে আরও অনেক সান্ত্বনা দিলেন—তার অল্প অল্প বুঝলুম। বাকিটা চাটুয্যে অনুবাদ করে দিলেন।

তাঁর প্রত্যেকটি সান্ত্বনা-বচন আমার সর্বাঙ্গ কণ্টকিত করল। এ যেন ফাঁসির আসামীকে বলা হচ্ছে, দড়িটাকে মাখম মাখিয়ে মোলায়েম করা হয়েছ, যে-টুলে দাঁড়াবে সেটা মখমলে মোড়া।

সায়েবের কথার ফাঁকে এটাও বেরিয়ে গেল যে, পরীক্ষায় ফেল

মারলে ভর্তি হতে পারব না। আবার ভর্তি হওয়ার পালা ছ'মাস পরে। অর্থাৎ আমার জর্মন-বাসের শেষের ছ' মাস কাটবে বিনা বৃত্তিতে—অনাহারী। সায়েব সেটা অবশ্য বলেননি। তিনি পই পই করে বোঝাচ্ছিলেন ও-পরীক্ষাতে ফেল মারে শতকরা একজন। কিন্তু সে একজন যে আমি হব না, তিনি জানেন কী করে? লটারিতে হই না, সে আমি জানি।

আরবী ভাষায় বলে, আকাশে দু'খানা চাপাতি। একটি ঠাণ্ডা, আরেকটি গরম। চন্দ্র আর সূর্য।

রাস্তায় যখন বেরলুম তখন দুপুর। সূর্যটিও তখন আমার কাছে ঠাণ্ডা চাপাতি বলে মনে হল।

তাই বলছিলুম, 'ভাষা-পরীক্ষা'র শক্ত জমিতে পড়ে হাড়-হাড্ডি চুরমার না হওয়া পর্যন্ত এখন শুধু হুশ্ হুশ্ করে নীচের দিকে পতন।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরের ক্রসিঙে ক্রসিঙে ট্রাফিক পুলিশম্যান রাখা উচিত। আমি ঢুকেছিলুম দু' পিরিয়ডের মাঝখানে ক্লাস-বদলাবদলির সময়। করিডরে করিডরে 'আপন ডাইন' রেখে তরুণ তরুণীর জনস্রোত উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম পানে যাচ্ছে, কিন্তু ক্রসিঙে এসে লেগে যাচ্ছে ধুন্দুমার। ঠিক ঐ সময়ই হয়ত খুলে গেল তারই পাশের বিরাট হলের দরজা। তার থেকে বেরবার চেষ্টা করছে আরও শ' দুই ছাত্রছাত্রী। তখন লেগে যায় সত্যি-কার হরিলুট। সবাই আবার চলতে চলতে ধাক্কা খেয়ে এদিক ওদিক ঠিকরে পড়ে তর্ক চালাচ্ছে নিজেদের মধ্যে—এখ্খুনি ক্লাসে অধ্যাপক যা পড়িয়েছেন তাই বিষয়বস্তু।

কিন্তু এত তাড়া কিসের পরে শুনলুম এবং দেখলুমও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা এবং তার অনুপাতেরও বেশী ছাত্রীসংখ্যা এত মারাত্মক রকমের বেড়ে গিয়েছে যে, এখন আর ক্লাসে জায়গা হয় না। আগে না গেলে রক্ষে নেই।

রোল কল্ এদেশে নেই। শুনে বঙ্গসন্তান আমি বড়ই উল্লাস

বোধ করেছিলুম। গাইড-বুক নিশ্চয়ই আছে। তাই মুখস্থ করে ঠিক পরীক্ষা পাস করে যাব—অবশ্য 'ভাষা-পরীক্ষা' নয়, ফাইনালটার কথা হচ্ছে। তখন শুনলুম, গাইড বুক নেই, অধ্যাপকরা বই লেখেন, সেগুলো পড়তে হয়। তাহলে ক্লাসে যাবার কী প্রয়োজন? বিস্তর। বই প্রকাশিত হওয়ার পরও অধ্যাপক যে-সব গবেষণা করেছেন সেগুলো বলেন ক্লাস-লেকচারে। পরীক্ষার সময় প্রশ্ন করেন তার থেকে। তার উত্তর না দিতে পারলে ভাল নম্বর পাওয়া যায় না—শুধু মাত্র বইয়ের জোরে মেরে কেটে পাস-নম্বর পাওয়া যায় মাত্র।

এসব পরের কথা।

এ-জলতরঙ্গ ভেদ করে গন্তব্য স্থলে পৌঁছান সম্পূর্ণ অসম্ভব বুঝতে পেরে আমি মোকা পেয়ে একটা ফাঁকা ক্লাসে ঢুকে পড়লুম। খানিকক্ষণ পরে ঘণ্টা পড়ল, নেক্সট্ পিরিয়েডের। করিডরগুলো মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করতে লাগল।

দেশে থাকতে কত রকম কথাই না শুনেছিলুম—জর্মনি পণ্ডিতের দেশ, সেখানকার সবাই ইংরিজি জানে। রাস্তা সোনা মোড়া। গাঁয়ের লোক যে রকম ভাবে শ্যালদায় পৌঁছলেই তার জন্যে হুদো হুদো চাকরী 'অপিক্ষে' করে বসে আছে।

অনেক কষ্টে 'বিদেশীদের প্রতিষ্ঠানটি' আবিষ্কার করলুম। আশা করেছিলুম, বিদেশীদের নিয়ে এদের যখন কারবার তখন অন্তত এরা ইংরিজি বলতে পারবে। পারে। তবে আমি যতখানি জর্মন পারি তার চেয়েও কম।

বুঝলুম, বিদেশী রাজত্ব না হওয়া পর্যন্ত কোনও দেশের লোক ব্যাপকভাবে বিদেশী ভাষা শেখে না। আমরা এককালে ফার্সী শিখেছিলুম; তারপর ইংরিজি শিখলুম।

মনকে সান্ত্বনা দিলুম, এরা সবাই ইংরিজি বলতে পারলে আমার আর জর্মন শেখা হত না।

ইতিমধ্যে এক সুপুরুষ কাউন্টারে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন।

ওঁকে দেখেই যে-মহিলাটি আমার তদারক করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি খুশিভরা মুখে অনর্গল জর্মন বলে যেতে লাগলেন। বার বার 'প্রফেসর' কথাটা আসছিল বলে অনুমান করলুম, ইনি আমাকে জর্মন শেখাবেন। আমিও খুশিমনে ভাবলুম, এবারে আমার ভাঙা-নৌকা কূল পেল। একে আমার হৃদয়-বেদনা সমুচিত ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারব।

ইয়াল্লা! ইনিও তদ্বৎ। পরে জানলুম, পাছে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই আপন আপন মাতৃভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলে বলে জর্মন অবহেলা করে তাই তিনি একাধিক ভাষা জানা সত্ত্বেও জর্মন ভিন্ন অন্য ভাষা বলেন না।

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ভাঙা নৌকোটা দ'য়ের দিকে ঠেলে দিয়ে অতল জলে ডুব দিলুম। মা গঙ্গাই জানেন, বস্ত্র নেই— গামছাখানা পর্যন্ত গেছে। মনকে ধমক দিয়ে বললুম, 'ইংরিজির প্রতি তোমার এত দরদ কেন? ওটা কি তোমার বোনপোর ভাষা? জর্মন কি সতীনের ভাষা? ব্যস, হয়েছে, আর মুক্তোবনে বেনা বোনবার প্রয়োজন নেই।'

প্রফেসর আদর করে প্রায় হাতে ধরে ক্লাসের দিকে নিয়ে চললেন। আবার চতুর্দিকে জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ। এবারে কিন্তু ভয় নেই। প্রফেসর কাণ্ডারী। ইনি যদি এ দরিয়ায় আমাকে না বাঁচাতে পারেন তবে ব্যাকরণ পারাবারের কুমীর-হাঙ্গর কৃৎ-তদ্ধিতের পুচ্ছ-দন্ত থেকে পরিত্রাণ করে ভাষা-পরীক্ষার ওপারে নিয়ে যাবেন কি করে? সেই পাদ্রী সায়েবের গল্প মনে পড়ল। বদলী হয়ে এসে অচেনা গ্রামে নেমেছেন। রাস্তায় দুটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন গাঁয়ের গির্জের পথ।

তারা বাতলে দিলে তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'আজ তোমরা আমাকে গাঁয়ের পথ বাতলে দিলে; আসছে রববারে যদি গির্জেয় আস তবে স্বর্গে যাবার পথ আমি তোমাদের বাতলে দেব।'

তখন একটা ছেলে অন্য ছেলেটার পাঁজরে খোঁচা মেরে বললে, 'শুনলি ? গাঁয়ের পথ জানে না—সে বাতলে দেবে স্বর্গ যাবার পথ !'

উপস্থিত দেখলুম, জর্মনি দেশের আমার প্রথম গুরু অন্তত গাঁয়ের পথটা জানেন।

সে কী ক্লাস! চীনেম্যান থেকে আরম্ভ করে নিগ্রো পর্যন্ত! ঢের ঢের চিড়িয়াখানা দেখেছি, কিন্তু এ-রকম তাজ্জব চিড়িয়াখানা পূর্বে দেখেনি পরেও দেখেনি। এরা যদি কোট-পাতলুন না পরে আপন আপন দেশের পোশাক পরত তাহলে অনায়াসে পৃথিবীর যে-কোন ফ্যান্সি ড্রেস, কস্টুম্ বল্‌কে হারাতে পারত। দুনিয়ার চিড়িয়া জড়ো হয়েছে জর্মন বুলি শিখে, এদেশের এলেম রপ্ত করে দেশে ফিরে নয়ী তালিমের ছয়লাপ বইয়ে দেবার জন্য। আর বয়েসেরই বা কত রকমফের! আঠার থেকে চল্লিশ অবধি ছেলেবুড়ো, মেয়ে-মদ্দ।

আমরা যখন ক্লাসে ঢুকলুম তখন একটি আঠার-উনিশের খাপসুরৎ চিংড়ি প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশের রগে-পাক-ধরা চুলের চীনা ভদ্রলোককে ব্লাকবোর্ডের উপর কী একটা ধাঁধা বোঝাতে গিয়ে খিল-খিল করে হাসছে, আর চীনা প্রৌঢ়টি গাম্ভীর্যের স্মিতহাস্যের সঙ্গে বোকা বনে-যাওয়ার ভাবটা মিশিয়ে ঘন ঘন সামনে পিছনে দুলে দুলে দু'ভাঁজ হচ্ছেন—ভদ্রতা আর ধন্যবাদ জানাতে হলে চীনারা যে রকম 'কাওটাও' করে।

প্রফেসর হেসে বললেন, 'চলুক। আমি বাধা দিতে চাইনে। ধাঁধাটা কী ?'

চিংড়ি আড়াই লম্ফে ডেস্‌কে পৌঁছে তারই উপর মোলায়েমসে বাঁ হাত রেখে অর্ধ লম্ফের আধা চক্কর খেয়ে ডেস্‌ক্ টপকে গুপুস করে বসে পড়ল আপন সীটে। আমি শুধু দেখতে পেলুম, এক গাদা বাদামী-সোনালী মেশা ঢেউ-খেলানো চুল আর বেগুনি হলদেতে ডোরা-কাটা ঘাঘরার ঘূর্ণি।

ক্লাসের লটবর—পরে জানলুম গ্রীক—বললে 'শাবাশ !'

ত্রেতা

সেই যে সুন্দরী মেয়েটি এক লম্ফে ডেস্ক্ ডিঙিয়ে আসন নিয়েছিল তারপর ঝাড়া বিয়াল্লিশটি বছর কি করে যে হুশ করে মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল তার জমা খরচ আমি কখনো নিই নি। এই চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস লেখা আমার শক্তির বাইরে। তবে মনে মনে-আশা পোষণ করেছিলুম ল্যানগুইজ পরীক্ষায় পাস করে আমি যে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছিলুম তার বয়স, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপদ্ধতি, সেখানকার ছাত্রজীবন, তারপর বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন. এদিকে বন্ শহর ওদিকে সপ্তকুলাচল, মাঝখানে বিশাল প্রশস্ত রাইন নদ, গোডেসবের্গে জীবন যাপন, হিটলারের অভ্যুদয়, তার একচ্ছত্রাধিপত্য, ইতিমধ্যে হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরে বৎসরাধিক কাল বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, (ঐ সময়টায় আমি অবশ্য জর্মনিতে ছিলুম না কিন্তু হিটলারের তাবৎ বক্তৃতা এবং গ্যোবেল্স্-এর অনেকগুলো বেতার মারফৎ শুনেছিলুম) হিটলারের পতন, যুদ্ধ শেষের কয়েক বৎসর পর পুনরায়—একাধিকবার—জর্মন ভ্রমণ, বন্ধুমিলন এবং যারা যুদ্ধ থেকে ফেরেনি তাদের বিধবা, পুত্রকন্যার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ —আরো কত কী—এসবের বর্ণনা দফে দফে দেব। কিন্তু বিধাতা বোধ হয় সেটা চাননি। আমি যাতে অকরুণ অকারণে নিরীহ বঙ্গপাঠকের মস্তকোপরি অষ্টাদশ ভলুম নিক্ষেপ না করি তাই তিনি এই চল্লিশ বৎসর আমাকে ননস্টপ তুর্কী নাচন নাচিয়েছেন এবং তার ডান্সফ্লুর কন্যাকুমারী থেকে সিমলে, মসৌরী, পিণ্ডিদাদনখান থেকে কামাখ্যা! আর সব বাদ দিন—অষ্টাদশপদী এ খট্টাঙ্গ

পুরাণ রচনা করার জন্য নিদেন যেটুকু দেশকাল পাত্রের তথা অবকাশের প্রয়োজন তার একরত্তিও তিনি আমাকে দেননি। তাঁকে বার বার নমস্কার।

"পাগলা" রাজা মুহম্মদ তুগলুক সর্বদাই তাঁর প্রজাদের মঙ্গল কামনা করতেন। কিন্তু অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন বলে মাত্রাবোধ ছিল তাঁর কম এবং প্রায়ই লঘু অপরাধে মারাত্মক গুরু দণ্ড দিয়ে বসতেন—অনেক স্থলে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা যে-রকম পুত্রকে তস্য উপকারার্থে মাত্রাধিক লাঠ্যৌষধি সেবন করান। তাই পরলোক গমনের কিয়দ্দিন পূর্বে তিনি আপসোস করেছিলেন "আমি প্রজাদের কল্যাণার্থে যে-সব আদেশ দিতুম তারা সেগুলো অমান্য তো করতই তদুপরি আমার পুণ্য উদ্দেশ্যও তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না।" তাঁর মৃত্যুর পর রাজ-ঐতিহাসিক জিয়া উদ্-দীন লিখলেন প্রজা-সাধারণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মহারাজ আনন্দিত হলেন ও প্রজাসাধারণও হুজুরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

অষ্টাদশী খট্টাঙ্গ পুরাণ লোষ্ট্র চিরসহিষ্ণু বঙ্গীয় পাঠকের শীর্ষদেশে নিক্ষেপ না করতে পেরে আমি হর্ষোদ্বেলিত কণ্ঠে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ আমেন আমেন জপ করছি এবং আচণ্ডাল গৌড়জনও সেই বিকট মধুচক্র পান না করতে পেরে ঘন ঘন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন।

কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আপ্তবাক্য রূপে বলেছেন, "যে-লোক মূলো খেয়েছে তার ঢেকুরে মূলোর গন্ধ থাকবেই।" তাই এই চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা যে আমার লেখাতে কিছু না কিছু বেরিয়ে যাবেই যাবে এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু যে-ইঙ্গিত পূর্বেই দিয়েছি তারই পূর্ণার্থে প্রকাশ করে বলি, সে-সব অভিজ্ঞতা সুসংলগ্ন ভাবে কালানুক্রমে লিখে উঠতে পারিনি। কিন্তু আমি ভরসা রাখি যে সহৃদয় পাঠক আমার প্রকাশিত পুস্তক থেকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত

টুকিটাকি ছিঁটেফোঁটা জুড়ে নিয়ে একটি জিগশো পাজল্ সমাধান করতে পারবেন—অর্থাৎ একটি মোজাইক[১] নির্মাণ করতে পারবেন, তদর্থ: মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পেয়ে যাবেন। যদিও তার আউট লাইনগুলো সূক্ষ্ম শার্প হবে না, বহু ডীটেল বাদ পড়ে যাবে কিন্তু তাতে করে কিছু আসে যায় না। তদুপরি ভারতের প্রায় সর্বশেষ আলঙ্কারিক বলেছেন, সব-কিছু সবিস্তর বর্ণন ক'রো না; পাঠককে ইঙ্গিত দেবে ব্যঞ্জনা দেবে মাত্র যাতে করে সে তার কল্পনাশক্তির সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পায়। তাই কবিগুরুও আপ্তবাক্য বলে গেছেন:

"একাকী গায়কের নহে তো গান
গাইতে হবে দুজনে
একজন গাবে খুলিয়া গলা
অন্য জন গাবে মনে।"

যে দেশে বার বার গিয়েছি তারই এক গুণী বলেছেন "যে স ব ক থা স বি স্ত র বলতে চায়, তার কোনো কথাই বলা হয় না।" "অনেক কথা যাও যে বলি কোনো কথা না বলি। (তাই) তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি॥"

১ অধুনা বঙ্গীয় পাঠক লেখক মোজাইক বলতে হাইলি পলিশড্, অতিশয় মসৃণ এবং সচরাচর একরঙা মেঝেকেই বুঝেন, বোঝান। আমি শব্দটি মূলার্থে ব্যবহার করেছি। পাথরের ছোট ছোট রঙবেরঙের টুকরো এমন ভাবে সাজানো হয় যে তার থেকে একটি ছবি ফুটে ওঠে। মোজাইক তাই চিক্কণ মসৃণতা হয়ই না বরঞ্চ তার বৈশিষ্ট্য ঠিক বিপরীত। যে কোনো দুটি পাথরের টুকরো বা কুচি ঠায় ঠায় অঙ্গাঙ্গি একজোড় হতে পারে না বলে সে অসমতল। তাই অতিশয় মসৃণ মেঝেতে (যাকে আজকের দিনে মোজাইক বলা হয়) মানুষের পা হড়কায় মোজাইকে সেটা প্রায় ১০০% অসম্ভব। অনেকে মনে করেন যে পা যেন না হড়কায় এই নিতান্ত প্র্যাকটিকাল উদ্দেশ্য নিয়েই মোজাইকের গোড়া পত্তন হয়।

বলেছেন পুনরপি ভাষার জহুরী বিশ্বকবি।

মোদ্দা কথা: কোনো পুস্তকের সব ছত্রই যদি আণ্ডার-লাইন করো তবে কোনো ছত্রই আণ্ডার-লাইন করা হয় না।

শ্রদ্ধেয় সুনীতি চট্টোপাধ্যায় একখানা বিরাটাকার বাংলা ব্যাকরণ লেখার পর অনুভব করলেন, "হয়তো বড্ড বেশী বলা হয়ে গেছে।" তাই রচনা করলেন একটি ক্ষুদ্র ব্যাকরণ। পথে দেখা হতে বললেন, "এবারে একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ লিখেছি; আগেরটা ছিল ক্ষিপ্ত ব্যাকরণ!" আমার এ-লেখাটাতে তাঁর ইরশাদ-নির্দেশ মস্তকাভরণ হয়ে রইল।

আরেক গুণী আরেকটি সরেস উপদেশ দিয়েছেন: "স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে লেখাতে কিছু কিছু ভুল রেখে দিয়ো। পাঠক সেগুলো ধরতে পারলে বিমলানন্দ অপিচ আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। মনে মনে বলে, "আমিই বা কম যাই কিসে। ব্যাটা লেখক যতই বড়-ফাট্টাই করুক না কেন আমি, হ্যাঁ, আমি তার সব-কটা বমাল ধরতে পারি।" হয়তো বা কাগজে "ভ্রম" সংশোধন করে চিঠি লিখবে। ছাপা হলে তারে আর পায় কেডা? পাড়াব সবাইকে সেটা দেখাবে। সে শংকরের কান মলতে পারে, অবধূতের নাসিকা কর্তন কর্মে সিদ্ধহস্ত। আপনার বইয়ের আরো তিন কপি সে কিনবে। সে যে কেরামতী মেরামতী করেছে সেগুলো সহ বিয়ে-শাদীতে প্রেজেণ্ট করবে। আপনার অন্যান্য তাবৎ বই গ্যাটের কড়ি খর্চা করে বাড়িতে তুলবে—ভুলের সন্ধানে, আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য।"

আমাকে অবশ্য সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় ভুলের কলঙ্ক লেখার উপর ছিটোতে হয় না। সদাপ্রভু আমার হাত দিয়ে নিত্য নিত্য তামাক খান আর আমি খাই পাঠক পণ্ডিতের কানমলা।

ঈশ্বর সদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু মন্নাহ জগন্নাথ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন পরলোক গমনের দিন দুই পূর্বে তাঁরই সম্মুখে তাঁর চিকিৎসক

তাঁর সহধর্মিনীকে বলেন, "আর দুধটাতে একটু জল দিয়ে সেটা পেতলে নেবেন—উনি তা হলে সহজেই হজম করতে পারবেন।" ক্ষিতিমোহন জানতেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। কিন্তু যে লোক আজীবন রসিকতা করেছে মৃত্যুভয় তাকে স্বধর্মচ্যুত করতে অক্ষম। মৃদু কণ্ঠে বললেন "সিডা আর হাসপাতালে[২] করন লাগবো না। গয়লাই আপন বাড়িতে কইরা লয়।"

বিধাতা বলুন, নলরাজের অন্তরে প্রবিষ্ট কলিই বলুন, তিনি ঐ গয়লার মত আমার রচনাতে অনবরত জল মেশাচ্ছেন। অধম এ লেখককে আমার গুবীর মত আর জল মেশাতে হয় না।

আগাতা ক্রিস্টি বিয়ে করেন এক আর্কিয়োলজিস্ট্ বা প্রত্ন-তাত্ত্বিককে। ক্রিস্টি যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন তখন এক দরদী যুবতী তাঁকে শুধোন "আপনি বুড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্বামী আপনাকে অবহেলা করছেন না তো! আফটার অল—পুরুষের মন।"

মাদাম শ্যানা হাসির ঝিলিক খেলিয়ে বললেন, "তোমরা তো বিয়ে করার সময় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে দুম্ করে ঝুলে পড়ো! আম্মো প্রথম বারে তাই করেছিলুম। দ্বিতীয় বারে নির্বাচনটি হৃদয়ের হাতে ছেড়ে না দিয়ে দিলুম হেডাপিস অর্থাৎ ধুবন্ধর ব্রেন বক্স্‌টিকে। সে ফরমান দিলে বিয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাটাই শ্রেয়তর প্রস্তাব। কিন্তু নিতান্তই যদি করতে হয়, তবে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিককে।" ... খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মাদাম শেষ তত্ত্ব, গভীরতম তত্ত্ব প্রকাশ করে বললেন, "জানো তো, যে জিনিস যত বেশী প্রাচীন হয়, প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে তার মূল্য তত বেশী।

---

২ ঘটিরা কেন "হাঁস"পাতাল লেখেন, এ-বাঙালবুদ্ধির সেটা অগম্য। ইংরিজিতে তো "Hos"(pital)-এ কোনো অনুনাসিক নেই! ঠিক সে রকম "হুঁশ"। ফার্সীতে অনুনাসিক নেই।

'কজিটো এর্গো স্থমের' ছকে ফেলে অতএব আমি যত বুড়োচ্ছি ততই ওঁর কাছে আমার মূল্য বাড়ছে।"

বিধাতা গয়লা আমার লেখাতে যেমন যেমন শনৈঃ শনৈঃ ব্যাকরণের ভুল বাড়াচ্ছেন, শৈলীর শিরদাঁড়া আর ভাষার পাঁজর কটা মট মট করে ভাঙছেন, আমার বইয়ের কাটতি তেমন তেমন হুশ্ হুশ্ করে বেড়ে যাচ্ছে। পূর্বে যে-স্থলে আড়াই শ' বইয়ের এক সংস্করণ কাটতে ঝাড়া কুড়িটি বছর কেটে যেত এখন মা ত্র উনিশটি বৎসর!

হরি হে তুমিই সত্য।

এই যে হনুমানী লম্ফ দিকে আমি মবলগ চল্লিশটি বছর অতিক্রম করলুম নানাবিধ প্রবন্ধ গল্প মারফৎ এ-চল্লিশ বৎসরের একটা সাদামাটা বোঁচাভোঁতা মজায়িক গড়ে তুলেছি, যার উল্লেখ পূর্বেই করেছি, এবং এটাকে দু' যুগের সেতুবন্ধস্বরূপ বিবেচনা করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে এবং বর্তমান লিখন সম্বন্ধে একটি সাবধানবাণী আমাকে চতুর্থ বা পঞ্চম বারের মত পাঠকের দরবারে পেশ না করলে আমি গুরুহীন তথা ধর্মভ্রষ্ট হব।

সেটি এই:

১৯৪৪ সালে যখন স্বরাজ কোন্ শুভাশুভ লগ্নে অবতীর্ণ হবেন, কি রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হবেন, বামন অবতার না এক আজব নয়া ক্লীব শিখণ্ডি অবতার—এবং সেও অতিশয় ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র ধূলি পরিমাণ অংশাবতার হয়ে (আজ তো অহরহ চতুর্দিকে সেই নপুংসকাবতারই দেখতে পাচ্ছি) এই দিলীপ ভগীরথের (একদা) প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হবেন—সে যুগে আমাদের মনে স্বরাজ সম্বন্ধে স্পষ্টাস্পষ্ট কোনো ধারণাই ছিল না। ১৯২০।২১-এ গাঁধীজী এক বৎসরের ভিতর (ভাগ্যিস দশমাস দশদিন বলেন 'নি) স্বরাজ

আনবেন বলে দিলাশা দেন। কবিগুরু তখন তাঁকে মুখোমুখি বলেন, এক বৎসরের ভিতর যদি না আসে তবে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনগণ-মনে যে নৈরাশ্যজনিত কর্মবিমুখ জড়ত্ব এনে দেবে সে কথা ভেবেছেন কি? মহাত্মাজী বলেন, আমি মরালি স্থিরনিশ্চয় যে প্রত্যেক ভারতীয় যদি আমার কর্মসূচী গ্রহণ করে তবে এক বৎসরের ভিতর আমরা স্বরাজ লাভ করবই করবো। (এর মাত্র আঠারো বৎসর পর হিটলারও রণশঙ্খে ফুৎকার দেবার পূর্বে বলেন, প্রত্যেক জর্মন সৈন্য যদি সূচ্যগ্রেন সুতীক্ষ্নেন ভিত্তেতে যা চ মেদিনী পরিত্যাগ করে পশ্চাৎপদ না হয় অপিচ শত্রুকে নিধন করতে করতে প্রকৃত বীরের ন্যায় যে ভূমিতে দণ্ডায়মান সেখানেই মৃত্যু বরণ করে তবে আমার জয়লাভ অনিবার্য। অতিশয় হক কথা—সাধু, সাধু। উত্তম, উত্তম। কিন্তু জিজ্ঞাস্য: আমাদের যখন অজানা নয় যে প্রত্যেক মানুষেরই কর্মক্ষমতা, আত্মোৎসর্গপ্রবৃত্তি, শৌর্যবীর্য পরিচয় দানের একটা সীমা আছে তখন প্রত্যেকটি লোক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে করে ধূলিশয্যা গ্রহণ করবে এহেন আশা করাটা পূর্বাভিজ্ঞতাসম্মত নয়— এটাকে বরঞ্চ ধর্মরাজের দ্যূতক্রীড়ার সময় "এবারে আমি জিতব, এবারে আমি জিতবই জিতব" দুরাশা দুরাশায় গড়া পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করে যেতে পারে। তদুত্তরে হিটলার অবশ্যই বলতে পারতেন, নিয়তি (হিটলার ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন না, কট্টর নাস্তিক-ও না, কিন্তু নিয়তির অদৃশ্য লিখনে দৃঢ় বিশ্বাস ধরতেন) কখনো কোনো মানুষের স্কন্ধে সে বোঝা চাপান না যেটা সে বইতে পারবে না।

তা সে যাই হোক যাই থাক, কর্মক্ষেত্রে দেখা গেল গাঁধীজীর প্রতিশ্রুত এক বৎসর অতি সরেস রবারের মত—বড্ডই ইলাস্টিক, বিলম্বিত—উভয়ার্থে—হওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা ধারণ করে। যতই মারিবে টান ততই যাবে বেড়ে।

এস্থলে আমাকে বাধ্য হয়ে কিছুটা জীবনস্মৃতি মন্থন করতে হবে।

পাঠক, অসংখ্য বার আমার অপরাধ মার্জনা করেছো। আরেকবার করলে হয়তো একশতে পৌঁছে তুমি রত্নাকরের মত মোক্ষ লাভ করে যাবে। আর কথায় বলে যাহা বাহান্ন তাহা তিরনব্বুই (হায়, হায় পাঠক, ত্থাখ তো না ত্থাখ, বিধাতা গয়লা আমার হাত দিয়ে কি কৌশলে তামাক খেয়ে নিলেন, অতি সাধারণ একটি প্রবাদ গুবলেট করে দিলেন)। কিন্তু আমার জীবনস্মৃতি লিপিবদ্ধ করার মত দুর্মতি আমার কখনো হবে না সে আমি জানি! ওদিকে আবার আমার চেয়েও পাপিষ্ঠজন ইহ সংসারে আছে। তারা সর্বক্ষণ আমাকে টুইয়ে টুইয়ে অনুযোগ বিনয় করে, আমি যেন আমার আত্মজীবনী লিখি, কারণ আপনার মত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ক'জনের আছে (অর্থাৎ খুন খারাবী করে পৃথিবীতে কোন্ দীনতম দেশের কারাগারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন আমি করিনি ?) পৃথিবীর কোন্ দেশ আমি চষিনি (অর্থাৎ কোন্ দেশের পুলিশ আমাকে "গুণ্ডা আইনে" ফেলে—যে আইনানুয়ায়ী নগরপাল যে কোন গুণ্ডাকে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর শহর ছেড়ে অন্যত্র যাবার মোক্ষম আদেশ দিতে পারেন—সেদেশ থেকে বের করে দেয়নি ?)। মোদ্দা কথা আমি অকপটে সত্যবর্ণন করলে তেনারা বগল বাজিয়ে নৃত্য করতে করা[illegible]লাবেন, "বলেছিলুম, তখনই বলেছিলুম।" হয়তো বা একটি [illegible] সঙ্গে জুড়বেন :

বাইরে তোমার লম্বা কোঁচা
ঘরেতে চড়ে না হাঁড়ি,
খেতে মাখতে তেল জোটে না,
কেরোসিনে বাগাও তেড়ি।
যাও হে, যাও হে, কালাচাঁদ
আর এসো না আমার বাড়ি
এবার এলে আমার বাড়ি
দেব তোমায় খ্যাঙরার বাড়ি॥

পক্ষান্তরে এবারে আমার জীবন সম্বন্ধে নির্বিকার উদাসীন পাঠক বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই, কোন্ দুষ্ট, পরশ্রীকাতর, বিঘ্ন-সন্তোষী জুগুপ্সা দ্বারা তাড়্যমান হয়ে এনারা আমাকে জীবনস্মৃতি লিখতে বলেন।

কিন্তু ভবদীয় সেবককে তার কিছুটা, সামান্যতম অংশটা এস্থলে নিবেদন করতেই হবে। নইলে (১) সে-পটভূমি নির্মিত হবে না যার সাহায্য বিনা পাঠক আমার তাবৎ বক্তব্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

অপরঞ্চ (২) পূর্বলিখিত চল্লিশ বৎসর যে মুষ্টিযোগ প্রসাদাৎ আমি ডুবসাঁতার মেরে মোজায়িক নির্মাণ করেছিলুম এস্থলেও তদ্বৎ। সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করবো।

১৯৪৪-এর কাছাকাছি আমি বে-car (বে-কার) তো বটিই, এবং নির্জলা বেকার। শ্যামপেন বরগণ্ডী মাথায় থাকুন জল এস্তেক জোটেনা। মাথার উপরে ছাতখানাও যদি না থাকে তবে ট্যাপই বা কোথায় কুঁজোই বা কই? কাজেই রাস্তার কল থেকে আঁজলা আঁজলা জল খেতুম। তদাভাবে পার্কের পুকুর কিংবা মাগঙ্গার স্তন্য-রসই ছিল আমার সম্বল।

অবস্থা যখন চরমে তখন শ্রীমান কানাই (ভজু-কানাই) সরকারের সঙ্গে দেখা। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, (আমি যখন শান্তিনিকেতন কলেজে পড়তুম সে তখন ইস্কুলে) যে আমি তখন ইস্কুলের সাহিত্য সভায় বেনামীতে কয়েকটি রচনা পেশ করি। সেগুলি এমনই ওঁচা যে আমি স্বয়ং পড়লে "সাধু-স্-সাধু-সাধু" রব ওঠার পরিবর্তে "হুয়ো হুয়ো হুয়ো" ধ্বনি সভাস্থলের চতুর্দিকে মুখরিত হত। ওদিকে মহারাজ শ্রীমান ভজু-কানাই সাহিত্যসভার

সেক্রেটারি (আমরা আড়ালে বলতুম "স্যাকা রুটি") তারে মারে কেডা।[৩]

সেই কানাইয়ের সঙ্গে দেখা কলকাতায়। ছেলেবেলায় বিস্তর কচিকাঁচারা একটুখানি সিনিয়র ছাত্রদের হীরো ওয়ারশিপ করে। আমার রচনা পড়ে সে যে বিস্তর "সাধু-স-সাধু" কুড়িয়েছিল তার থেকে তার একটা অন্ধ ধারণা হয়ে গিয়েছিল আমি কালে রীতিমত ডাকসাইটে কেউকেডা লেখক হব। তাই দেখা হওয়া মাত্রই আমাকে পকড়কে নিয়ে গেল স্বর্গত সুরেশ মজুমদার মহাশয়ের সমীপে।

আহা! এ-রকম আরেকটি সংবাদপত্র কর্ণধার আমি ত্রিভুবন চষেও পাইনি। কিন্তু আজ না, মোকা পেলে আরেকদিন তাঁর দেহ, মন, ও সর্বোপরি তাঁর হৃদয়ের সবিস্তর বর্ণন দেব। তিনি আড় নয়নে আমার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা মুদ্রা দেখালেন। এরকম বিনা মেহনতে আমি কোনো পরীক্ষা পাশ করিনি।

"সত্যপীর" ছদ্মনামে সপ্তাহে দুবার দুই কলম, আফটার এডিট লিখতুম। সে কাহিনী দীর্ঘ। শুধু দুঃখের সঙ্গে বলি সে-আমলে যারা সবে সাবালক হতে যাচ্ছেন সেই আমি আজ হয়ে গেলুম তাদের পেট্ রাইটার, অর্থাৎ আমি তাদের ফ্যান। হায় আজ তাঁদের দরবারে কল্কে পেতে হলে আমাকে রীতিমত কসরৎ করতে হয়। সব সময় পাইনে। এখন যদি সেই প্রায় ত্রিশ বৎসরের পুরনো 'সত্যপীর'

৩ শ্রীমান কানাই যখন শান্তিনিকেতনে এলেন তখন অন্য এক কানাই সেখানে বর্তমান। গুবলেট এড়াবার জন্য তখন তার দাদা "ভজুর" সঙ্গে তার নাম জুড়ে দিয়ে "ভজু-কানাই" নাম রাখা হল। আরেকটি উদাহরণ চমৎকার; একটি এমনি ছোটখাটো একমুঠো ছেলে এল যে সবাই তার নাম দিল "সিকি"। ওমা, পরের বৎসর সে তার ছোট্ট ভাইকে নিয়ে এল—সে আরো ক্ষুদে, একদম মাটির সঙ্গে কথা কয়। তার নাম রাখা হল "দুআনী"!

নাম দিয়ে কিছু লিখি—অতিশয় সভয়ে বৃদ্ধ বরজলালের মত ক্ষীণ কণ্ঠে অর্থাৎ শ্লথ অক্ষম হস্তে লিখিত যৎকিঞ্চিৎ পাঠাই তবে সেটা ছাপা হয়—ইংরেজিতে যাকে বলে অন্ এ রেনি ডে। রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে একটি কবিতা নিম্নের কটি ছত্র দিয়ে আরম্ভ করেন :—

"ডাক্তারেতে বলে যখন মরেছে এই লোক
তাহার তরে বৃথায় করা শোক।
কিন্তু যখন বলে জীবন্মৃত
তখন শোনায় তিতো
আমার হ'ল তাই—"

পরে কবি বুঝলেন, গৌড়ীয় পাঠক মাত্রই তাঁর এ-বিনয় অট্টহাস্যসহ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। তাই পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় এ-ছত্র কটি তিনি নাকচ করে দিলেন।

আর আমার বেলা?

জীবন্মৃত না। "খাবি-খেকো, গঙ্গাযাত্রার আস্ত জীবন্মৃত।"

সে-কথা থাক্।

ঐ সময় অন্যান্য যাবতীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে আমার একটি বক্তব্যে আমি বার বার ফিরে আসতুম। বলতুম, "স্বরাজ আমাদের দিগ্বলয় চক্রের মতই নিম্নে বা ঊর্ধ্বে দৃষ্টির বাইরে থাকুন না কেন এই বেলাই তার জন্য কিছু কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন। ২। স্বরাজলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত পৃথিবীর সর্বদেশেই এম্বেসি, লিগেশন, কনস্যুলেট, ট্রেড কমিশন নিযুক্ত করবে; ৩। সে-সব দফতরের জন্য বিদেশী ভাষা জাননেওলা লোকের প্রয়োজন হবে; ৪। বাঙালী ভাষা শেখার জন্য বিশেষ বুদ্ধি ধরে। অতএব এই বেলাই তাড়াতাড়ি কলকাতাতেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিখবার ব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজনীয়

জরুরী কাজ। কারণ প্রথম ধাক্কাতেই যাঁরা ফরেন সার্ভিসে ঢুকতে পারবেন তাঁরা দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াবেন এবং ফলে তাঁদের ছেলে এমন কি মেয়েরাও একাধিক ভাষা ইচ্ছা অনিচ্ছায় শিখে নেবে। তখন আমাদের কলকাতার মেধাবী ছেলেরাও এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। ফলে ভালো ভালো চাকরি, যারা প্রথম ধাক্কায় ঢুকেছিল বংশানুক্রমে তাদের গোষ্ঠীপরিবারের একচেটে সম্পত্তি হয়ে যাবে। এ-কিছু আজগুবি নয়া হাল নয়। বিসমার্ক এমন কি তাঁর পূর্বেও যেসব খানদানী পরিবার ফরেন অফিসে প্রথম ধাক্কাতেই প্রবেশ করেছিল তাদের বংশধরগণকে গণতান্ত্রিক ভাইমার রিপাবলিক কমিয়ে দিয়ে মেধাবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে ঢোকাতে পারেন নি। এমন কি হিটলারও এদের বিশেষ কাবু করতে পারেন নি। এঁরা মস্করা করে বলতেন, নাৎসিদের দিয়ে এসব কাজকর্ম করানো যায় না; আমাদের মত স্পেৎসি (স্পেৎসিয়ালিস্ট্=স্পেশালিস্ট=ওয়াকিফহাল) না থাকলে তাবৎ ফরেন আপিস এবং সঙ্গে সঙ্গে ওদের নিযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের দূতাবাসগুলো তছনছ বানচাল হয়ে যাবে।”

আমার এসব সাবধানবাণীতে খুব কম লোকই তখন কান দিয়েছিলেন। একাধিক জন আমাকে বলেন, “আরে মশাই, আগে তো স্বরাজ ফলটি পেকে মাটিতে পড়ুক।”

আমার পেটেন্ট উত্তর ছিল “রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?”

আজ আমাদের কানে জল গেছে। আজ ম্যাক্স্‌ম্যুলার ভবনে, রুশ পাঠচক্রে ভিড়—এমন কি কোনো কোনো বাড়ির বৌ ঝি-রা এঁদের মধ্যে আছেন। শ্রীযুত মনোজ বসুর ধর্মপত্নী ও পুত্রবধূ কয়েক বৎসর আগে একই রুশ ক্লাশে পড়াশুনো করতেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে ঘোড়া পালিয়েছে। আস্তাবলে এখন চাবি মারাটা বন্ধ্যাগমনের ন্যায় নিষ্ফল। সংস্কৃত সুভাষিত কয়, প্রদীপ

নির্বাপিত হয়ে যাওয়ার পর তেল দিয়ে কি লাভ, যৌবনান্তে বিবাহ করে কি ফল পাবে।

সেই ১৯৪৪ থেকে কানমলা খেয়ে খেয়ে—অর্থাৎ এ-সব বাবদে লেখা সাধারণ জনের কৌতূহল উদ্রেক না করাতে—আমি অন্য সব বিষয় নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলুম। যাঁরা "দেশ" পত্রিকায় (এ পত্রিকাতে ১৯৪৮।৪৯-এ আমার সর্বপ্রথম পুস্তক "দেশে-বিদেশে" ধারাবাহিক রূপে বেরয় এবং সে-সম্বন্ধে "দেশ" পত্রিকার সুযোগ্য একনিষ্ঠ সম্পাদক শ্রীমান সাগরময় ঘোষ তাঁর অনবদ্য "সম্পাদকের বৈঠক" পুস্তকে কীর্তন করেছেন।[৪] সে যুগ থেকে—বস্তুত ১৯৪৪ থেকে—আমি কয়েক মাস, কখনো বা দু'এক বৎসর বাদ দিয়ে—ঢাকের বাদ্যি থেমে গেলেই ভালো শোনায়—'দেশ' পত্রিকায় প্রধানত "পঞ্চতন্ত্র"ই লিখে আসছি) আমার এই "পঞ্চতন্ত্র" মাঝেমধ্যে পড়েছেন তাঁরাই জানেন আমি এখন প্রধানত "অজগর আসছে তেড়ে।/আমটি আমি খাব পেড়ে॥" কিংবা ঔড্র পদ্ধতিতে "ক' রে কমললোচন শ্রীহরি।/করেন শঙ্খচক্রধারী" ধরনের নির্বিষ অজাতশত্রু রচনাতে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখি।

কিন্তু ইতিমধ্যে মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে। আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে। স্বরাজ লাভের সঙ্গে (১) ভারতীয় রাষ্ট্রদূতরা মদনভস্মের মত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁরা যে-সব

৪ "দেশে বিদেশে"ই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, এটা প্রায় সর্বজনসম্মত অভিমত। আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করেন, আমার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা কি? আমি উত্তরে বলি, বার বার চেষ্টা দিয়েছি, কিন্তু এখনো "সর্বশ্রেষ্ঠ" রচনা লিখতে সক্ষম হইনি। জনৈক ফরাসী লেখককে একই প্রশ্ন শুধোলে পর তিনি দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে (শ্রাগ্ করে) বলেন, "না, না! আপনি কি জানেন না, আমার প্রত্যেকটি রচনাই সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।" স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বিনয় প্রকাশ বাবদে এই মহাত্মাকে ভৃগুপদলাঞ্ছিত কৃষ্ণবাসুদেবের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

দেশে অবস্থান করছেন তাদের সমস্যা, ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে লাগলেন; কখনো স্বেচ্ছায় কখনো পার্লিমেন্টের তাড়া খেয়ে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মারফৎ। তাঁদের দারাপুত্রপরিবারও এ-সব দেশকে কেন্দ্র করে সাহিত্য নিম-সাহিত্য প্রকাশ করলেন। (২) দলে দলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, জর্নলিস্ট, সাহিত্যিক, ছাত্রছাত্রী, টুরিস্ট, সরকারী কর্মচারী গয়রহ নিত্যি নিত্যি দুনিয়াটা চষে ফেলতে লাগলেন। তাঁদের অনেকেই গানা থেকে অল্-আলেমীন সীদী অল-বররাণী, পানামা থেকে তাশকেন্দ ভ্লাদিভস্তক সম্বন্ধে এন্তের এন্তের প্রবন্ধ কেতাব লিখলেন। অনেক সময় অগ্রপশ্চাৎ সম্যক বিবেচনা না করে। পরে সে-বইয়ের কিয়দাংশ সানুষ্ঠানে ভস্মীভূত করা হল। চার্বাক বলেছেন ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ? কিন্তু এস্থলে পুনরাগমন আদৌ অসম্ভব নয়। বিশাখাপট্টনমে যখন জাপানী বোমা পড়ে তখন সরকারের হুকুমে ট্রেজারি অফিসার জমায়েৎ কারেনসি নোট পুড়িয়ে দিল্লীতে খবর দিলেন তিনি সাকুল্যে তাবৎ নোট ভস্মীভূত করেছেন। উত্তম। দু'বৎসর যেতে না যেতে তার কিয়দাংশ গুড়ি গুড়ি কি করে যে হাটবাজারে মদ্যালয়ে ক্লাবে আত্মপ্রকাশ করলো কেউ জানে না।...এবং সবচেয়ে মোক্ষম তত্ত্ব (৩) ইংরেজ আমলে আমাদের বৈদেশিক নীতি কি হবে সে নিয়ে আমাদের কোনো শিরঃপীড়া ছিল না। এখন ঐ বিষয় কানু ভিন্ন গীত নেই। অধুনা ডিহি পৌদালিয়া ২/১ক/ক নং থার্ড বাইলেন শালপাতা ঠোঙ্গা-বিতরণীর সহ-শাখা-কমিটির রক থেকে আরম্ভ করে টাটা-বিড়লা-লীভার ব্রাদারজের গোপনতম আলোচনা কক্ষে ঐ এক কানুর গীত। যেমন মনে করুন এই যে ইংরেজ কমন মার্কেটে ঢোকার জন্য বেহায়া বেশরম হ্যাংলামোর চূড়ান্তে পৌঁচেছে, টা-পেনি হে-পেনি লুকসুমবের্গ বেলজিয়ামের মত দেশের পা চাটছে সর্ব ইজ্জৎ সর্ব ইমান সর্ব আব্রু বাকিংহাম প্রাসাদস্থ স্কেটিং করার পুকুরে গলায় পাথর বেঁধে বিসৃ হাথ

পানীমেঁ ডুবিয়ে দিয়ে—স্ব গলের প্রেতাত্মারূপী বর্তমান সরকার তাদের পশ্চাদ্দেশে দুচার খানা সবুট সরেস কিক্ কসাবে না তো— গোষ্ঠ-সমদ যে রকম পেনালটি পেলে, কালী (মৌলা) আলী ফোকটে বেমক্কা না-হক্কো পেনালটি পেলে যে-রকম কালী আলীর (কালীঘাট মৌলা আলী) কাছে পুজো শিরনী মানৎ করে।

এই সব এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে—ট্রেনজিসটারের সুলভতা ভুলবেন না—দেশের লোক, রকেট রকফেলার এস্তেক পাড়ার পদিপিসি পর্যন্ত নানা বিষয়ে এমনই ওয়াকিফ-হাল হয়ে গিয়েছেন যে ১৯৪৪ সনে যা ছিল কঠিন বিষয়বস্তু, স্পেশেলাইজড তত্ত্বতথ্য, আজ তার অনেক কিছু হয়ে গিয়েছে ক ম ন ন লে জ। যেমন ধরুন ১৯৪৪—চুয়াল্লিশ কেন প্রায় ১৯৫২।১৯৫৩ অর্থাৎ যত দিন না নাপাক সরকার উভয় বঙ্গের যাতায়াতের জন্য "ভিজা"-প্রথা প্রচলন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসন্তান চোখের জলে নাকের জলে শিখলো, ভিজা কারে কয় এবং প্রথম আপন সরকার—ভারতীয় হলে ভারত সরকার পাকিস্তানী হলে পাক সরকারের কাছ থেকে যে সর্বপ্রথম দশটাকা না পনেরো টাকা খর্চা করে একখানি পাসপর্ট জোগাড় করতে হয়। তার জন্য কিউয়ে দাঁড়াও, ফর্ম বের করো এবং বিরাটতম চার পৃষ্ঠাব্যাপী তিন দফে (ইন্ ট্রিপলিকেট!) সেগুলো ফিল্ আপ করো। পাক্কা দেড়ঘন্টা থেকে দু'ঘন্টা লাগে, মশয়। এই ফর্ম যদি আপনি স্বয়ং ফিল আপ করেন তবে আন্তর্জাতিক প্রাথমিক আইনকানুন সম্বন্ধে আপনার বেশ খানিকটে জ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু দোহাই ধর্মের, আপনার নিরাপত্তার জন্যে তথা পাসপর্ট আপনি আখেরে যেন পান তার জন্য আপনি সে-ফর্ম স্বয়ং ফিল আপ না করে করাবেন ঐ আপিসের আশেপাশে যে সব প্রফেশনাল ফর্ম ফিল আপ করনেওলারা আছে। অপরাধ নেবেন না; বেহারী ভাইয়ারা যে রকম ইটালিয়ান ব্যুরোতে, অর্থাৎ ইটের উপর বসে প্রফেশনালকে দিয়ে মনিঅর্ডার ফর্ম ফিল আপ করায়। হুবহু সেই রকম। অ। আপনি বুঝি ইংরিজিতে

এম. এ. ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট, পি এচ ডি, ডি লিট। তাই আপনার দেমাক। কোনখানে ব্লক ক্যাপিট্যাল হরফে লিখবেন আর কোন্‌খানে সাদামাটা হরফে, যে সব জায়গা দফতর ফিল আপ করবে, করে ফেললেন আপনি, যে জায়গাটা সুদ্দুমাত্র খালাসীদের (যারা একদা পাকিস্তানী ছিল কিন্তু অধুনা ইণ্ডিয়ান, আবার কখন রঙ বদলাবে তার স্থিরতা নেই এবং ইতিমধ্যে বেআইনী কায়দায়—যার জন্য তিন মাসের তরে শ্রীঘরশ্বশুরালয—সে জোগাড় করেছে তিন তিন খানা পাসপর্ট: প্রথমটাতে সে ভারতীয় নাগরিক, দ্বিতীয়টাতে সে পাক্কা ব্রিটিশ, তৃতীয়টাতে সে পাকিস্তানী। পুলিশ সন্দেহ করে শুধোলে সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলবে সে ভারতীয় এবং ভারতীয় পাসপর্ট তার ছিল কিন্তু সেটা খোয়া গেছে: তার মৎলব আরেকখানা পাবার। পেলে এটা বা আগেরটা বিক্রী করে দেবে। এই কলকাতাতেই যারা নোট জাল করে তারা স্পেয়ার টাইমে করে পাসপর্ট জাল। এরা সে পাসপর্ট কিনে নিয়ে অত্যুৎকৃষ্ট কেমিকাল দিয়ে খালাসীর ফোটোগ্রাফ সেই পাসপর্ট থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। যে ব্যক্তি গুণ্ডা বা ফেরার বলে পাসপর্ট জোগাড় করতে পারেনি তার ফোটো ছাপা হবে সেখানে—জায়গাটায় নতুন ফোটো কেমিকাল লাগিয়ে।...এতে বেশ কাঁচা দুপয়সা আমদানী হয়। খিদিরপুর অঞ্চলে নাকি একটা "(প্রাইভেট) লিমিটেড" কোম্পানী হয়েছে—ভাবছি কিছু শেয়ার কিনবো) সেটা ফিল আপ করে বসলেন আপনি। সে ভুলটা ধরিয়ে দেবে আপনারই এক ভাগ্নে—"উনিশবার ম্যাট্রিকে সে/ঘায়েল করে থামলো শেষে।" তখন ছিঁড়ে ফেলুন সেই তিন প্রস্ত ফর্ম, ফের দাঁড়ান কিউয়ে—ফের, ফিনসে। আর সবচেয়ে মারাত্মক অদৃশ্য ফাঁদ যেটি সদাশয় সরকার, অবশ্য অতিশয় অনিচ্ছায় কিন্তু সরকারী পয়সার যাতে অপচয় না হয় সেই শুভ ব্রত গ্রহণ করে আপনার জন্য পেতেছেন। "অদৃশ্য" কেন বললুম এখ্‌খুনি বুঝতে পারবেন। আমরা তথা পাকিস্তানীরা বিলেত ফ্রান্সের তুলনায় তো

সবে স্বরাজ পেয়েছি। আমাদের সরকার কোন্ কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হয় সে-সম্বন্ধে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা নেই। ইংরেজ একদা যে সব প্রশ্ন শুধোত তার বেশ-কিছু বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে— মহারানীর রাজত্ব যেন হিটলারের "সহস্রবর্ষের রাইখ"-এর মত অজরামর হয়ে থাকে। মহারানীর রাজত্বে যেন কস্মিনকালে— মহাপ্রলয়ে তাবৎ মণ্ডলসমূহ তথা অগনিত নক্ষত্ররাজি লোপ পাওয়ার পরও সূর্য কখনো অস্তমিত না হয়।* …তা সে যাকগে। এখানে পাসপর্ট ফরম তৈরী করার সময় ভারতীয় হুজুরদেরই স্থির করতে হয় আমরা কোন কোন প্রশ্ন শুধবো। পয়লা ঝটকাতেই সব প্রশ্ন হুজুরদের মনে আসে না। পরে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন, "ঐয্যা! অমুক প্রশ্নটা তো শুধনো হয় নি।" কিন্তু হায় তখন তো আর তাবৎ ছাপা ফর্ম বাতিল করে দেওয়া যায় না। তাই বের করলেন এক নয়া কৌশল। নূতন প্রশ্ন রবরস্ট্যাম্পে বানিয়ে নিয়ে চাপরাশীকে দিলেন হুকুম, "প্রত্যেক ফর্মে মারো এই ইস্টাম্পো।" চাপরাশী ভটাভট সেই কর্ম করতে লাগলো ফর্মের এক সংকীর্ণ কোণে। এখন হয়েছে কি, আপনি পেলেন ৩৭৩৮৫ নম্বরের ফর্ম। ততক্ষণে রবর স্ট্যাম্পের হরফগুলো সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে সেটি হয়ে গিয়েছে নখের মত পালিশ। তখন ফর্মে একটা ঝাপসা ঝাপসা ফিকে বেগনী রঙের কুয়াশা কুয়াশা মাত্র দেখা যায়—অবশ্য আপনি যদি সেটি সাতিশয় মনযোগসহ নিরীক্ষণ করেন। সেটা দেখে আপনার মনে কিছুতেই সন্দেহ হবে না যে এটা খয়ে যাওয়া রবরস্ট্যাম্পের অবদান—

* এই বেত্তমীজ বড়ফাট্টাই শুনে এক ফরাসী বলেছিল, "কিছু ভয় কোরো না, মিঞা। করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদের কসাইসুলোভ "করুণ" হস্তে ভারতীয় তথা অন্যান্য "কালা আদমী"দের তুলে দিয়ে ডাইনির হাতে পুত্র তুলে দেওয়ার মত জবরদস্ত গুণা করার পর হুজুরের হুশ হল। তিনি তোমাদের হাতে অন্ধকারে কালা-পীলা আদমীদের কোন [illegible] এখন ছাড়েন। তাই তিনি সূর্যাস্ত একদম বন্ধ করে দিয়েছেন।

আপনি যতই সন্দেহ-পিচেশ হোন না কেন? অ! ভুলে গিয়েছিলুম আপনি ইংরিজিতে ডি লিট কিংবা যাই হোন না কেন, যেখানে কোনো অক্ষরের চিহ্নমাত্র নেই তার পাঠোদ্ধার করবেন কি করে? তাই আপনি নিশ্চিন্ত মনে ফর্ম পাঠিয়ে দিলেন হেড আপিসে। এক মাস পরে সেটি এল ফেরৎ। এবং সঙ্গে লেখা আছে "আপনি অমুক নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেন নি কেন?" আপনি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাবেন সে প্রশ্নটা কোথায়? শেষটায় হার মেনে যাবেন সেই প্রফেশনালের ইটের পাঁজাতে। সে লেটেস্ট খবর রাখে। সে সেই বেগনী কুয়াশার মধ্যিখানে সঠিক জায়গায় উত্তরটি লিখে দেবে। শুধু কি তাই! আপনি যেসব উত্তর দিয়েছেন আপনার জ্ঞান আপনার বিবেক অনুযায়ী সেগুলো চেক্ অপ্ করতে করতে সে বিষম খাবে, আঁতকে উঠবে আর গোঙরাতে গোঙরাতে বলবে, "এসব কি উত্তর দিয়েছেন! বরঞ্চ আপনার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হলেও হতে পারে কিন্তু এসব উত্তর দিলে পাসপর্ট প্রাপ্তি হবে না।" সে জানে, হুজুররা কি উত্তর শুনতে চান এবং শুধু তাই নয়, আজ কি উত্তর শুনতে চান, মত পালটে পরশু দিন ফের কোন্ উত্তর শুনতে চান। সে নূতন ফর্ম তার বাক্স থেকে বের করবে—আপনাকে ফের কিউয়েতে ধন্না দেবার 'গব্বযন্ত্রণা' থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে—এবং এমন সব আকাশকুসুম, সোনার পাথরবাটি উত্তর লিখবে যে এবারে আপনার বিষম খাবার, আঁতকে ওঠবার পালা।

কিন্তু আপনি পাসপর্ট পেয়ে যাবেন। যদিস্যাৎ না পান তবে জানবেন অন্য কোনো ব্যাপারে আপনার জীবন "নিষ্কলঙ্ক" নয়। পুলিশ আপনার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে, কিংবা আপন ফাইল (দপ্তর) থেকে আবিষ্কার করেছে, আপনি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশ লেখক গর্কির "মাদার" পড়েছিলেন, কিংবা—ওয়েল নেভার মাইণ্ড—"কিছু একটা" আছে।

এমন সময় আপনার এক উকীল বন্ধু আপনাকে বললে, "সংবিধানে প্রত্যেক ভারতীয়কে জন্মগত অধিকার দিয়েছে, যত্রতত্র গমনাগমনের স্বাধীনতা। ঠোকো মোকদ্দমা। পেত্যয় যাবেন না, আপনার চেয়েও শতগুণে তালেবর এক খলিফে ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত লড়ে বিদেশ যাবার পাসপর্ট পেয়েছিলেন। তিনি বগল বাজিয়ে প্লেনের টিকিট কাটতে ধাওয়া করেছিলেন কি না জানিনে, আমরা হুশিয়ার করছি,

ঘুঘু দেখেই নাচতে শুরু
ফাঁদ তো বাবা দেখোনি।

কিংবা "না আঁচিয়ে" ভরসা কই! কিংবা সুকুমার রায়ী ভাষায়

কেই বা শোনে কাহার কথা
কই যে দফে দফে।
গাছের পরে কাঁঠাল দেখে
তেল দিয়ো না গোঁফে॥

পাসপর্ট পাওয়ার পর একটি

বৈষ্ণব হইতে মনে গেল বড় সাধ।
তৃণাদপি শোলোকেতে ঘটালো পরমাদ॥

সে তৃণটি এস্থলে "পী ফর্‌ম্"। বিদেশের হোটেলে তো আপনাকে মুফতে থাকতে দেবে না, রেস্তোরাঁতে মাগনা খেতে দেবে না। অতএব আপনার বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন। সে মুদ্রা ক্রয় করার তরে আপনি দিশী মুদ্রা দিতে প্রস্তুত, কিন্তু "পী ফর্মের" পীঠস্থান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সবিনয় বলবে, "এদানির বিদেশী অর্থের বড়ই অনটন। সরি!" কথাটা খুবই সত্য, সে-কথা আমি কোনো ব্রাহ্মণ বন্ধুর কাছ থেকে পৈতে ধার করে সেইটে ছুঁয়ে কসম খেতে রাজী আছি।

সবই জানি। শুধু জানিনে, পাসপর্ট না পেলে যে-রকম মোকদ্দমা করা যায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিদেশী কড়ি না দিলে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা যায় কি না।

এ পর্যায়ে কিন্তু একটি শেষ কথা না বললে অন্যায় হবে। কর্তারা যে যাকে তাকে চট করে বিদেশ যেতে দেন, তার প্রচুর কারণ আছে। কিন্তু সেকথা আরেক দিন হবে।

মোদ্দা কথায় ফিরে যাই।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে এইসব বহুবিধ, যাবতীয়, হরেকরকম্বা সমস্যা সম্বন্ধে সবাই ছিল উদাসীন। মার খেয়ে খেয়ে, এবং তার চেয়েও নির্মমতর অভিজ্ঞতা—পয়সাওলারা কি করে সর্ববাধা অতিক্রম করে সর্বত্র যাতায়াত করেন, বিজনেসমেন দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিদেশ যাবার তরে সর্ব ছাড়পত্র সংগ্রহ করে ড্যাংড্যাং করে রওয়ানা দিলেন, আপনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, সে তো বুঝি, কিন্তু সঙ্গে তাঁর বিরাটকলেবরা ভামিনী গোটাছত্তিন বালক পুত্র এবং কন্যা,—এনারা যাচ্ছেন দেশের কোন্ "সম্পদ বৃদ্ধি" করতে, এবং এনাদেরই একজন

উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল করে চললো হেসে
বিলেত কিংবা ওয়াশিংটন
মুদ্রা মেলা, হাজার টন।

এ তো বিদেশের কথা। কটা লোকই বা বিদেশ যাবার মত রেস্ত ধরে। দেশের ভিতরকার সমস্যাই বা কিছু ছেড়ে কথা কয় নাকি? একদা, ভূমিকম্প হলে, যথেষ্ট বৃষ্টিপাত না হলে, টাইগার হিল থেকে কুয়াশার দরুন কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন না পেলে, বাঁজা পাঁঠি বাচ্চা না বিয়োলে অন্যথা বউ সাত নম্বরের বাচ্চা বিয়োলে, পর্যাপ্ত পরিমাণে স্কচ চুকুশ চুকুশ করে না চাখতে পাবলে, গণ্ডায় গণ্ডায় রামমোহন রবিঠাকুর না জন্মালে আমরা "বণিকের মানদণ্ড"-র

উত্তরাধিকারিণী মহারানীর (পাড়ার ঘোষাল বলতো, ব্যাটাদের ঘিনপিতও নেই—বেনের এঁটো গব গব করে খেল রাজার বেটা-বেটি) বাজার সরকার বড়লাটের খুলিতে ডবল বম্ ফাটাবার চেষ্টা করতুম—অবশ্য সঙ্গোপনে মনে মনে।

সুস্থাবস্থায় কিন্তু সেই মনই অতিশয় বেয়াদব প্রশ্ন শুধোতো এসব বর্গিদের "খাজনা দেব কিসে?"

গুরু বড় দুঃখে বলেছিলেন,

"শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো-হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে—বুকের রক্ত দিয়ে।"

একই নিঃশ্বাসে গুরুর সেই ভবিষ্যৎবাণীর সঙ্গে আমার পরবর্তী যুগের অক্ষম সাবধানবাণীর কথা তুলি কোন পাপমুখে? কিন্তু পাঠক ক্ষণতরে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, এটা আমার দম্ভ নয়। ঝাড়া তিনটি মাস মেসের ভাত না খেলে (কিংবা উপস্থিত আমি যে নার্সিং হোমের ঘুঁটে খাচ্ছি সে বস্তুর অভিজ্ঞতা না থাকলে) মায়ের রান্নার প্রকৃত মূল্য কে কখন বুঝতে পেরেছে? যুধিষ্ঠিরকে যে নরক দর্শন করানো হয়েছিল সেটা বিধাতার কোনো উটকো খামখেয়ালী নয়। নইলে স্বর্গপুরীর অপ্সরাদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ বিশ্রম্ভালাপ করার পূর্ণানন্দটা তিনি তারিয়ে তারিয়ে চাখতেন কি প্রকারে? গব গব করে গিলতেন, আমরা যে-রকম মেসের বান্না হড় হড় করে গিলে রেকর্ড টাইমে পাপ বিদেয় করি। …এই বারে শ্যানা পাঠক নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন, আমার প্রবন্ধ সাতিশয় মনযোগ সহকারে পঠন কেন অবশ্য কর্তব্য, একান্ত অবর্জনীয়। তার চেয়েও ইম্পর্টেনট প্রবন্ধ: তার চেয়ে আরো ইমপরটেনট কর্তব্য, আমার বই কি নু ন—চাই পড়ুন, চাই না বা পড়ুন

ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি পুনঃ পুনঃ বলেছিলুম, "আরো কঠোরতর, আরো নির্মমতর খাজনা দিতে হবে স্বরাজ লাভের পর। এই বেলাই

যদি সে-খাজনার সন্ধান না নাও তবে তোমার কপালে বিস্তর গর্দিশ আছে। এই দেখুন না আজ পূব বাঙলার হাল! কাল যে পশ্চিম বাঙলায় হবে না তার আশ্বাস দেবেন কোন্ পলিটিকাল গোঁসাই? —আমি অবশ্য এসব দুর্যোগের ভবিষ্যৎবাণী আপ্তবাক্য রূপে প্রকাশ করিনি। কিন্তু যা-কিছু নিবেদন করেছিলুম সেটা কেউ কান পেতে শোনেনি। (বলতে ইচ্ছে করছে এখন তবে খাও কানমলা, "কান টানলে মাথা আসে" সেটা যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যি "কান না পাতলে কানমলা খেতে হয়")।

ওঁরা বলতেন বা ভাবতেন, আমার বক্তব্য স্পেশালাইজ্‌ড্ নলেজ; এসব এখন তকলীফ বরদাস্ত করে আমরা পড়বোই বা কেন, বুঝতে যাবোই বা কেন। আগে স্বরাজ আসুক তারপর অন্য কথা। আমি সবিনয় বলেছিলুম, "রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?"

মার খেয়ে অপমান সয়ে সয়ে আমরা এখন অনেক কিছু শিখে ফেলেছি—এই যেমন খানিকক্ষণ আগে পাসপর্ট কি প্রকারে পেতে হয়, সেটা পাওয়ার পরও আপনার কপালে আর কোন্ কোন্ গর্দিশ আছে সে সম্বন্ধে অতিশয় যৎকিঞ্চিৎ সাতিশয় সংক্ষেপে নিবেদন করেছি।

তারই ফলে একদা যে সব তথ্য নিয়ে শুধু স্পেশালিশ্‌ট্‌রা আলোচনা করতেন, যেগুলো নিছক "স্পেশালাইজ্‌ড্ নলেজ" ছিল এখন সেগুলো হয়ে গিয়েছে ডালভাত, "কমন নলেজ"। একদা যেমন বিশেষজ্ঞরাই শুধু মাথা ঘামাতেন, পৃথিবী ঘোরে না সূর্য ঘোরে, পরবর্তী যুগে সেই সমস্যার সমাধান কমন নলেজ হয়ে দাঁড়াল।

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বঙ্গসন্তান "আমার য়ুরোপ ভ্রমণ", "লণ্ডনে বঙ্গ মহিলার ঘরকন্না", "নরওয়েতে প্রথম বঙ্গরমণী" উৎসাহ ও কৌতূহল সহকারে পড়তো। এখন এত শত লোক নিত্য নিত্য

বঙ্গো ইন্ কঙ্গোতে উইক এণ্ড্ কাটাতে যায়, জবল্ অল্ অল্‌বীয়াতে হানিমুনের প্রথমার্ধ চুষে আসে যে "ফ্রান্স ভ্রমণ" কিংবা "মন্তে কার্লো দর্শন" শিরোনামা এখন সে অবজ্ঞার চোখে দেখে, লেখক পরিচিত-জন হলে গেরেমভারি মুরুব্বীর মত তাকে পেট্রোনাইজ করে পিঠ চাপড়ে বলে, "লেগে থাকো ছোকরা; এখনো হাদ্রামুৎ অঞ্চলে অমুসলমানকে ঢুকতে দেয় না বটে কিন্তু তুমিই হয়তো একদিন সেখানকার সেই বিরাট প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ যেখানে একদা শেবা'র রানী বাস করতেন সেইটে সক্কলের পয়লা দেখে এসে তাবৎ গৌড়-জনকে তাক লাগিয়ে দেবে।"

একদা আমি "দেশে-বিদেশে" নাম দিয়ে কাবুল সম্বন্ধে একখানা পুস্তক রচনা করি। প্রকাশকালে বইখানা কিছু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুনেছি, এখনো নাকি কেউ কেউ বইখানা পড়ে। আমি জানি, কেন? তার একমাত্র কারণ যদিও কাবুল পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে অবস্থিত নয়, এবং উত্তর মেরুতে অভিযান করার মত বিপজ্জনকও নয়, তবু একাধিক কারণে—প্রধানতম কারণ অবশ্য এই যে আফগান সরকার চট করে সব্বাইকে ও-দেশে যাবার অনুমতিলাঞ্ছন ভিজা-পারমিট মঞ্জুর করে না, এবং এই একটি কারণই পূর্বে উদ্ধৃত "তৃণাদপি শোলকের" মত কাবুলগামীর সম্মুখে অলঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধন; কাবুলী প্রবাদও বলে "সিংহের এক বাচ্চাই ব্যস্ (যথেষ্ট)।" বইখানি তাই এখনো লিক্‌লিক্ করে টিকে আছে।

গৌড়জনের কমন নলেজ এ-কালে এতই সুদূরবিস্তৃত—ভয়ে ভয়ে বলি, কুলোকে বলে শুধু বিস্তারই আছেগ—গভীরতা আদৌ নেই এবং সে-বিস্তারও নাকি বড্ড পল্লবগ্রাহী—যে তাদের মন পাওয়া প্রতিদিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শুনতে পাই, বিকৃত

যৌনজীবন, এবনরমাল সেক্স্, সমকাম, সাদিজ্ম্, মাসোখিজ্ম্, পিকচার পোস্টকার্ড, ব্লু ফিলম ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়বস্তু বেহদ্দ রগরগে ভাষায়, সর্ববিধ অসম্ভব অসম্ভব ফোটোগ্রাফসহ পরিবেশন করলেও তাঁরা যে শুধু নাসিকা কুঞ্চিত করেন তাই নয়, বাঁ দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে, ডান ভুরু ইঙ্গিটাক উত্তোলন করে বলেন, "ছোঃ! চাঃ!! পুঃ!!! এগুলো আবার কি? ক-অ-অ-বে কোন আদ্যিকালে এ-সব তো কমন নলেজেরও নিচের স্তরে নেমে গিয়েছে। পুলিশের নাকের সামনে পেভমেন্টে বিক্রী হয়, জলের দরে। শোনোনি বুঝি—'থাকো কোন্ ভবে কোন্ দুনিয়ায়?'—যবে থেকে ডেনমার্কে এসব মালের উপর থেকে ব্যান তুলে দেওয়া হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তার বিক্রি দশ আনা পরিমাণ কমে গিয়েছে! তাবৎ বস্তু, সাকুল্যে বিষয় ব্যান তুলে দেওয়ার ফলে যখন তিন দিনের ভিতর কমন নলেজ হয়ে গেল, তখন আর ওসব মাল কানা কড়ি দিয়েও কিনবে কে? শুনেছ, এখন নাকি দিনেমার প্রকাশক ওসব মাল তালাক দিয়ে ধর্মগ্রন্থ ছাপাবে। সেক্স্ যখন স্পিরিচুয়াল লেভেলে উঠে গিয়েছে তখন স্পিরিচুয়াল বই অর্থাৎ গ্রন্থ ছাপানোই প্রশস্ততর।"

হ্যাঁ তদুপরি আরেকটি খবর আমি কাগজে পড়েছি। তত্ত্বটি আমি বাল্যকালেই শুনেছিলুম। "পরিপূর্ণ স্বাদ পেতে হলে চুম্বনটি চুরি করে নিতে হয়।" "এ কিস্ টু বী দি সুইটেস্ট্ হ্যাজ টু বি স্টোলেন।" সম্মানিত মার্কিন কাগজে পড়লুম, নাম ছিল "লেডি চ্যাটারলিজ লয়ারজ"—"লাভারজ" নয়—অর্থাৎ কি না মার্কিন মুল্লুকে যখন লেডি চ্যাটারলি কেতাবখানা অশ্লীল কিংবা কাব্যরসের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ কি না ঐ নিয়ে মোকদ্দমা উঠলো তখন এক বাঘা উকীল বিচারগৃহ প্রকম্পিত করে ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করে আবেগোচ্ছল কণ্ঠে বললেন, "ধর্মাবতার তথা সম্মানিত জুরি মহোদয়গণ! লেডি চ্যাটারলি পুস্তকে গ্রন্থকার যে

অপূর্ব কলানৈপুণ্য ও সত্য শাশ্বত সাহিত্যরস সৃষ্টি করেছেন তাই নয়, যৌনজীবনকে তিনি স্পিরিচুয়াল লেভেলে (আধ্যাত্মিক স্তরে) তুলে নিয়েছেন, তুলে ধরেছেন।"

এই শেষ অভিমতটি শুনে এক পরিপক্বা সমাজে সম্মানিতা ফরাসী নাগরী মৃদু, দুষ্টু মেয়ের স্মিত হাস্য হেসে বললেন, "সর্বনাশ! আমি তো এ্যাদ্দিন জানতুম যৌনসম্পর্কটা নিষিদ্ধ পাপাচার। এখন থেকে ঐ আনন্দের অর্ধেকটাই মাঠে মারা গেল।"

নিষিদ্ধ হোক্, কিংবা পুলিশসিদ্ধ তথা শাস্ত্রসম্মত হোক আর নাই হোক বিদগ্ধ গৌড়ীয় পাঠক এখন চান কড়া পাকের মাল, তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত—একদা যে রকম "নৃত্যসম্বলিত" গ্রামফোন রেকর্ড সাদামাটা রেকর্ডের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে আমি যে সওগাৎ পরিবেশন করেছিলুম তাঁরা অধুনা সেই বস্তু চান।

কিন্তু আমি পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরাই।

ইতিমধ্যে আবার অন্য দিক থেকে আরেক বিপরীত বায়ু বইতে আরম্ভ করেছে। জীবনসংগ্রাম কঠোরতর হয়েছে, পাপাচারের উত্তাল তরঙ্গ গিরিচূড়া লঙ্ঘন করে ঊর্ধ্বমুখে উৎক্ষিপ্ত, দিনান্তে বলীবর্দের ন্যায় কর্মক্লান্ত জন স্বগৃহে পৌঁছবে না টিয়ার গ্যাসে অন্ধ হবে এবং/কিংবা গুলি খেয়ে পঞ্চভূতে লীন হবে সেই দুশ্চিন্তায় সে ম্রিয়মান মোহ্যমান।

ঠিক এই একই অবস্থাতে ফরাসী সাহিত্যের তদানীন্তন গ্রাঁ মেৎর্ (গ্র্যাণ্ড মাস্টার) কি উপদেশ দিয়েছিলেন সেটি অবহিত চিত্তে শ্রবণ ক'রে কর্ণ সার্থক তথা পুণ্যার্জন করুন।

প্যারিসের এক অসহিষ্ণু "গবি" অর্থাৎ যিনি অবোধ্য মডার্নস্ত

মডার্ন গবিতা লেখেন আনাতোল ফ্রাঁসকে প্রায় শাসিয়ে হুশিয়ার করে তালিম দেন, "কবিতা পড়াটা কিছু ছেলেখেলা নয়, যে ছ্যাবলামো এ্যাদ্দিন ধরে চলে আসছে। "মডার্ন" কবিতা আগা-পাস্তলা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।[৬] এ "কবিতা"-দেউলের প্রতি পাঠককে তীর্থযাত্রীর ন্যায় অবনত মস্তকে[৭] অগ্রসর হতে হয়। ভক্তিশ্রদ্ধা তথা (সূচ্যগ্রেন সুতীক্ষ্ণেণ) একাগ্রতা সহ মডার্ন পোয়েট্রির দ্বারস্থ হতে হয়।" ("মডার্ন পোয়েট্রি শুড্ বি এপ্রোচট উইদ ডি ভো শ ন অ্যাণ্ড ক ন সা ন ট্রে শ ন")

এ-উদ্ধৃতি দেওয়ার পর ফ্রাঁস যেন দিবাদ্বিপ্রহরে সাক্ষাৎ যমদূতের দর্শন পেয়ে সাতঙ্কে ভগবানকে স্মরণ করছেন—যে ফ্রাঁস আযৌবন

---

৬ পঞ্চাশাধিক বৎসর পূর্বে যখন মডার্ন কবিতা (গবিতা) তার বিজয়াভিযানের উত্তুঙ্গ শিখরে তাণ্ডব নৃত্যে নিমগন তখন কতিপয় গুণীজ্ঞানী লণ্ডনে একটি বিতর্কসভা আহ্বান করেন। বিষয়বস্তু "আধুনিক কবিতা বনাম প্রাচীন ("রোমান্টিক", "সাবেকী") কবিতা"। দুই পক্ষ আপন আপন বক্তৃতা শেষ করার পর সভাপতি গ্র্যাণ্ড মাস্টার এড্‌মাণ্ড গস্ (ইনিই বোধ করি তরু দত্তের ইংরিজি কবিতা পুস্তকের অবতরনিকা বা/এবং শ্রীমতীর পরিচিতি পত্রিকা লিখে দেন। ইনি সাহিত্যরস আস্বাদনে এবং তার মূল্যায়নে অদ্বিতীয় ছিলেন) বলেন, "কবিতা মাত্র দু' রকমের হয়; উত্তম কবিতা ও নিকৃষ্ট কবিতা। মডার্ন (অর্বাচীন) কবিতা ও ওল্ড (প্রাচীন) কবিতা এরকম কোনো ভাগাভাগি বা শ্রেণী-বিভাগ করা যায় না।"

৭ এ তত্ত্বও এমন কিছু "আমরি আমরি" মার্কা শিক্ (chic), দেনিয়ে ক্রী (dernier cri), আ লা মদ্ (a la mode) অভিনয় নয়। চার্লস ল্যাম্ (lamb) বহু পূর্বেই বলেছেন, আহার আরম্ভের পূর্বে আমরা যে রকম প্রার্থনা করি (গ্রেস পড়ি) উত্তম কাব্যপাঠের পূর্বেও সে-রকম উপাসনা করা কর্তব্য। এবং ভিন্ন ভিন্ন কাব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা।" ল্যাম্ অবশ্য সুপ্রতিষ্ঠিত যশলব্ধ কাব্যের জন্যই—যে-সব কাব্য সেঞ্চুরি এগজামিনিশেন পাশ করেছেন (শতাব্দী বিজয়ী কাব্য)—এই নবীন ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন।

প্রকাশ্যে একাধিক বার তাঁর নাস্তিকতা প্রচার করেছিলেন ; এর থেকেই সর্ব আস্তিক সর্ব নাস্তিক অনায়াসে বুঝে যাবেন সেই 'গবির আপ্তবাক্য' শুনে তাঁর হৃদয়ে কী মারাত্মক গগনচুম্বী পাতালস্পর্শী ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল। উচ্চকণ্ঠে সৃষ্টিকর্তাকে আবাহন জানিয়ে প্রার্থনা করছেন :

"হেভ্‌ন্ ফর্‌বিড্"! দেবভাষায় বলা হয় "ঈশ্বর রক্ষতু", মুসলমান বলে "লা হাওলা কুয়োতি ইল্লা বিল্লা।" বাঙলায় এস্থলে ঠিক কি বলা হয় জানিনে। ভূত দেখলে লোকে রাম নাম স্মরণ করে অবশ্য। কিন্তু এ-স্থলে প্রার্থনা রয়েছে, নাস্তিক ফ্রাঁস বলছেন, "ঈশ্বরাদেশে এ-হেন অপকর্মে যেন বিরত হয়।"

এর পরই ফ্রাঁস বলছেন, "আমি জানি বেচারী (সাধারণ) ফরাসীকে সমস্তদিন সামান্য রুটি-মাখমের জন্য কী রকম মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়।"

এ-স্থলে এগোবার পূর্বে পাঠককে ফের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, "ত্রেতা" যুগটি আমি লিখছি ("দ্বাপরের" পরে। কেন, সেটা যাঁরা তাপসী অহল্যার কাহিনী পড়েছেন তাঁরাই জানেন) হাসপাতালে। (যদিও খানদানি ভাষায় এটি "নার্সিং হোম" বা "মেডিকাল সেন্টার" নামে সগৌরবে প্রচারিত, তথাপি আমার সামান্য অভিজ্ঞতা প্রতিবাদ জানিয়ে অজ্ঞজনকে হুশিয়ার করে বলে, এটা 'হোম' তো নয়ই, এবং আচার আচরণ, প্রাচীন যুগীয় সাজ-সরঞ্জাম দেখে মনে হয়, 'মেডিকাল সেন্টার'-এর নাম পালটে এটাকে 'মেডীঈভাল—মধ্যযুগীয়—কান্তার' নাম দিলেই এর প্রতি সত্য বিচার করা হয়, কিংবা 'মেডীঈভাল হাণ্টার'ও বলতে পারেন, এবং এখানে কি 'শিকার' হয় তার আলোচনা করে অসুস্থ শরীর নিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে চাইনে)। সবসুদ্ধ মিলিয়ে এখানকার কর্তৃপক্ষই স্মৃতিভ্রষ্ট হন, আমি যে আনাতোল ফ্রাঁসকে উদ্ধৃত করার সময় পর্বত প্রমাণ ভুলভ্রান্তি করবো সেটা অত্যন্ত

স্বাভাবিক এবং "কার্সিং" (প্রুফরীডার মশাই, আমি 'কার্সিং' 'অভিসম্পাত' 'অভিশপ্ত'-ই লিখেছি—সজ্ঞানে; "নার্সিং" লিখিনি) "বম্" বাবদে যাঁদের সামান্যতম অভিজ্ঞতা আছে, অর্থাৎ এ-পুরী থেকে সুস্থ অস্থি নিয়ে নিতান্তই ভগবদ্‌কৃপায় বেরুতে পেরেছেন তাঁরা যে আমাকে ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখবেন সেটা ততোধিক স্বাভাবিক।

ফ্রাঁস বলছেন, "বেচারী ফরাসী যখন ক্লান্ত দেহে শ্লথ পদে বাড়ি পৌঁছে একখানা পুস্তক হাতে তুলে নেয় (অর্থাৎ, অত্যধিক মদ্যপান করে বউকে না ঠেঙিয়ে, কিংবা ঝটপট জুয়ো খেলাতে বসে বউ-বাচ্চার জন্য দু'মুঠো অন্ন কেনার রেস্ত উড়িয়ে না দিয়ে—লেখক) তখন, ঈশ্বর রক্ষতু, আমি তার কাছ থেকে 'সশ্রদ্ধ একাগ্রতা' (ডিভোশন অ্যাণ্ড কনসানট্রেশন) মোটেই কামনা করিনে—" বলছেন ফ্রাঁস। তারপর তিনি যেন নিবেদন করছেন: "আমি যা দিতে চাই, এবং সে-ই আমার উজোড় করে দেওয়া, (অল্ আই উয়োণ্ট টু গিভ) তার যেন একটুখানি শ্রান্তি বিনোদন হয়, তার যেন একটুখানি ফুর্তি জাগে (রিলেকসেশন, এন্টারটেনমেন্ট, এম্যুজমেণ্ট হয়)। এবং যেদিন ঐ সবের ফাঁকে ফাঁকে ঐ বেচারী ফরাসীকে কোনো প্রকারের কোনো ইনফরমেশন দিতে পারি, সেদিন আমার আর আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না (মাই জএ নোজ নো বাউন্ড্জ)।"

দম্ভী মসিয়ো মরিসকে,—আমার পাঠকদের মধ্যে দম্ভী কেউ নেই, কিন্তু যদিস্যাৎ কোনো উটকো দম্ভী মাল ছিটকে এসে গোলে হরিবোল দিয়ে থাকেন তবে তাঁকে বলছি, অবহিতচিত্তে প্রণিধান করো, যে-ফ্রাঁসকে ফরাসীদেশের লোক গ্রাঁ মেৎর্, গ্র্যাণ্ড মাস্টার, গুরুদেব বলে এক বাক্যে স্বীকার করে সাহিত্যের ময়ূর সিংহাসনে বসিয়েছিল তিনি কতখানি বিনয় সহকারে বলছেন, তাঁর "নগণ্য" অর্ঘ্য কি? এবং সেটা এমনি যৎসামান্য অকিঞ্চিৎকর যে তার জন্য

কোনো পাঠকের কাছ থেকে কোনো প্রকারের ডিভোশন বা কনসান্‌ট্রেশন তিনি চান না।

এবং সর্বশেষে মসিয়ো মরিসকে একটুখানি ধূলি পরিমাণ উপদেশ দিচ্ছেন : "তদুপরি সর্বোপরি, হে মসিয়ো মরিস, তুমি যদি শতাব্দীর পর শতাব্দী ভ্রমণ করতে করতে পেরিয়ে যেতে চাও তবে হাল্কা হয়ে ভ্রমণ করো।" (ইফ্ ইউ উয়োণ্ট টু ট্র্যাভেল থ্রু সেঞ্চুরিজ, ট্র্যাভেল লা ই ট!)

কী মহান আপ্তবাক্য! মরিস, তুমি যদি চাও যে তোমার রচনা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোকে পড়ুক তবু সে-রচনার ঘাড়ে বিস্তরে বিস্তর ভারি মাল চাপিয়ো না। অর্থাৎ যে-মাল কনসান-ট্রেশন চায়, ডিভোশন চায়।

ব্যাসদেব এ-তত্ত্বটির প্রথম আবিষ্কারক। গণপতিকে যখন তিনি মহাভারতের ডিকটেশন নেবার জন্য মনোনীত করেন তখন তাঁর মাত্র একটি শর্ত ছিল, "তুমি নিজে না বুঝে কোনো বাক্য লিখতে পারবে না।" গণপতি 'গণের' অর্থাৎ সাধারণজনের, mass-এর প্রতিভূ। অতএব তিনি লিখবেন সব কিছু নিজে প্রথমটায় বুঝে নিয়ে যাতে করে জন'গণ'ও সব-কিছু বুঝতে পারে। তাই বোধহয় কাব্যতত্ত্ববিশারদ তলস্তয় মন্তব্য করেছিলেন, মহাভারতের মত কাব্য ইহসংসারে আর নেই।

আনাতোল ফ্রাঁস হুবহু এই আদর্শটিই শ্রীমান মরিসের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

অবনত মস্তকে, করজোড়ে, দাঁতে দাঁতে কুটো কেটে স্বীকার করছি, প্রাগুক্ত তত্ত্বটি আবিষ্কার করতে এবং সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে আমার অনেকখানি সময় লেগেছিল। অবশ্য মসিয়ো মরিসের

মত "সশ্রদ্ধ একাগ্রতার" প্রত্যাশা করার মত হিমালয় বিনিন্দিত উত্তুঙ্গ দম্ভ আমার কস্মিন কালেও ছিল না। আমি ভুল করেছিলুম অন্য ক্ষেত্রে। আমি মনে করেছিলুম দেশাবদেশ ঘুরে আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, একাধিক ভিন্ দেশে বাধ্য হয়ে যে দু' একটি ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, বহুবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ এবং তার নির্যাস গলাধঃকরণ করেছি, নানান ধরনের নানান চিড়িয়ার সঙ্গে মোলাকাৎ-সহবাসের ফলে যে আদর-অনাদর, দাগা-মহব্বৎ পেয়েছি, প্রবাসের নিরানন্দ দিনে, নির্জন ত্রিযামা শর্বরীতে আকাশকুসুম চয়ন করেছি, দীর্ঘ, দীর্ঘকাল ধরে মাতৃবিরহের অসহ কাতরতা এবং তার চেয়েও নিষ্ঠুর উপলব্ধি যে পুত্রবিরহিনী আমার মা-জননী আমার চেয়ে কত লক্ষ গুণে কাতর নিরানন্দ নিরালোক দিনযামিনী যাপন করছেন আমার প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করে—এর মধ্যে অসাধারণ আলৌকিক এমন কোনো সৃষ্টিছাড়া উপাদান-উপকরণ নেই যেটা আমার মত নিতান্ত সাধারণজনসুলভ সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করলে গৌড়ীয় পাঠকের বোধগম্য হবে না, তাঁর দিকচক্রবাল অতিক্রম করে মহাশূন্যে বিলীন হবে না।

আমি জানতুম, এবং এখনো দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করি যে, হাড় আলসে, রকবাজীতে দিগ্বিজয়ী ফোকটে টু পাইস কামাবার তরে বাপের কামানো ফোর পাইস ঝট্‌সে ঝেড়ে দিতে প্রস্তুত, এবং পাড়ায় একটি সর্বজনসেবী পাঠাগার নির্মাণের জন্য হোক কিংবা নির্মাণান্তে দলাদলি বশতঃ সেটিকে বীরদর্পে ভস্মীভূত করাই হোক, উভয় মহৎ কর্মের জন্য, তদাভাবে সর্বকর্মের জন্য, তদাভাবে কর্মহীন "কর্মের" জন্যই হোক, চাঁদা তোলাতে যে বাঙালী অদ্বিতীয়, অপরাজেয়, যে বাঙালী গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐ মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য হিটলার স্তালিনের চাঁদা তোলার প্রয়াস পদ্ধতির বর্ণনা শুনে "শিশু! শিশু!!" বলে অট্টহাস্য দ্বারা গোরশয্যাশায়ী ঐ দুই মহাপ্রভুকে লজ্জা, আত্মজগুপ্সায় ঘন ঘন ঘূর্ণায়মান করাতে, ভানুমতী

বিশারদ, সেই বাঙালী, আবার বলছি, সেই বাঙালী—অন্য জাত যারা ভ্রমণ ব্যাপদেশে কলকাতাতে এসে সভয়ে, আমাদের রঙ্গভূমি থেকে সম্মানিত ব্যবধান রক্ষা করে, আমাদের কীর্তিকলাপের খুশবাইটুকু মাত্র পেয়েছে তারা কিছুতেই প্রত্যয় যাবে না যে বাঙালী ব ই প ড়ে।

হ্যাঁ বই পড়ে! অধিকাংশ স্থলেই অবৈধ কিন্তু মার্জনীয় পদ্ধতিতে। কিন্তু পড়ে।

তাই আমি হরেদরে ধরে নিয়েছিলুম, আমার বক্তব্য বস্তু যতই হ য ব র ল মার্কা হোক না কেন সেটা তার কাছে কিছুতেই সম্পূর্ণ অপরিচিত হতে পারে না—নিতান্ত দু একটি উৎকট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া। কারণ প্রকৃত পাঠকের কাছে কোনো বিষয়ই সম্পূর্ণ অজানা নয়, আবার কোনো বিষয়ই সম্পূর্ণ জানা নয়। তাই এক আরব গুণী বলেছেন, "পুস্তক, সে যেন একটি ছোট্ট বাগান যেটি তুমি অনায়াসে পকেটে পুরে সর্বত্র নিয়ে যেতে পারো।" যখন খুশী তাতে ডুব মেরে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলের কণ্ঠ, বসরাই গোলাপের খুশবাই, সারা দিনমান ঝরনার গান সব-কিছুই পেতে পারো। তেমন বই যদি বেছে নাও তবে সে বাগিচায় মিশরের পিরামিড, হিমালয়ের গিরিশ্রেণী, পাভলোভা—পাভলোভাই বা কেন—উর্বশী মেনকার নৃত্যও দেখতে পাবে। এমন কি এমন বই অর্থাৎ এমন বাগিচাতেও তুমি প্রবেশ করতে পারো যে বাগিচা তোমাকে আরো লক্ষ লক্ষ বাগিচার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। যেমন ধরো, প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক পুস্তক। কত লক্ষ বাগবাগিচার সঙ্গে সে যে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবে সেটা নির্ভর করে শুধু তোমার কৌতূহলের উপর।

আরেক জ্ঞানী বলেছেন, "একখানা পুস্তক যেন একখানা ম্যাজিক কার্পেট; তারই উপর আরামসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে তুমি যত্রতত্র যেতে পারো, যা ইচ্ছা তাই এমন কি তোমার সে রকম 'রুচি' হলে 'যাচ্ছেতাই' দেখতে পারো।"

তবে হ্যাঁ, আমার মনে ধারণা ছিল, ম্যাজিক কার্পেট রাজা-রাজড়ার মিনার, অধুনা মার্কিন মুল্লুকের চন্দ্রস্পর্শী প্রাসাদাদির থেকে গা বাঁচিয়ে বহু উর্ধ্বলোক দিয়ে উড্ডীয়মান হয় বলে পাঠক সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পায় না। আমার রচনা হবে যুগ মানানসই হেলিকপ্টার,—অনেক নিচু দিয়ে যায় বলে, অনেক মন্থরে চলে বলে পাঠক হয়তো অনেক আধ-চেনা জিনিসের চোদ্দ আনা চিনে নেবে।

কিংবা বলি, ম্যাজিক কার্পেটের সন্ধানে অতদূরে যাই কেন? এই কাছেই তো "বাঙলাদেশ", নিত্য নিত্য যার ক্রন্দনধ্বনি আমাদের কানে আসছে, কিন্তু সে-কথা থাক। সেই বাঙলাদেশের ঢাকার এক কুট্টি ফেরিওলা আম বেচতে এসে বাড়ির সামনের লন্-এর উপর ঝুড়িটা রেখেছে। বাবু উপরের বারান্দা থেকে আমগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "কি আম আনছো, মিয়া, বড় যে ছোড়ু ছোড়ু (ছোট ছোট)।" কুট্টি এক গাল হেসে উপরবাগে তাকিয়ে বললে, "ছোড তো লাগবই, কর্তা—উচা থনে ছোড তো লাগবোই। লাম্যা আহেন মহারাজ, তখন দেখবাইন অনে, বরো বরো।"

কিন্তু হায়, আমার পাঠক মহারাজা নেমে এলেন না। আমগুলোর সত্য রূপ তাঁরা নিকটে এসে দেখতে রাজী হলেন না।[৮]

---

৮ উন্নাসিক দার্শনিক বলেন, কাছের থেকে দেখাটাই সব চেয়ে সত্য দেখা তার তো কোনো প্রমাণ নেই। হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়োর উচ্চতা সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান উপলব্ধি করতে হলে তার ডগার উপর বসে সেটাকে দেখতে হয়, এমন নির্দেশ দেয় কোন্ অবাচীন! বরঞ্চ সুদূর দার্জিলিঙ থেকে সেটাকে দেখলে তার সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান জন্মায়। বিস্তৃত ফ্রেস্কো পেনটিং সম্বন্ধে সেটা আরো বেশী প্রযোজ্য। আর কে বললে আপনি আম দেখছেন। এটা স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম অনেক কিছুই হতে পারে। এবং সর্বশেষে শুধোবেন, ফেরিওলাই বা কে, বাবুই বা কে? উত্তরে শঙ্করাচার্য কপচে বলবেন, "নত্বং নাহম্ নায়ম লোকঃ"। তুমি নেই, আমিও নেই, এই পৃথিবীও নেই। আমি তো কোন্ ছার।

সেটা হয়ে যেত "স্পেশালাইজড নলেজ"। তখন তাঁরা চাইতেন "কমন নলেজ"। এখন তাঁরা চান "স্পেশালাইজড নলেজ"।

কিন্তু অধম এ-খল্বাট, ইন্দ্রলুপ্তজন আর দ্বিতীয়বার বিল্ববৃক্ষ নিম্নে গমনাগমন "করিবেক" না।

এখন থেকে আমি সুদ্দুমাত্র অতিশয় সাদামাটা, সাতিশয় নির্জলা "কমন নলেজ" পরিবেশন করবো।

কিন্তু না, পুনরপি না। যদ্যপি উন্নাসিকসম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বারংবার বলছেন সেক্স্ "কমন নলেজ" হয়ে গিয়েছে, এবং আমিও এইমাত্র যে প্রতিজ্ঞাপাঠ লিপিবদ্ধ করলুম তার কালি এখনো শুকোয় নি, এবং যার অর্থ, আমি এখন থেকে শুধু "কমন নলেজ" নিয়ে লিখব তার অর্থ এই নয় যে আমি ইহ সংসারের তাবৎ "কমন নলেজ"-এর বিশ্বকোষ রচনা করতে বসে যাবো। সংসারের বিস্তর পোড়-খাওয়া এক ধনী বাপ মৃত্যুকালে অন্যান্য উপদেশ দিতে দিতে বলেছিল, "আর হ্যাঁ, প্রতি গ্রাসে পাঁচটা করে মাছের মুড়ো খাবি।" পয়সাওলা সে বাড়িতে পাকা রুই বাঘা কাৎলা গোত্রের বড় মাছের মুড়ো ভিন্ন অন্য কোন মাছের মুড়ো কস্মিন কালেই প্রবেশ লাভ করেনি। ছেলে বেচারী একই গ্রাসে পাঁচটা রুই মাছের মুড়ো খেতে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে মৃত পিতার "অনুজ" হওয়ার উপক্রম। বাবা বলতে চেয়েছিল চুনোপুঁটি কেঁচকি পোনার মুণ্ডু খেয়ে সস্তায় আহারাদি সমাপন করবি। আমি কমন নলেজের চুনোপুঁটির মুণ্ডু গিলতে রাজী আছি কিন্তু রাঘব বোয়ালের বাঘা মুণ্ডু এক গরাসে গেলবার চেষ্টা করতে রাজী নই। যদিও মুণ্ডু তো ছুটোই। সেক্স্ কমন নলেজ আবার পুরাতন ভৃত্যও কমন নলেজ।

দ্বিতীয়ত, "এ যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে রে? হরে মুরারে হরে মুরারে" আর্তনাদ করেছিলেন কবি আকুল কণ্ঠে। এখন "এ

যৌন বটতলা প্লাবন রুধিবে কে রে? আই জি রে, পি সি রে?"

আমি বাস করি একতলায়। খুব বেশী দিনের কথা নয়, তেড়ে নেমেছে কলকাতার বর্ষা। গৃহিণী দুরু দুরু বুকে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দেখছেন রাস্তা থেকে পেভমেণ্টে জল উঠেছে। এইবারে পেভমেণ্ট ছাড়িয়ে ঘরের ভিতরে জল ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার আবর্জনা ময়লাও অপর্যাপ্ত পরিমাণে। (পৌর পিতারা নিশ্চয়ই উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করেছিলেন এবং মার্কিন টুরিস্টদের দাওয়াৎ করেছিলেন দেখে যেতে, আমাদের কলকাতা কী সুন্দর, কী সাফ, কী সুৎরো) এবং তার পর কেলেঙ্কারি কাণ্ড। ডাব্লু সি-তে জল ঢুকে, না জানি কোন্ বৈজ্ঞানিক কারণে উজান বইতে আরম্ভ করল কোথা থেকে নানাবিধ স্রোত, ভেসে আসতে লাগল নানাবিধ "অবদান"। বীভৎস রস এস্থলেই সমাপ্ত হোক।

হুবহু একদম সে-ই প্রক্রিয়ারই পুনরাবৃত্তি হল যৌন-'সাহিত্য' মারফৎ। প্রথম ছেয়ে গেল পেভমেণ্ট, তার পর হুড় হুড় করে ঢুকলো ঘরের ভিতরে। কিন্তু সত্যিকার রগড় তো শুরু হল তার পর। যৌন জীবনের যে-সব আবর্জনা আমরা ডাব্লু সি দিয়ে, স্যুয়ারেজ দিয়ে বাড়ি থেকে নগর থেকে বের করে দিয়েছি সেগুলোকে কোন্ এক পিচেশ মার্কা উচাটন মন্ত্রে আবাহন জানালো বাইরের সেই আবর্জনা, সেই বিদেশ থেকে আমদানী যৌন-বটতলীয় 'মাল' যা ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলেছিল কুল্লে পেভমেণ্ট, তাবৎ ফুট-পাথ—পুলিশের নাকের ডগায় সুড়সুড়ি দিতে দিতে (আমি পুলিশের ঘাড়ে কুল্লে বেলেল্লাপনার বালাই চাপাতে চাইনে; দেশের লোক যদি এ-মাল চায় তবে পুলিশ আর কতখানি ঠেকাবে? (দেশ-বিদেশের একাধিক ডাঙর ডাঙর কর্ণধার কখনো সোল্লাসে, কখনো বা মুচকি হেসে, কখনো বা বক্রোক্তি করে 'আপ্তবাক্য' ঝেড়েছেন, "এ নেশন (কান্ট্) বি রং।"

এই হৈ হুল্লোড়, জগঝম্প বাদ্যির মধ্যিখানে কে কান দেবে,

মশাই, আপনার গুণগুনানি প্যানপ্যানিতে। আপনার বক্তব্য, যত অসুস্থতাই হোক না কেন তাকে দেখতে হবে সুস্থ মাথায়, অধ্যয়ন করতে হবে শান্তচিত্তে, অযথা উত্তেজিত না হয়ে। কিন্তু তাতে কোনো ফায়দা হবে না, এখন থেকেই বলে দিচ্ছি। এই যে সেদিন শ্যামাপূজোর সাঁঝ থেকে ভোর অবধি বেধড়ক, আচমকা, নানাবিধ কর্ণপটহ বিদারক বাজী ফাটালে কলকাত্তাইরা,—সে অক্তে আপনি পাকা সুরেলা হাতে বীণাযন্ত্রে দরবারি কানাড়া বাজালে কান দিত না যেদো-মেধো কেউই। তাই কবি শাবাশ শাবাশ রব ছেড়ে বলেছেন

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিল জলদাগমে

বর্ষাকাল এসেছে। এখন মত্ত দাদুরী পাগলা কোলা ব্যাঙের পালা। কোকিল যে মৌনতা অবলম্বন করলো সেটা অতিশয় 'ভদ্র' কর্ম (বিচক্ষণেরও বটে)। জন্ম-অভিজাত জাতভদ্রই এ-আচরণ ভিন্ন অন্য আচরণ কল্পনা করতে পারে না।

তা আমি যতই কমন নলেজ নিয়ে পড়ে থাকতে চাইনে কেন, আমার একদল হাফউন্নাসিক (হাফ-গেরস্ত তুলনীয় নয়, থুড়ি থুড়ি, এই দেখুন, ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যতই সন্তর্পণে আপনি যৌনের প্রতি সামান্যতম ইঙ্গিত দিয়েছেন কি, না, অমনি ত্মাথ্-তো-না-ত্মাথ্ ঐ খাটালের বোটকা গন্ধের অর্ধ্যান্যায্য বখরাটি আপনি পেয়ে যাবেনই যাবেন)—হ্যাঁ, কি বলছিলুম, এক দল অর্ধ-উন্নাসিক পাঠক আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন বহু বৎসর ধরে। কেন, বলতে পারবো না। কখনো ভেবেছি, অনুকম্পা বশতঃ। লক্ষ্য করেন নি এই তত্ত্বটি, পথে যেতে যেতে দেখলেন দুই অজানা টীমে ফুটবল খেলা হচ্ছে, তার একটি স্পষ্টত দুর্বল; আপন অজানতে দেখবেন, আপনার দরদখানি আ—স্তে

আ—স্তে ঐ দুবলা টীমের পাল্লার উপর ভর দিচ্ছে। কখনো ভেবেছি, হয়তো আমার "মুসলমানী চিন্তাধারা, ভাষার যাবনিক কায়দা-কেতা" তার নূতনত্বের জন্য কোনো কোনো একঘেয়েমিক্লান্ত পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। আমি অবশ্য সে-সম্বন্ধে অল্পই সচেতন ছিলুম; আমি জ্ঞানত এমন কোনো বিষয় এমন কোনো ভাষা ব্যবহার করিনি যা সূক্ষ্মমাত্র যাবনিকতা দ্বারা 'নিত্যনবীনের' সন্ধানী জনের পাঁজরে কাতুকুতু দিয়েছে, জড রসনায় চুলবুল জাগাবার চেষ্টা করেছে। যাবনিক জিনিস আমি আলিঙ্গন করেছি, পাঠকের সম্মুখে পেশ করেছি তখনই, যখন অনুভব করেছি সে যাবনিকতার মধ্যে বিশ্বজনীন ভাব সঞ্চারিত আছে, যে যাবনিকতা দেশকালপাত্র উত্তীর্ণ হয়ে শাশ্বত হবার অধিকার লাভ করেছে। "কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই।" বলা বাহুল্য খৃষ্টীয়, অখৃষ্টীয়, জনপদসুলভ ভাবধারা, আমার আবাল্য পরিচয়ের খাসিয়া সাঁওতাল সভ্যতার প্যাটার্ন আমি ঠিক সেই ভাবেই গ্রহণ করেছি যে ভাবে আমি যাবনিক চিন্তামণিকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছি।…এই পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা অতিক্রম করার সময় কিছু পাঠক সর্বদাই আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন, বিশেষ করে দুর্দিনে

> দুর্দিনে বলো, কোথা সে সুজন যে তোমার সাথী হয়?
> আঁধার ঘনালে আপন ছায়াটি সেও, হায়, হয় লয়॥

> তঙ্গদস্তীমে কৌন কিসকা সাথ দেতা হৈ?
> কি ছায়া ভী জুদা হোতা হৈ ইনসাঁসে তারীকীমেঁ॥

এঁদের বয়স হয়েছে। এঁদের অনেকেই এখন গভীরে প্রবেশ করতে চান।

আমি তাই একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবো। দয়া করে আমার সহৃদয় পাঠকসমুদায় তাঁদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ এই অধম

লেখককে তার মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রদোষে, তার ধূসর জীবনের গোধূলিতে তাকে আশীর্বাদ করবেন।

আমার অনুরোধ, আমার মূল লেখাটি পড়ার সময় যদি কৃপালু পাঠক অল্পাধিক নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ লহরীতে দোলা খেতে খেতে এগিয়ে যান, সে-রসস্রোতে (যদি আদৌ রসসৃষ্টিতে আমি কথঞ্চিৎ সক্ষম হই) ভেসে ভেসে সমুখ পানে চলতে থাকেন তবে হঠাৎ সে-স্রোত থেকে সরে গিয়ে ফুটনোটের গম্ভীরে ডুব দেবেন না।

আর যাঁরা ফুটনোটের গভীরে গিয়ে কিছুক্ষণ সে-গভীরে অবগাহন করার পর ডুব সাঁতার দিয়ে পুনরায় ভেসে উঠে স্রোতোপরি অন্যান্য পাঠকদের সঙ্গে সম্মিলিত হন তাঁরা তখন নিশ্চয়ই আমাকে সস্নেহ আশীর্বাদ জানাবেন।

দ্বাপর

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে রাত দুপুরেই হোক আর দিন দুপুরেই হোক চট করে বলতে পারবেন না, আপনি যে হোটেলে শুয়ে আছেন সেটা কোন্ শহরে। টোকিও, ব্যাংকক, কলকাতা, কাবুল, রোম, কোপেনহাগেন যে কোনো শহর হতে পারে। আসবাবপত্র, জানালার পর্দা, টেবিল ল্যাম্প যাবতীয় বস্তু এমনই এক ছাঁচে ঢালা যে স্বয়ং শার্লক হোমস্‌কে পর্যন্ত তাঁরা সবকটা পুরু পুরু আতসী কাচ মায় তার জোরদার মাইক্রোস্কোপ্‌টি বের করে ওয়াটসনকে কার্পেটের উপর ঘোড়া বানিয়ে, নিজে তার পিঠে দাঁড়িয়ে, ছাতের উপর তাঁর স্বহস্তে নির্মিত আলা হোমস্ স্প্রে ছড়িয়ে—বাকিটা থাক্, ব্যোমকেশ ফেলুদার কল্যাণে আজ 'ইস্কুল বায়'ও সেগুলো জানে—তবে বলবেন, "হয় মন্তে কার্লোর রোজনা হোটেল নয় য়োহানেসবের্গের অল হোয়াইট হোটেল।" দূর-পাল্লার এ্যারোপ্লেনের বেলাও আজকের দিনে তাই! একবার তার গর্ভে ঢুকলে ঠাহর করতে পারবেন না, এটা সুইস এ্যার, লুফ্‌ট্ হানজা, এ্যার ইণ্ডিয়া না কে এল এম। তিমির পেটে ঢুকে নোয়া কি আর আমেজ-আন্দেশা করতে পেরেছিলেন এটা কোন্ জাতের কোন্ মুল্লুকের তিমি?

ইণ্ডিয়ান মানেই নেটিভ, মানে রদ্দী। আস্তে আস্তে এ ধারণা কমছে। নইলে জর্মনি এ-দেশের সেলাইয়ের কল, রুশ কলকাতার জুতো কিনবে কেন?

অতএব এ্যার ইণ্ডিয়া কোম্পানির এ্যারোপ্লেনকে একটা চান্স্ দিতেই বা আপত্তিটা কি? অন্য কোম্পানিগুলো তো প্রায় সব

চেনা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য আরেকটা কথা আছে। ঐ কোম্পানির এক ভদ্রলোক বুদ্ধি খাটিয়ে তদ্বির-তদারক করে আমার সুখ-সুবিধার যাবতীয় ব্যবস্থা না করে দিলে হয়তো আমার যাওয়াই হত না। তাঁর নাম বলবো না। উপরওলা খবর পেলে হয়তো কৈফিয়ৎ তলব করে বসবেন, কোনো একজন ভি আই পিকে সাহায্য না করে একটা থাড্ডো কেলাস 'নেটিভ' রাইটারের পিছনে তিনি অপিসের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করলেন কেন? তবে কি না তাঁর এক ভি আই পি মিত্রও আমাকে প্রচুরতম সাহায্য করেছিলেন। তাঁকে না হয় শিখণ্ডীরূপে খাড়া করবেন।

ভাবছিলুম চুঙ্গী ঘরের (কাসটম্‌সের) উৎপাত থেকে এই দুই দোস্তো কতখানি বাঁচাতে পারবেন। ইতিমধ্যে এক কাস্টমিয়া আমার কাগজপত্র পড়ে আমার দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়ে শুধোলে "আপনিই তো আপনার বইয়ে চুঙ্গীঘরের কর্মচারীদের এক হাত নিয়েছেন, না?"

খাইছে। এ যাত্রায় আমি হাজত বাস না করে মানে মানে কলকাতা ফিরতে পারলে নিতান্তই পঞ্চপিতার আশীর্বাদেই সম্ভবে। কে জানে, এই কাস্টমিয়াই হয়তো হালে কয়েকজন ডাঙর ভি আই পি-কাম-সরকারী-কর্মচারীকে বেআইনীতে মাল আনার জন্য নাজেহাল করেছিলেন।...এত দিন কলকাতা করপরশনের অত্যুৎসাহ ও মাত্রাধিক কর্মতৎপরতা বশত জলের কল খুললে যে-রকম জল না বেরিয়ে শব্দ বেরতো সেই রকম আমার ব্লটিং পেপারের লাইনিংওলা গলা দিয়ে কথা না বেরিয়ে বেরোল ঘস ঘস খস খস চোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ ধরনের কি যেন একটা বদখৎ আওয়াজ।

নাঃ। এ-লোকটির রসবোধ আছে কিংবা এঁর বাড়িতে মাসে একদিন করপরশনের কলের জল আসে বলে ঐ ভাষা বাবদে তিনি সুনীতি চাটুয্যে মশাইকে তাক লাগিয়ে উত্তম ধ্বনিতত্ত্ববাদের কেতাব লিখতে পারবেন। বললেন, "নিশ্চিন্তমনে ঐ আরাম

চেয়ারটায় বসুন। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।" তারপর ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে কী এক অশ্রুত টরে টক্কার সংকেত করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে জনাচারেক বাঙালী কাস্টমিয়া আমাকে ঘিরে যা আদর আপ্যায়ন আরম্ভ করলেন যে হৃদয়ঙ্গম করলুম, দেবীর প্রসাদে মূক যে-রকম বাচাল হয়, আমি কেন, হরগোলাও মূক হতে পারে।

প্রতিজ্ঞা করলুম, চুঙ্গীঘর লেখাটি আমিই ব্যান্ করে দেব। কার যেন দুশো টাকা ফাইন হয়েছে। অবশ্য অন্য অকারণে, কিন্তু জরিমানা ইজ্ জরিমানা। আপনার কারণ ভিন্ন বলে আপনি তো আর মেকি টাকা দিয়ে শোধবোধ করতে পারবেন না।

কিন্তু এত সব বাখানিয়া বলছি কেন?

শুনুন। জীবনে ঐ একদিন উপলব্ধি করলুম, সাহিত্যিক—তা সে আমার মত আটপৌরে সাহিত্যিক হওয়ার মধ্যেও একটা মর্যাদা আছে।

* * *

এসব যে বাখানিয়া বলছি তার আরো একটা কারণ আছে।

আমার নিজের বিশ্বাস, প্লেনের পেটের ভিতরকার তুলনায় এ্যারপোর্টে আজব আজব তাজ্জব চিড়িয়া দেখতে পাওয়া যায় ঢের বেশী। পাসপর্ট, কাস্টমস, হেলথ অফিসে, রেস্তরাঁয় তাদের আচরণে কেউ বা সংকোচের বিহ্বলতায় অতীব ম্রিয়মান, কারো বা গড্ ড্যাম্ ডোণ্টো কেয়ার ভাব—ওদিকে একটি বিগতযৌবনা মার্কিন মহিলা এ্যারোপ্লেনে অর্ধনিদ্র যামিনী কাটিয়ে আলুথালু-কেশ, হৃতপাউডাররুজ, এঞ্জিনের পিস্টন বেগে পলস্তরা পলস্তরা ক্রীম-পাউডার-রুজ মাখছেন, এদিকে তাঁর কর্তা প্লেনে সস্তায় কেনা স্কচ স্যাঁট স্যাঁট করছেন; আর ঐ সুদূরতম প্রান্তে দেখুন,—দেখুন বললুম বটে, কিন্তু দেখার উপায় নেই—কালো বোরকাপরা জড়ো-সড়ো গণ্ডা দুই মক্কাতীর্থে হজ্জ যাত্রিনীর গোঠ। এঁরা নিশ্চয়ই

চলতি ফ্যাশানের ধার ধারেন না। বেশীর ভাগ আঁকড়ে ধরে আছেন পুঁটুলি—হ্যাঁ বেনের পুঁটুলি। গোরুর গাড়িতে গয়নার নৌকোয় ওঠার সময় যে পুঁটুলি সঙ্গে নেন। ওঁরা ভাড়া বাবদ কয়েক হাজার টাকা দিয়েছেন নিশ্চয়ই। অনায়াসে হাল্কা স্যুটকেস কিনতে পারতেন। দু-একজনের ছিলও বটে। কিন্তু ওদের কাছে গরুর গাড়ি যা, হাওয়াই জাহাজও তা—এদের মক্কা পৌঁছলেই হল। হায়, এঁরা জানেন না, প্লেনে ভ্রমণ—তা সে যে কোনো কোম্পানিই হোক না কেন—গোরুর গাড়িতে মুসাফিরী করার তুলনায় ঢের বেশী তকলীফ দায়ক। এমন কি প্লেনে এঁদের পক্ষে হায়া-শরম বাঁচিয়ে চলাও কঠিন। কলকাতার বস্তিতে কি হয় জানিনে, কিন্তু এঁদের যখন প্লেনে করে যাবার রেস্ত আছে তখন এঁরা নিশ্চয়ই সেখানকার নন। আর গ্রামাঞ্চলে কেউ কখনো প্রাতঃকৃত্যের জন্য কিউ দেয় না। অথচ প্লেনে প্রাতঃকৃত্যের জন্য এঁদের কিউয়ে দাঁড়াতে হবে—মেয়েমদ্দে লাইন বেঁধে। সে-কথা পরে হবে। তবে হজ যাত্রীদের জন্য স্পেশাল প্লেনে যদি স্পেশাল ব্যবস্থা থাকে তার তথ্য জানিনে। কোনো কোম্পানি অপরাধ নেবেন না।

"শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি প্লেন দিল ছাড়ি
দাঁড়ায়ে রহিল পোর্টে সব বেরাদরই শুষ্ক চোখে।"

পূর্বেই নিবেদন করেছি প্লেনের ভিতরে দেখবার মত কিচ্ছুটি নেই। খেয়াপারে রেলগাড়িতে যা দেখতে পাওয়া যায় তার চেয়েও কম। আর সর্বক্ষণ আপনার চোখের তিন ফুট সামনে, সমুখের দুটো সীটে দুটো লোকের ঘাড়। তারো সামনে সারি সারি ঘাড়। দোস্ত আমার এ-প্লেনের 'মালিক'। অতএব আমার জন্য উইণ্ডো সীটের ব্যবস্থা করেছেন—অর্থাৎ বাঁদিকে তাকালে বাইরের আকাশ দেখা যায় মাত্র, বলতে গেলে পৃথিবীর কিছুই

না। একে রাত্রি, তদুপরি আল্লায় মালুম, বিশ হাজার না পঁচিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে প্লেন যাচ্ছেন। কিছু দেখতে চাইলে ত্রিনয়নের প্রয়োজন। উপরেরটা হয়তো কিছু বা দেখতে পায়। তবে ভারতীয় প্লেনে একটা বড় আরাম আছে। যদিও অধিকাংশ যাত্রী ভারতীয় নয়—বিদেশী, এবং প্রধানত ইয়োরোপীয়। তারা জানে, ইণ্ডিয়ানরা বেলেল্লাপনা পছন্দ করে না। কাজেই অতিরিক্ত কলরোল, এবং ছাগলের দরে হাতি কেনার মত স্কচ ভোদকা সেবন জনিত মাঝে মধ্যে তদতিরিক্ত কলহরোল থেকে নিশ্চিন্ত মনে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

এ-বাবদে এখানেই থাক। কারণ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত তারাশঙ্কর, সম্মানীয় শ্রীযুত বুদ্ধদেব, ভদ্র প্রবোধ ও অন্যান্য অনেকেই প্লেনের ভিতরকার হাল সবিস্তর লিখেছেন।

জাগরণ, তন্দ্রা, ঘুম সবই ভালো। কিন্তু তিনটিতে যখন গুবলেট পাকিয়ে যায় তখনই চিত্তির। এ-যেন জ্বরের ঘোরে দু দিন না তিনদিন কেটে গেল বোঝবার কোনো উপায় নেই।

চিৎকার চেঁচামেচি। রোম! রোম!! রোম!!!

২

ক্যাথলিকদের তো কথাই নেই। প্রটেসটানট্‌দের ঈষৎ সংযত কৌতূহল। বিশেষ করে মার্কিনদের। দেশে ফিরে বড়ফাট্টাই করতে হবে, "হ্যাঁ তেমন-কিছু না, তবে কি না, হ্যাঁ, দেয়ালের আর গম্বুজের ছবিগুলো ভালো। কী যেন নাম (ভামিনীর দিকে তাকিয়ে) মাইকেল-রাফাএল, না, হল না। লেওনার্দো দা বত্তিচেল্লি। ও! সেটা বুঝি মোনালিসার লীনিং টাওয়ার?"

বললে পেত্যয় যাবেন না, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তাজমহলের সামনে বসে একই বেঞ্চে-বসা এক মার্কিনকে তার মিসিসের উদ্দেশ্যে শুধোতে শুনেছি, "কিন্তু আশ্চর্য, এই ইণ্ডিয়ানরা এ-সব তৈরী করলো কি করে—ফরেন সাহায্য বিনা, অর্থাৎ আমাদের সাহায্য না নিয়ে।"

রোমে নামতেই হল। সেখানে আমার এক বন্ধু বাস করেন। কিন্তু তার ফোন নম্বর জানা ছিল না বলে যোগসূত্র স্থাপনা করা গেল না। একখানা পত্রাঘাত, তদ্দরুণ স্ট্যাম্প যোগাড় করতে না করতেই এ্যার কোম্পানির লোক রাখাল ছেলে যেরকম গোরু খেদিয়ে খেদিয়ে জড়ো করে গোয়ালে তোলে সেই কায়দায় প্যাসেঞ্জারদের প্লেনের গর্ভে ঢোকালে। প্যাসেঞ্জারদের গরুর সঙ্গে তুলনা করাটা কিছুমাত্র বেয়াদবী নয়। মোটা, পালটা ঠিক বয়স্ক গরুরই মত লাউঞ্জের মধ্যিখানে একজোট হয়ে বসেছে বটে কিন্তু বাছুরের পাল, অর্থাৎ চ্যাংড়া চিংড়িরা যে কে কোনদিকে ছিটকে পড়েছে তার জন্য হুলিয়া শমন বের করেও রত্তিভর ফায়দা নেই। কেউ গেছেন কিওরিওর দোকানে। কাইরোর মত এখানেও খাঁটি ভেজাল দুই বস্তুই সুলভ—এন্তের পড়ে আছে—কিন্তু দুর্লভ, কলকাতার মাছের বাজারকেও হার মানায় গাহকের কান কাটতে। কেউ বা গেছেন বিনমাশুলের (ট্যাক্স ফ্রী) দোকানে। হয়তো ইতালির নামকরা একখানা আস্ত ফিয়াৎ (মোটামুটি, ফা (F) ব্রিকাদ্‌সিয়োনে ; ই (i) ইতালিয়ানা ; আ (a) ওতোমোবিলে ; তু (T) রিনো—এই চার আদ্যাক্ষর নিয়ে FIAT. একুনে, ফ্যাব্রিকেশন (মেড ইন) ইতালিয়ানা (of Italy) অটোমবীল (of) তুরীনো। তুরীনো সেই শহরের নাম যেখানে এই স্বতশ্চলশকট নির্মিত হয় ; ফিয়াৎ শব্দ আবার আরেক প্রাচীন অর্থ ধরে—"ফরমান", "তাই হোক"।) গাড়ি কিনে নিয়ে আসেন! একটি হাফাহাফি আধাআধি, অর্থাৎ পাতে দেওয়া চলে

মার্কিন চিংড়ি ঐ হোথা বহু দূরে বার-এ বসে চুটিয়ে প্রেম করছেন একটি খাবসুরৎ ইতালিয়ান চ্যাংড়ার সঙ্গে। খাবসুরৎ বলতেই হবে —এই রোম শহরে ছবি এঁকে মূর্তি গড়ে যিনি নাম করেছেন সেই মাইকেল এঞ্জেলো যেন এই সন্ত একে গড়ে 'চরে খাওগে, বাছা', বলে ছেড়ে দিয়েছেন। আর ইতালিয়ান যুবক-যুবতীর প্রতি মার্কিনিংরেজের যে-পীরিতি সেটা প্রায় বেহায়ামীর শামিল। চিংড়িটা চরে খাবে না কেন? সর্বশেষে বলতে হয়, ইতালির কিয়ান্তি মদ্য দুনিয়ার কুল্লে সুধার সঙ্গে পাল্লা দেয়। সেটা ও মেয়েটা পাওয়া যাচ্ছে ফ্রী, গ্রেটিস অ্যাণ্ড ফর নাথিং। মুফৎ মে।

প্লেনে ঢুকে দেখি, সত্যি সেটা গোয়াল ঘর। মশা খেদাবার তরে গাঁয়ের চাচার বাড়িতে যে-রকম স্যাঁৎসেতে খড়ে আগুন ধরানো হত এখানেও সেই প্রতিষ্ঠান। তবে হ্যাঁ, এটা বিজ্ঞানের যুগ। নানা প্রকারের ডিসিনফেকটেনট, ডিঅডরেনট স্প্রে করা হয়েছে প্রেমসে। সায়েবদের যা বী ও—বডি ওডার—গায়ের বোটকা দুর্গন্ধ !!

সকাল বেলার আলো দিব্য ফুটে উঠেছে। ইতিমধ্যে প্লেনে পাক্কা সাড়ে পনেরো ঘণ্টা কেটেছে। দমদমা ছেড়েছি রাত ন'টায়; এখন সকাল আটটা। হওয়ার কথা তো এগারো ঘণ্টা! কি করে হল? বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাদের শুধোন।

প্লেন যখন রোম ছাড়ল তখন অপ্রশস্ত দিবালোক।

দিবালোকের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক আছে। যে-দেশে যাচ্ছি, সেই জর্মনির বাঘা দার্শনিক কান্ট নাকি বলেছেন কাল এবং স্থান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। (টাইম অ্যাণ্ড স্পেস আর আ প্রিয়রি কনসেপশন)।

কাজের বেলা কিন্তু দেখলুম, তত্ত্বটা আদৌ সরল সহজ নয়।

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, যেন দেশের সকালবেলার সাতটা আটটা। কিন্তু হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে নজর পড়াতে দেখি, সেটি দেখাচ্ছে সাড়ে বারোটা! কি করে হয়? আমার ঘড়িটি তো পয়লা নম্বরী এবং অটোমেটিক। অবশ্য এ-কথা আমার অজানা নয়, অটোমেটিক বেশী সময় কোনো প্রকারের ঝাঁকুনি না খেলে মাঝে মধ্যে থেমে গিয়ে সময় চুরি করে। কিন্তু কাল রাত ভর যা এ-পাশ ও-পাশ করেছি তার ফলে ওর তো দম খাওয়া হয়ে গেছে নিদেন দুদিনের তরে। আমার পাশের সীটে একটি চার-পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে। তার পরের সীটে এক বয়িয়সী—বাচ্চাটার ঠাকুরমা দিদিমার বয়সী। তাঁর দিকে ঝুঁকে শুধালুম, "মাদাম, বেজেছে কটা, প্লীজ?" মাদামের উস্কোখুস্কো চুল, সকালবেলার 'ওয়াশ', মুখের চুনকাম, ঠোঁটের উপর উষার লালবাতি জ্বালান হয়নি। শুকনো মুখে যতখানি পারেন ম্লান হাসি হেসে বললেন, "পার্‌দোঁ, মসিয়ো, জ্‌ ন্‌ পার্ল পা লেঁদুস্তানি।" অর্থাৎ তিনি 'হিন্দুস্থানী' বলতে পারেন না। ইয়াল্লা। সরলা ফরাসিনী ভেবেছেন, প্লেনটা যখন হিন্দুস্থানী, আমি হিন্দুস্থানের কলকাতাতে প্লেনে উঠেছি, চেহারাও তদ্বৎ, অতএব আমি নিশ্চয়ই হিন্দুস্থানীতে কথা বলেছি। আমি অবশ্য প্রশ্নটি শুধিয়েছিলুম আমার সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত অতিশয় নিজস্ব 'বাঙাল' ইংরিজিতে। ওদিকে এ-তত্ত্বও আমার সবিশেষ বিদিত যে ফরাসীরা নটোরিয়াস একভাষী—ফরাসী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা শিখতে চায় না। তাদের উহ্য বক্তব্য, তাবল্লোক যখন হদ্দমুদ্দ হয়ে ফ্রান্সে আসছে, বিশেষ করে কড়ির দেমাক, বন্দুক-কামানের দেমাক, চন্দ্রজয়ের দেমাকে ফাটো ফাটো মার্কিন জাত এস্তেক প্যারিসে এসে ফরাসীর মত নাজুক্‌ জবান্‌ শেখবার ব্যর্থ চেষ্টায় হরহামেশা হাবুডুবু খাচ্ছে তখন ওদের আপন দেশে আপোসে তারা যে কিচিরমিচির করে সেগুলো শেখার জন্য

খামোখা উত্তম ফরাসী ওয়াইনে সুনির্মিত নেশাটি চটাবে কেন? তবু মহিলাটির উক্তি শুনে আমারো ঈষৎ ন্যাজ মোটা হল। দূর-দুনিয়ার ভারতীয় প্লেন সার্ভিস না থাকলে মহিলাটি কি কল্পনাও করতে পারতেন যে হিন্দুস্থানীও আন্তর্জাতিক ভাষা হতে চলেছে—খলিফে মুসাফির যে-রকম এ্যার ফ্রান্সে ফরাসী, কে এল এমে ডাচ্, বি ও এ সি-তে ইংরিজির জন্য তৈরী থাকে।

তখন পুনরপি আপন ঔন অরিজিনাল ফরাসীতে প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলুম। "আ—আ—! বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু এই সময়-সমস্যাটি ভারী 'কঁপ্লিকে' অর্থাৎ কম্প্লিকেটিড, জটিল। আমি ওটা নিয়ে মাথা ঘামাইনে।"

"তবু?"

"সব দেশ তো আর এক টাইম মেনে চলে না। ভোয়ালা!—নয় কি? প্যারিসে যখন বেলা বারোটা তখন রেঙ্গুনে—আমি সেখানে বাস করি—বিকেল পাঁচটা ছটা। কিন্তু আপনাকে ফের বলছি, ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি টাইম কত জেনে যাই আমার অতিশয় বিশ্বাসী মিনিস্ৎর্ দ্য লেতেঁরিয়রকে (হোম সেক্রেটারি, অর্থাৎ ভিতরকার 'ইন্টেরিয়ের' 'এঁতেরিয়র'-কে) শুধিয়ে। সোজা কথায় পেটটিকে। ওখানে যখন লামার্সেইয়েজ সঙ্গীত (বাঙলায় 'পেটে যখন হুলুধ্বনি') বেজে ওঠে তখন সেটা লাঞ্চের বা ডিনারের সময়। উপস্থিত আমার 'এঁতেরিয়রেতে' সে-সঙ্গীত ক্রেসেণ্ডতে (তার সপ্তকের পঞ্চমে)। তাই এখন রেঙ্গুনে নিশ্চয়ই দেড়টা দুটো।"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, "তা এখখুনি বোধ হয় লাঞ্চ দেবে।"

মাদাম যদিও বলেছেন তিনি টাইম নিয়ে মাথা ঘামান না, কিন্তু দেখলুম, তার প্র্যাকটিকাল দিকটা খাসা বোঝেন। আপত্তি জানিয়ে বললেন, "রেঙ্গুনে যখন লাঞ্চ তখন এই মিত্রোপাতে (মিৎ=মিড্ল্;

—রোপা, ইয়োরোপা-র শেষাংশ অর্থাৎ মধ্য-ইয়োরোপে) ব্রেকফাস্ট। জাপানে যারা এ-প্লেনে উঠেছে তাদের তো এখন ডিনারের সময় হয় হয়। সুতরাং কোন্ যাত্রী কোথায় উঠেছে, কার পেট কখন ব্রেকফাস্ট/লাঞ্চ/ডিনারের জন্য কান্নাকাটি শুরু করে সে-হিসেব রেখে তো আর কোম্পানি ঘড়ি ঘড়ি কাউকে লাঞ্চ, কাউকে সাপার, কাউকে স্যানউইচসহ বিকেলের চা দিতে পারে না। তবে কি না, এরা ব্রেকফাস্টে যে পরিমাণ খেতে দেয় সেটা কলেবরে প্রায় লাঞ্চের সমান।…তাই বলছি, এসব টাইম-ফাইম নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ট্রেনেও যদি ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িটার দিকে তাকান তবে সে জর্নি দীর্ঘতর মনে হয় না? আমি তো প্যারিসে পৌঁছতে পারলে বাঁচি। 'বঁ দিয়ো' (দয়ালু ঈশ্বর) ঘণ্টা দেড়েকের ভিতর পৌঁছিয়ে দেবেন। নাতনীটা নেতিয়ে গিয়েছে।"

মহিলাটি যে-ভাবে সবিস্তর গুছিয়ে বললেন সেটা ধোপে টেঁকে কি না বলতে পারবো না, কারণ আমি যত বার এসেছি গিয়েছি, আহারাদি পেয়েছি, তখন ঘড়ি মিলিয়ে দেখিনি কোন্টা লাঞ্চ কোন্টা কি? এবং আজকের দিনে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন টাইমের সালঙ্কার সটীক ফিরিস্তি দেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে। রেডিয়ো ট্রানজিস্টারের কল্যাণে এখন বাড়ির খুকুমণি পর্যন্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেয়, বুঝিয়ে বলে গ্রীনচ মীন টাইম, ব্রিটিশ সামার টাইম, সেণ্ট্রাল ইয়োরোপীয়ান টাইম, কোন্টা কি? তবু যে এতখানি লিখলুম, তার কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন টাইম যে কি ভাবে কসরৎ বিন্ মেহন্নৎ আয়ত্ত করতে হয় সেটা ফরাসী মহিলাটি আমাকে শিখিয়ে দিলেন অতি প্র্যাকটিকাল পদ্ধতিতে। সেটা কি? রাজা সলমন যেটা গুরুগম্ভীর ভাবে, ধর্মনীতি হিসেবে আপ্তবাক্য রূপে হাজার তিনেক বছর পূর্বে প্রকাশ করে গিয়েছেন 'নো দাইসেলফ্' 'নিজেকে চেনো (চিনতে শেখো)'। শ' বছর আগে লালন ফকিরও বলেছেন 'আপন চিনলে খুদা চেনা যায়।'

ফরাসী মহিলাটিও সেই তত্ত্বটিই, অতিশয় সরল ভাষায় প্রকাশ করলেন 'আপন পেটটিকে বিশ্বাস করো। তার থেকেই লোকাল টাইম, স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম, সর্ব টাইম জানা হয়ে যাবে। ঐটেই মোক্ষমতম ক্রনোমিটার।' বরঞ্চ ক্রনোমিটার মাঝে মধ্যে বিগড়োয়। আলবৎ, পেটেও বিগড়োয়। কিন্তু বিগড়নো অবস্থাতেও সে লাঞ্চ ডিনারের সময়টায় নিগেটিভ খবর দিয়ে জানিয়ে দেয়, তার ক্ষিদে নেই।

ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট না কি যেন এসে গেছে। মাদাম বলেছিলেন, "সেটা কলেবর"। আমি মনে মনে বললুম "বপু।" এ্যাব্বড়া বড়া ভাজা, সসিজ, পর্বত প্রমাণ ম্যাশ্‌ট্ পটাটো, টোস্ট-মাখন, মার্মলেড্, টমাটো ইত্যাদি কাঁচা জিনিস, আরো যেন কি কি। তখন দেখি, বেশ খাচ্ছি। অতএব পেটের ক্রনোমিটার বলছে এটা কলকাতার লাঞ্চ, অর্থাৎ বেলা একটা দুটো। ঘড়ি মিথ্যেবাদী, বলছে ন'টা।

৩

অজগাঁইয়া যেরকম ওয়াকিফ হবার চেষ্টা না দিয়েই ধরে নেয় দিল্লী মেলও তার ধেধ্‌ধেড়ে গোবিন্দপুর ফ্ল্যাগ্ ইস্‌টিশানে দাঁড়াবে এবং চেপে বসে নিশ্চিন্দি মনে তামুক টানে, আমার বেলাও হয়েছিল তাই। আমার অপরাধ আরো বেশী। আমি জেনে-শুনেই অপকর্মটি করেছিলুম। আমি ভালো করেই জানতুম, যে প্লেনে যাচ্ছি সেটা যদিও জর্মনির উপর দিয়ে উড়ে যাবে, তবু সে দেশের কোনো জায়গায় দানাপানির জন্যও নামবে না। অবশ্য এ্যার-ইণ্ডিয়ার মুরুব্বী আমার, এক গাল হেসে আমায় বলেছিলেন, "এ প্লেনটা কিন্তু প্যারিসে নামে। আপনি সেখানে চলে যান।

দু'চারদিন ফুর্তিফার্তি করে চলে যাবেন জর্মনি। খর্চা একই। আর প্যারিস—হেঁহেঁহেঁহে—" সঙ্গে যে মিত্রটি ছিলেন তিনিও মৃদু হেসে সায় দিলেন। দুজনারই বয়স এই তিরিশ পঁয়ত্রিশ। মনে মনে বললুম, এখন কলকাতা দিল্লীর রাস্তাঘাটেই যা দেখতে পাওয়া যায় প্যারিসের নাইট ক্লাব-কাবারে তার চেয়ে বেশী আর কি ভেল্কিবাজি দেখাবে? তদুপরি বানপ্রস্থে যাবার বয়সও আমার বহুকাল হল তামাদি হয়ে গিয়েছে। এ বয়সে 'নির্বাণদীপে কিমু তৈলদানং?' তাই আখেরে স্থির হল আমি এ্যার-ইণ্ডিয়া প্লেন থেকে সুইটজারলেণ্ডের জুরিচে (স্থানীয় ভাষায় ৎস্যুরিষ্) নামবো। হোথায় চেঞ্জ করে ভিন্ন প্লেনে মোকামে পৌঁছব—অর্থাৎ জর্মনির কলোন শহরে। তাই সই।

ফরাসিনীকে বিস্তর বঁ ভোয়াইয়াজ (গুড জর্নি, গুড ফ্লাইট) বলে জুরিচের এ্যার পোর্টে নেমে পাসপর্ট দেখালুম। তারপর গেলুম খবর নিতে কলোনে যাবার প্লেন কখন পাবো। উত্তর শুনে আমি স্তব্ধ, জড়। দেশে বলে,

"অল্প শোকে কাতর।
অধিক শোকে পাথর।"

তখন বেজেছে সকাল ন'টা। রামপণ্টক বলে কি না, কলোন যাবার প্লেন দ্বিপ্রহরে। বিগলিতার্থ আমাকে নিরেট তিনটি ঘণ্টা এখানে বসে বসে আঙুল চুষতে হবে।

শুনেছি, যে-রুগী দশ বৎসর ধরে পক্ষাঘাতে অসাড় অবশ সে নাকি মৃত্যুর সময় অকস্মাৎ বিকট মুখভঙ্গি করে, তার সর্বাঙ্গ খিঁচোতে থাকে, হঠাৎ দশ বৎসরের টান-টান-হাঁটু যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে খাড়া হয়ে থুতনির দিকে গোঁত্তা মারতে চায় এবং মুখ দিয়ে অনর্গল কথা বেরতে থাকে।

আমার হল তাই। আমি হয়ে গিয়েছিলুম অচল অসাড়। 'স্তম্ভিত' বললুম না, কারণ আজকের দিনের পয়লা নম্বরী এ্যার

পর্টে স্তম্ভ আদৌ থাকে না। যাই হোক যাই থাক্. আমার মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল আতশবাজির ঝটকা, তুবড়ির পর তুবড়ির হিংস্র হিস্ হিস্ আর পটকা, বোমার দুদ্দাড় বোম্‌বাম্। আর হবেই বা না কেন? যে জুরিচের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কর্ণ-পটহবিদারক তথা নয়নান্ধকারক আতশবাজি ছাড়ছি সেই আতশ-বাজিকেই আপন জর্মন ভাষায় বলে 'বেঙ্গালিশে বেলোয়েখ্‌টুঙ' অর্থাৎ 'বেঙ্গল রোশনী'; এবং এ-দেশের ফরাসী অংশে বলে 'ফ্য দ্য বাঙাল' অর্থাৎ 'ফায়ার অব বেঙ্গল'।[১] তদুপরি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ফরাসী ভাষায় বঙ্গদেশকে 'বাঙাল' রূপে উচ্চারণ করে। আমি বাঙাল বঙ্গসন্তান। আমি আমার 'জন্মনি, জন্মনি' অধিকার অর্থাৎ বার্থরাইট ছাড়বো কেন? ফায়ার ওয়ার্কস চালাবার যদি কারো হক্ক থাকে তবে সে আমার। হুহুঙ্কার ছাড়লুম:

"কি বললে? ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা আমাকে এই এ্যার পর্টে বসে কলোনের প্লেনের জন্য তাজ্জিম মাজ্জিম করতে হবে? আমার দেশ যে-ভারতবর্ষকে তোমরা অণ্ডর ডিভালাপ্‌ট্‌ কন্ট্রি—সাদামাটা ভাষায় অসভ্য দেশ—বলো সেখানেও তো তিন তিনটি ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় না, কনেকশনের জন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি রেলগাড়ির কথাই বলছি। আমি যদি আজ ভারতের যে-কোনো ডাকগাড়িতে করে যে-কোনো জংশনে পৌঁছুই তবে আধ ঘণ্টার ভিতর কনেকশন

---

১ আমার এক সুপণ্ডিত মিত্র বহু গবেষণার পর স্থির করেছেন: এদেশে গুড় তৈরী হত বলে এর নাম গৌড় (এবং গুড় থেকে 'রাম্' মদ তৈরী হত বলে তার নাম গৌড়ী—মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে—যেমন মধু থেকে মাধ্বী মদ)। এবং এই গুড় সর্বপ্রথম চীনদেশে রিফাইনড হয়েছিল বলে এর নাম চিনি (পরে মিশরে তৈরী চিনির নাম হল মিস্‌রি বা মিশ্রী)। তাঁর মতে বারুদ প্রথম আবিষ্কৃত হয় বাঙলা দেশে—আতশবাজীর জন্য। চীনদেশে সেটা সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহৃত হয় বলে চীনদেশকে বারুদের আবিষ্কারক বলা হয়—এবং সেটা ভুল।

পেয়ে যাই। না পেলে—সেটাও সাতিশয় কালে কস্মিনে—খবরের কাগজে জোর চেল্লাচেল্লি করি (মনে মনে বললুম—অস্মদ্দেশীয় রেলের কর্তারা তার থোড়াই কেয়ার করেন) এ্যারোপ্লেনের তো কথাই নেই। সে তো আরো তড়িঘড়ি কনেকশন দেয়। আমাকে যত তাড়াহুড়ো করে মোকামে পৌঁছে দিতে পারে, ততই তার লাভ অন্যত্র অন্য প্যাসেঞ্জারের সেবার্থে যেতে পারলে তার আরো দু'পয়সা হয়।···অ! তোমাদের বিস্তর ধনদৌলৎ হয়ে গিয়েছে বলে তোমরা আর পয়সা কামাতে চাও না? আর শোনো, ব্রাদার, এ তো হল ট্রেন প্লেনের কাহিনী। গোরুর গাড়ির নাম শুনেছ? বুলক কার্ট? সেই গোরুর গাড়িতে করে যদি আমি দশ বিশ মাইল যাই তবে সেখানে পৌঁছেও সঙ্গে সঙ্গে কনেকশন পাই। বোলপুর থেকে ইলামবাজার গিয়ে নদীর ওপারে তদ্দণ্ডেই অন্য গোরুর গাড়ির কনেকশন হামেহাল তৈরী। বস্তুত তখন ওপারের গাড়োয়ানরা গাহককে পাকড়াও করার জন্য যা হৈ-হুল্লোড় লাগায় তার সামনে আন্তর্জাতিক পাণ্ডা প্রতিষ্ঠানের জেরুজালেম-পাণ্ডারা পর্যন্ত নতমস্তক হন। এ-নিয়ে আমি অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত—থুড়ি, পাঁচখানা ইলিয়াড দশখানা ফাউস্ট লিখতে পারি। কিন্তু উপস্থিত সেটা স্থগিত থাক। আমার শেষ কথা এইবারে শুনে নাও। এই যে আমি কন্টিনেন্টে এসেছি তার রিটার্ন টিকিটের জন্য কত ঝেড়েছি জানো? এক একটা টাকা যেন নাক ফুটো করে কুরে কুরে বেরিয়েছে—তোমরা যাকে বলো, পেইং থ্রু দি নোজ্। রোক্কা ছ' হাজার পাঁচশটি টাকা। তারপর ফরেন এক্সচেন্জ্ গয়রহ হিসেবে নিলে দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে সাত হাজারের মত। এ ভূখণ্ডে থাকবো মাত্র তিনটি মাস। এইবারে হিসেব করো তো বসে, তবে বুঝি তোমার পেটে কত এলেম, এই যে কনেকশনের জন্য আমার তিনটি ঘণ্টা বরবাদ করল তার মূল্যটা কি? সে না হয় গেল। কিন্তু সে-সময়টা যে বন্ধুবান্ধবীর সান্নিধ্য

থেকে বঞ্চিত করলে তার জন্য তোমার হৃদয়বনে কোনো সন্তপানল প্রজ্বলিত হচ্ছে না? তারা—"

ইতিমধ্যে আমার চতুর্দিকে একটা মিনি মাক্সির মধ্যিখানের মিডি সাইজের ভিড় জমে গিয়েছে। ফ্রী এনটারটেনমেন্ট। আমার সোক্রোতেসপারা, কিংবা দ্রৌপদী যে-রকম রাজসভায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন সেই ধরনের যুক্তিজাল বিস্তার এদের হৃদয়-মনে যেন মলয়বাতাসের হিল্লোল, দে দোল দোল খেলিয়ে গেল। এদের বেশীর ভাগই আমার বেদনাটা সহানুভূতি সহ প্রকাশ করছে। "য়া য়া", "উই উই", "সি সি" যাবতীয় ভাষায় আমাকে মিডিসমর্থন জানাচ্ছে। আমি ফের তেড়ে এগুতে যাচ্ছি এমন সময়—

এমন সময় সর্বনাশ! একটি কুড়ি একুশ বয়সের কিশোরী, আমি যাকে কেছে মুছে ইস্ত্রি মেরে ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছি, কাউন্টারের পিছনের কুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বললে "আপনার টেলিফোন।" তন্মুহূর্তেই সেই মহাপ্রভু তিলব্যাজ না করে, যেন সসেমিরে দে ছুট দে ছুট। লোকটা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের "আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে" গানটি জানে।

কিশোরী এক গাল হেসে আমাকে শুধোলে, "আপনার জন্য কি করতে পারি, স্যর?"

দুত্তোর ছাই। আধ-ফোঁটা এই চিংড়ির সঙ্গে কি লড়াই দেব আমি।

"নাথিং বাট্ ইয়োর লভ্।" বলে দুমদুম্ করে লাউঞ্জের সুদূরতম প্রান্তে আসন নিলুম।

সোফাটা মোলায়েম। সামনে ছোট্ট একটি টেবিল।

বেজার মুখে বসে আছি। এমন সময় দেখি একজন বয়স্ক ভদ্রলোক দু' হাতে দুটি ভর্তি ওয়াইনগ্লাশ নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠিক যতখানি নিচু হয়ে অপরিচিত জনকে বাও করাটা কেতাদুরস্ত তাই করে শুধোলেন, "ভূ পেরমেতে, মসিয়ো"— অর্থাৎ "আপনার অনুমতি আছে, স্যর?" "নিশ্চয়, নিশ্চয়।" যদিও সোফাটির যা সাইজ তাতে পাঁচজন কিংকং অনায়াসে বসতে পারে তবু ভদ্রতা দেখাবার জন্য ইঞ্চিটাক সরে বসলুম। ভদ্রলোক ফের কায়দামাফিক বললেন "ন ভূ দের্‌াঁজে পা, জ ভূ প্রী"। এর বাঙলা অনুবাদ ঠিক কি যে হবে, অতখানি ফরাসী জানিনে, বাঙলাও না। মোটামুটি "না, না, ব্যস্ত হবেন না। ঠিক আছে, ঠিক আছে।" উর্দুতে বরঞ্চ খানিকটে বলা যায় "তকল্লুফ ন্ কীজীয়ে" ঐ ধরনের কিছু একটা। 'তকল্লুফ' কথাটা 'তকলীফ' (বাঙলায় কিছুটা চালু) অর্থাৎ 'কষ্ট'। মোদ্দা: "আপনাকে কোনো কষ্ট দিতে চাইনে।"

সেই দুটো গ্লাশ টেবিলে রেখে একটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আরেকটা নিজে তুলে নিয়ে বললেন, "আপনার স্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য।"

চেনাশোনা কিছুই নেই। খোদার খামোখা এ-লোকটা একটা ড্রিংক দিচ্ছে কেন? তবে কি লোকটা কনফিডেন্স ট্রিকস্টার? আমাদের হাওড়া শ্যালদাতে যার অভাব নেই। ভাবসাব (কনফিডেন্স) জমিয়ে বলবে "দাদা, তা হলে আপনি টিকিট দুটো কিনে আনুন। এই নিন আমার লিলুয়ার পয়সা, আমি মালগুলো সামলাই।"...টিকিট কেটে ফিরে এসে দেখলেন, ভোঁ ভাঁ। আপনার মালপত্র হাওয়া।

কিন্তু এ-লোকটা আমার নেবে কি? ৺সুকুমার রায় (?) একদা একটি ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন। বিরাট ভূঁড়িওলা জমিদার টিঙ-টিঙে দারওয়ানকে শাসিয়ে শুধোচ্ছেন, "চোর ভাগা কিঁও?" দারওয়ান বললে "মেরা এক হাতমে তলওয়ার দুসরেমে ঢাল। পকড়ে কৈসে?"—আমার এক হাতে তলওয়ার, অন্য হাতে ঢাল। ধরি কি করে?

আমার এক পাশে আমার মিত্রের দেওয়া এটাচি, অন্যদিকে এ্যার ইণ্ডিয়ার দেওয়া ছোট্ট একটি বাক্সো। দুটোই তো বগল-দাবা করে বসে আছি। লোকটাকে দেখে তো মনেও হচ্ছে না, ও স্বর্গত পি সি সরকার (এ স্থলে বলে রাখা ভালো সরকার কখনো এহেন অপকর্ম করতেন না) যে আমার দুটি বাক্স সরিয়ে ফেলবে। এবং সব চেয়ে বড় কথা, এ-রকম রুচিসম্মত পোশাক-আশাক আমি একমাত্র ডিউক অব উইণ্ডসরকে (উচ্চারণ নাকি উইনজার) পরতে দেখেছি—জীবনে একবার। ডিউকের জীবনে একবার নয়, আমার জীবনে একবার। সে বেশের বর্ণনা অন্যত্র দেব।

একখানা কার্ড এগিয়ে দিলেন। তাঁর নাম আঁদ্রে শ্যাপোঁ। তারপর এক গাল হেসে শুধোলেন, "যদি অপরাধ না নেন তবে একটি প্রশ্ন শুধোই, আপনি কি কস্‌টিঙে বিশেষজ্ঞ?"

আমি থতমত খেয়ে শুধোলুম, "কস্‌টিঙ? সে আবার কি?"

ভদ্রলোক আরো থতমত খেয়ে কিন্তু চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "সে কি মশাই! এই মাত্র আপনার অনবদ্য লেকচারটি শুনলুম, আপনি ক' হাজার টাকা ঝেড়ে কলকাতা থেকে এ-দেশে আসার রিটরন টিকিট কেটেছেন, এবং কনেকশন না পেয়ে তিন ঘণ্টাতে আপনার কি পরিমাণ অর্থক্ষয় হল তার পুরোপাক্কা, করেক্ট্ টু দি লাস্ট সাঁতিম, ব্যালানস শীট। একেই তো বলে কস্‌টিঙ। আমি ব্যবসাবাণিজ্য করি। ঐ নিয়ে নিত্যি নিত্যি আমার ভাবনা চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু সে কথা থাক। আমি

আপনার কাছে এসেছি একটি প্রস্তাব নিয়ে! আপনার যখন তিন ঘণ্টা বরবাদ যাচ্ছে তখন এক কাজ করুন না! মিনিট পনেরো পরে এখান থেকে একটা প্লেন যাচ্ছে জিনীভা: আমি সে প্লেনে যাচ্ছি। আপনি চলুন আমার সঙ্গে জিনীভায়। আমার সামান্য একটি বাড়ি আছে সেখানে। আপনার খুব একটা অসুবিধে হবে না। বেডরুম, বাথরুম, ডাইনিংরুম, স্টাডি সব নিজস্ব পাবেন। (আমি মনে মনে মনকে শুধালুম, একেই কি বলে 'সামান্য একটি বাড়ি'?) আমাদের সঙ্গে আহারাদি, দু' দণ্ড রসালাপ করে জিরিয়ে জুরিয়ে নেবেন। তারপর আপনাকে আপনার মোকাম, কলোনগামী প্লেনে তুলে দেব।" তারপর একটু ইতিউতি করে বললেন, "কিছু মনে করবেন না। আমি এ-প্রস্তাবটা নিজের স্বার্থেই পাড়ছি। আমার একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। ষোল, চোদ্দ, দশ। আপনার সঙ্গে আলাপচারী করে তারা সত্যই উপকৃত হবে। এদেশে চট করে একজন ইণ্ডিয়ান পাওয়া যায় না। পেলেও তিনি ফরাসী জানেন না। আর আমার বীবী খাসা রাঁধতে পারেন—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "কিন্তু এই দশ মিনিটের ভিতর আপনি আমার জন্য জিনীভার টিকিট পাবেন কি করে?"

মসিয়ো শ্যাপোঁ মুচকি হেসে বললেন, "সেই ফরমুলা, 'ন ভূ দের্যাঞ্জে পা'—আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। এটা ওটা ম্যানেজ করার কিঞ্চিৎ এলেম আমার পেটে আছে; নইলে ব্যবসা করি কি করে! কাচ্চা-বাচ্চারা বড় আনন্দ পাবে। প্লেনের ভাড়াটার কথা আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না—"

আমি ফের বাধা দিয়ে বললুম, "আপনি ও-বাবদে চিন্তা করবেন না। এ্যার-ইণ্ডিয়ার আমার টিকিটটি অমনিবাস, অর্থাৎ যেখানে খুশী সেখানেই যেতে পারি; তার জন্য আমাকে ফালতো কড়ি ঢালতে হবে না।" (পাঠক, এ ধরনের মোটর অমনিবাসকে কবিগুরু

নাম দিয়েছেন বিশ্বস্বহ। এবং তদীয় অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ মোটর গাড়ি, অটমবিলকে, যেটা আপন শক্তিতে চলে, তার নাম দিয়েছিলেন স্বতশ্চলশকট। অতএব এ স্থলে আমার যানবাহন প্লেনের টিকিটকে 'স্বতশ্চল বিশ্বস্বহ মূল্য পত্রিকা' অনায়াসে বলা যেতে পারে)।

একটু থেমে বললুম, "আমি এখখুনি আসছি।" অর্থাৎ যে-স্থলে যাচ্ছি, যেখানে রাজাধিরাজও ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারেন না, অর্থাৎ শৌচ্চাগার।

সেদিকে যাইনি। যাচ্ছিলুম অন্য পথে। এ্যাটাচি বাক্সো সোফাতেই রেখে এসেছি। এরকম সহৃদয় সজ্জনকে বিশ্বাস করে আমি বরঞ্চ ও দুটো হারাবো, অবিশ্বাস করতে ঘেন্না ধরে। গেলুম 'বার'-এ। সেখানে মসিয়ো যে ওয়াইন এনেছিলেন তারই দু' গ্লাশ কিনে ফিরে এলুম সোফায়। একটা গ্লাশ তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করে বললুন, "আপনার আন্তরিক আমন্ত্রণের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার একটা বড়ই অসুবিধে আছে। কলোন এ্যারপোর্টে আমার বন্ধুবান্ধবরা অপেক্ষা করছে। তারা খবর নিয়ে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছে, আমি তিন ঘণ্টা পরে কনেকশন পাবো। আমি আপনার সঙ্গে জিনীভা গেলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তারা বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।"

আর মনে মনে ভাবছি, ইহ সংসারে, এমনকি ইয়োরোপেও, সেই বাগদাদের আবু হোসেনও আছে যারা রাস্তায় অতিথির সন্ধানে দাঁড়িয়ে থাকে। সে একা একা খেতে পারে না।

মসিয়ো বড্ডই দুঃখিত হয়ে প্রথম বললেন, "কিন্তু আপনি আবার আমার জন্য ড্রিংক আনলেন কেন? এ কি দেনা-পাওনা!"

আমি মাথা নিচু করলুম। দ্যুপোঁ বললেন, "তা হলে দেশে ফিরে যাবার সময়ে আমার ওখানে আসবেন?"

তারপর একটি পকেট-বই বের করে বললেন, "কিছু একটা লিখে দিন। ছেলেমেয়েরা খুশী হবে।" আমি তৎক্ষণাৎ লিখলুম:

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

হায়! ফেরার পথেও হ্যপোঁর বাড়িতে যেতে পারিনি

৪

জুরিকের মত বিরাট এ্যারপর্টে কী করে মানুষ একে অন্যকে খুঁজে পায় সেটা বোঝবার চেষ্টা করে ফেল মেরেছি। তাহলে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে এখানকার কর্মচারীদের পেটেপিঠে এলেম আছে। তাদেরই একজন আমার সামনে এসে বললে, "আপনার জন্য একটা মেসেজ আছে, স্যার।" আমি সত্যই বিস্মিত হলুম। আমাকে এই সাহারা ভূমিতে চেনে কে? বললুম, "ভুল করেননি তো।" "এজ্ঞে না। আমি জানি—" সঙ্গে সঙ্গে ছোকরা আমার পুরো নামটি বলে দিল। যদিও সে এদেশেরই লোক তবু আমার মনে হল সে 'দেশ' পত্রিকার 'পঞ্চতন্ত্র' নিত্য সপ্তাহে পড়ে এবং তারই মারফত আমার তোলা নামটি পুরো পাকা রপতো করে নিয়েছে। হয়তো ডাকনামটাও জানে। হয়তো 'ভোম্বল' 'কাবলা' জাতীয় আমার সেই বিদকুটে ডাকনামটা সে পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনিতে প্রকাশ করতে চায় না কিন্তু এসব ভাববার চেয়ে ঢের বেশী জানতে চাই, কে আমাকে স্মরণ করলেন।

অ। ফ্রলাইন ফ্রিডি বাওমান! কিন্তু ইনি জানলেন কি প্রকারে যে আমি আজ সকালে এখানে পৌঁচচ্ছি। তাঁর মেসেজ খুলে জিনিসটে পরিষ্কার হল। কলকাতা ছাড়ার পূর্বে এ্যার ইণ্ডিয়ার ইয়াররা শুধিয়েছিলেন, জুরিকে আমার কোনো পরিচিতজন আছেন

কি না, কেননা ওখানে আমাকে কনেকশনের জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। খবর পাঠালে ওঁরা হয় তো এ্যারপর্টে এসে আমাকে সঙ্গসুখ দেবেন। আমি উত্তরে বলেছিলুম, জুরিকে নেই, তবে সেখান থেকে ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূরে লুৎসেন শহরে একটি পরিচিতা মহিলা আছেন এবং তাঁর নাম ঠিকানা দিয়েছিলুম। এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম বেবাক। "দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি" "গুড়ের পাটালি ; কিছু ঝুনো নারিকেল ;/দুই ভাণ্ড সরিষার তেল ;/আমসত্ত্ব আমচুর—" এর মাঝখানে কবিগুরু যদি তাঁর প্রিয় কন্যাকে ভুলে যান তবে সাতান্নটা হাবিজাবির মাঝখানে আমি যে এটা মনে রাখিনি তার জন্য সদয় পাঠক রাগত হবেন না।

কিন্তু এই সুবাদে সেই খাঁটি জাত সুইস মহিলাটির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিতে চাই। ফ্রিডি বাওমান। ১৯৪২/৪৩-এ ইনি সেই মহারাজা সয়াজী রাওয়ের বরোদা প্রাসাদে প্রবেশ করেন। আজকের দিনে ক্রিকেট কিংবা/এবং পলিটিকসের সঙ্গে যাঁদেরই সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন বরোদার শ্রীযুত ফতেহ সিংরাও গায়কোয়াড়কে। এই ফ্রিডির হাতেই তিনি পৃথিবীতে পদার্পণ করেন। অথবা মস্তকাবতীর্ণ করেন। কিন্তু তার উপর আমি 'জোর' দিচ্ছিনে। রাজা মহারাজা ভিখিরি আতুর পৃথিবীতে সবাই নামেন একই পদ্ধতিতে।

আসল কথা, ফতেহ সিং রাও মানুষ হন ফ্রিডির হাতে। তিনি অসাধারণ শিক্ষিতা রমণী—সেই ছাব্বিশ বছর বয়সেই। জর্মন, ফরাসী, স্প্যানিশ, ইংরাজি সব-কটাই বড় সুন্দর জানতেন। এ-দেশে এসেছিলেন বেকারীর জন্য নয়। রোমান্টিক হৃদয় : ইণ্ডিয়াটা দেখতে চেয়েছিলেন। গ্যোটে তাঁর প্রিয় কবি। গ্যোটের ভারতপূজা তাঁর মনে গভীর দাগ কেটেছিল। ওদিকে তাঁর উত্তম উত্তম পুস্তক পড়ার অভ্যেস চিরকালের। রাজপ্রাসাদের কাজকর্মও গুরুভার নয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে কি করে তাঁর প্রিয়সাধক

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণীর মর্মস্থলে পৌঁছে গেলেন সেটা বুঝলুম যেদিন তিনি আমাকে বললেন যে ছেলেবেলা থেকেই তিনি সেণ্ট ফ্রানসিস আসিসির ভক্ত। এবং সকলেই জানেন, এই সন্তটির সঙ্গেই ভারতীয় শ্রমণ, সন্ন্যাসী, সাধুসন্তের সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য। একদিকে যেমন দরিদ্রনারায়ণের সেবা, অন্যদিকে ঠিক তেমনি পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হয়ে প্রভু খৃষ্টের সঙ্গে একাত্ম বোধ করাতে তিনি এদেশের মরমীয়া সাধক, ইরাণ-আরব-ভারতের সুফীদের সঙ্গে এমনই হরিহরাত্মা যে অনেক সময় বোঝা কঠিন কার জীবনবৃত্তান্ত পড়ছি। খৃষ্টানের, ভক্তের না সুফীর ?

কিন্তু আমার কী প্রগলভতা যে আমি তাঁর জীবনীর সংক্ষিপ্ততম ইতিহাসও লিখতে পারি। 'দেশ' পত্রিকার প্রিয়তম লেখক শ্রীযুত ফাদার ছাতিয়েন যদি বাঙলায় তাঁর জীবনী লেখেন তবে গৌড়জন তাহা আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

* * *

কুমারী ফ্রিডির কথা পুনরায় লিখব। কনটিনেণ্ট সেরে, দেশে ফেরার পথে, লুৎসের্নে শ্রীমতীর বাড়িতে সপ্তাহাধিককাল ছিলুম— সেই সুবাদে। উপস্থিত ফ্রিডি লিখেছেন, তিনি আমার (এ্যার-ইণ্ডিয়া মারফত) টেলেক্স্ পেলেন কাল রাত্রে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জুরিকের এ্যারপর্টে ট্রাঙ্ক-কল করে জানালেন, আমি জুরিকে নেবেই যেন তাঁকে ট্রাঙ্ককল করি। বরাবর তিনি বাড়িতেই থাকবেন।

মনে হয় কত সোজা। কিন্তু যাঁরা দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে চান তাঁদের উপকারার্থে এ স্থলে কিঞ্চিৎ নিবেদন করে রাখি।

প্রথমত আপনাকে টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করতে হবে। সে বুথ আবার সদ্ ব্রাহ্মণ। আপন দেশজ খাদ্য ভিন্ন অন্য খাদ্য খান না। অর্থাৎ তাঁর বাক্সে আপনাকে ছাড়তে হবে এদেশের আপন সুইস মুদ্রা। অতএব গো-খোঁজা করুন, সে সাহারাতে. কোথায় সে পুণ্যভূমি যেখানে আপনার ডলার বা পৌণ্ডের বদলে

সুইস মুদ্রা দেবে। সবাই তো ইংরিজি বোঝে না। ভুল বুঝে অনেকেই। তারা কেউ বলে ঐ তো হোথায়, কেউ বলবে তার জন্য তো শহরে যেতে হবে। শেষটায় পেলেন সেই কাউন্টার পুণ্যভূমি —আমি অতি, অতি সংক্ষেপে সারছি। পেলেন সুইস বস্তু। তখন আবার ভুল করে যেন শুধু কাগজের নোট না নেন। কারণ ফোন বুথ কাগাজার্থযাশী নন; তিনি চান মুদ্রা। সেই মুদ্রা আবার ঐ সাইজের হওয়া চাই। ঠ্যাঙস ঠ্যাঙস করে চলুন ফের ঐ পুণ্যভূমিতে। আরো বহুবিধ ফাঁড়া-গর্দিশ আছে। বাদ দিচ্ছি।

আহ্! কী আনন্দ !! কী আনন্দ !!!

"কে বলছেন? আমি ফ্রিডি।"

"আমি সৈয়দ।"

ঐ য্ যা! ট্রাঙ্ক লাইন কেটে গেল। পাবলিক বুথ থেকে ট্রাঙ্ক-কল করা এক গব্বযন্ত্রনা। আমি যে দুটি মুদ্রা মেসিনে ফেলে লুৎসের্ন পেয়েছিলুম, তার ম্যাদ ফুরিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আর দুটো না ফেলার দরুণ লাইন কাট অফ্‌ফ। ফের ঢালো কড়ি।

অতি অবশ্য সত্য, ফোন্ যন্ত্রের বাকসে সুইটজারল্যাণ্ডে প্রচলিত তিন তিনটি ভাষা—ফরাসী, জর্মন এবং ইতালীয়—লেখা আছে কোন গুহ্য সরল পদ্ধতিতে যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হয়। লেখা তো অনেক কিছুই থাকে। ধর্মগ্রন্থে তো অনেক কিছুই লেখা থাকে। সেগুলো পড়লেই বুঝি মোক্ষ লাভ হয়। জিমনাস্টিকের কেতাব পড়লেই বুঝি কিঙ্কড় সিঙ-এর মত মাস্‌ল্ গজায়। প্র্যাকটিস করতে হয়। এবং তার জন্য খেসারতিও দিতে হয়। উপযুক্ত গুরু বিনা যোগাভ্যাস করতে গিয়ে বিস্তর লোক পাগল হয়ে যায়। আমি ইতিমধ্যে প্রায় দেড় টাকার মত খেসারতি দিয়ে "হ্যালো হ্যালো" করছি। আর, এ খেসারতির কোনো আন্তর্জাতিক মূল্য নেই। কারণ জর্মনি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রায় প্রত্যেক দেশই আপন আপন কায়দায় আপন আপন মেসিন চালায়। আর সেখানেই কি

শেষ? তিন মাস পরে যখন ফের সুইটজারল্যাণ্ডে আসবো, তখন দেখব, বাবুরা এ-ব্যবস্থা পালটে দিয়েছেন। নূতন কোন্ এক আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রটার ব্যবহার নাকি 'সরলতর' করেছেন। 'সরলতর' না কচু। তাই যারা এসব ব্যাপারে ওয়াকিফ-হাল নন, যারা এই হয়তো পয়লাবারের মত কন্টিনেন্ট যাচ্ছেন, তাদের প্রতি আমার 'সরলতম' উপদেশ, বিন্‌গুরু এসব যন্ত্রপাতি ঘঁ্যাটাতে যাবেন না। অবশ্য গুরু পাওয়া সর্বত্রই কঠিন; এখানে আরো কঠিন। যে যার ধান্দা নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে হন্তদন্ত। কে আপনাকে নিয়ে যাবে সেই বুথ-গুহায়, শিখিয়ে দেবে সে-গুহায় নিহিতং ধর্মস্য তত্ত্বং।

যাক্! ফের পাওয়া গিয়েছে লাইন।

"তুমি লুৎসের্নে কখন আসছো?"

"অপরাধ নিয়ো না। আমি উপস্থিত যাচ্ছি কলোন। তারপর হামবুর্গ ইত্যাদি। তারপর লণ্ডন, নটিংহাম সেখান থেকে ফেরার পথে লুৎসের্ন। তুমি খেদিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তোমার বাড়িতে।"

"হুৎ। কিন্তু তদ্দিনে এখানে যে বড্ড শীত জমে যাবে। গরম জামাকাপড় এনেছো তো? মাখ্‌ট্ নিষ্‌টস্ (নেভার মাইণ্ড—আসে যায় না), আমার কাছে আছে।"

"তুমি এখনো ফ্রানসিস আসিসীরই শিষ্যা রয়ে গিয়েছ—কী করে কাতর জনকে মদৎ করতে হয়, সে-ই তোমার প্রধান চিন্তা. আমি কি তোমার স্কার্ট ব্লাউজ পরে রাস্তায় বেরবো? সে-কথা থাক্। আমাকে এ্যারপর্টে আরো তিন ঘণ্টাটাক বসে থাকতে হবে। চলে এসো না এখানে। আজ তো রববার। তোমাকে আফিস দফতর করতে হবে না।"

"রববার। সেই তো বিপদ। বাড়ি থেকে যেতে হবে লুৎসের্ন স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে করে জুরিক। পঁয়ত্রিশ মাইল। সেখান থেকে বাস-এ করে তোমার এ্যারপর্টে। রববার বলে আজ

ঢের কম সার্ভিস। সব কটা উঠতি নাবতিতে টায় টায়, কোথায় পাবো কনেকশন—"

আমি মনে মনে বললুম, হুঁঃ। ফের সেই কনেকশন। ইলাম-বাজার রামপুরহাট।

ফ্রিডি বললে, "আচ্ছা দেখি।"

আমি বললুম, "কতকাল তোমাকে দেখিনি।"

* * *

ফ্রিডি যদি এখানে আসে-ই তবে তার বাস্ দাঁড়ায় কোথায়? আমি বসে আছি ট্রানজিট প্যাসেঞ্জারের খোঁয়াড়ে। এখানে তো ফ্রিডির প্রবেশ নিষেধ। অবশ্য সে এদেশের রীতিমত সম্মানিতা নাগরিকা (সংস্কৃত অর্থে নয়) সিট্‌জেন্। কাজেই সে স্পেশাল পারমিট যোগাড় করতে পারবে। তবে সেটা যোগাড় করতে করতে কতক্ষণ লাগবে, কে জানে? আম আনতে দুধ না ফুরিয়ে যায়। ততক্ষণে হয়তো আমার কলোন-গামী প্লেনের সময় হয়ে যাবে।

বাসস্ট্যাণ্ডে যেতে হলে আমাকে খোঁয়াড় থেকে বেরোতে হয়। কিন্তু আমাকে বেরুতে দেবে কি? খোঁয়াড়ের বাইরেই স্বাধীন, মুক্ত সুইটজারল্যাণ্ড। তার জন্য ভিজার প্রয়োজন। আমার সেটা নেই। তবু চেষ্টা করে দেখাই যাক না, কি হয় না হয়। সুকুমার রায় বলেছেন, "উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়।" সেইটে পড়ে আমার এক সখা ডাকপিয়নকে বলেছিল, "আমার কোনো চিঠি নেই? কি যে বলছো? ফের খুঁজে দেখো। উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়।"

খোঁয়াড়ের গেটে গিয়ে সেখানকার উর্দীপরা তদারকদারকে অতিশয় সবিনয় নিবেদন করলুম, "স্যর! আমি কি একটু বাইরে ঐ বাসস্ট্যাণ্ডে যেতে পারি?"

"আপনি তো ট্র্যানজিট। না?"

আমি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললুম, "বাস্-এ করে লুৎসের্ন থেকে আমার একটি বান্ধবী—"

হায় পাঠক, তুমি সেই তদারকদারের প্রতিক্রিয়া যদি তখন দেখতে। "বান্ধবী। বান্ধবী!! সেরতেন্মা (সার্টনলি) চের্‌ৎমান্‌তে (ইতালিয়ানে, সার্টন্‌লি)" এবং তার পর জর্মনে "জিষার জিশার" (শিওর, শিওর) এবং সর্বশেষে, যদি না কুল পায়, মার্কিন ভাষায় "শিঁয়োঁর, শিঁয়োঁ।"

আমি জানতুম, আমি যদি বলতুম, আমার বন্ধু আসছেন, সে বলতো, "নো।" যদি বলতুম আমার বীবী, উত্তর হত তদ্বৎ। যদি বলতুম, বৃদ্ধা মাতা তখনো হত "না"—হয়তো কিঞ্চিৎ থতমত করে। কিন্তু বান্ধবী! আমার সাতখুন মাফ!

৫

কলোনের নাম কে না শুনেছে? বিশেষ করে হেন ফ্যাশনেবল মহিলা আছেন কি যিনি কস্মিনকালেও প্রসাধনার্থে ও-ছ্য-কলোন—জর্মনের ক্যলনিশ ভাসার—কলনের জল ব্যবহার করেননি। বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি এই তরল সুগন্ধটির। '৪৭১১' এবং 'মারিয়া ফারীনা' এই দুইটিকেই সবচেয়ে সেরা বলে ধরা হয়। এ-দেশেও কলোন জল তৈরি হয় কিন্তু ওটা বানাতে হলে যে সাত আট রকমের সুগন্ধি ফুলের প্রয়োজন, তার কয়েকটি এদেশে পাওয়া যায় না—সর্বোপরি 'গ্রাক প্রণালী' তো আছেই। বিলেতেও কলোন জলের এতই আদর যে, হিটলারের সঙ্গে দেখা করার জন্য চেম্বারলেন যখন সপরিষদ কলোন থেকে মাইল বিশেক দূরে গডেসবের্গ-এর মুখো-মুখি, রাইন নদীর ওপারে যে বাড়িতে ওঠেন, তার প্রতি ঘরে কলোন জল, কলোন জলের সুগন্ধ দিয়ে নির্মিত গায়ে মাখার সাবান, দাড়ি

কামাবার সাবান, ক্রীম, পাউডার—বস্তুত প্রসাধনের তাবৎ জিনিস—রাখা হয়েছিল হিটলালের আদেশে। চেম্বারলেন এই সূক্ষ্ম বিদগ্ধ আতিথেয়তা লক্ষ্য করেছিলেন কি না জানিনে। কারণ তখন তাঁর শিরঃপীড়া তাঁর এ-অভিসার তাঁর দেশবাসী কি চোখে দেখবে। তাঁর আপন ফরেন অফিস যে সেটা নেকনজরে দেখছে না, সেটা তিনি জানতেন, কারণ ইতিমধ্যেই তারা একটা প্যারডি নির্মাণ করে ফেলেছে :

"ইফ অ্যাট ফার্স্ট ইউ কানট সাকসীড
ফ্লা ই ফ্লা ই এগেন।"

বলা বাহুল্য চেম্বারলেন ফ্লাই করে গিয়েছিলেন। আর আমি তো সেই গডসবের্গ-এর উপর দিয়ে কলোন পানে ফ্লাই করে যাচ্ছিই। সেই সুবাদে প্যারডিটি মনে পড়ল।

জুরিচে ফ্রিডির সঙ্গে মাত্র কুড়ি মিনিট কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলুম। মনটা খারাপ হয়ে আছে।

কলোন শহরের সঙ্গে আমার চল্লিশ বছরের পরিচয়।

এখান থেকে প্রায় চোদ্দ মাইল দূরে বন। সেখানে প্রথম যৌবনে পড়াশুনা করেছিলুম। ট্রামে, বাস-এ, ট্রেনে, জাহাজে করে এখানে আসা অতি সহজ। আমার একাধিক সতীর্থ কলোন থেকে বন ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করতো। তাদের সঙ্গে বিস্তর উইকএণ্ড করেছি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শহরটাকে দেখেছি।

সে-সব সবিস্তর লিখতে গেলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হবে। আর লিখতে যাবোই বা কেন? জর্মন টুরিস্ট ব্যুরো যদি আমাকে কিঞ্চিৎ 'ব্রাহ্মণ-বিদায়' করতো তবে না হয়—

যদি নিতান্তই কিছু বলতে হয়, তবে প্রথম নম্বর সম্বন্ধে বলি যে, সেটি আপনি চান কি না চান, কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। কলোনের বিরাট গগনস্পর্শী গির্জা। প্যারিসে যে-রকম যেখানেই যান না কেন, এ্যাফ্যাল টাওয়ারটা এড়াতে পারবেন না, কলোনের

এই কেথিড্রেলটির বেলাও তাই। তবে এ্যাফ্যাল স্তম্ভ বদখদ, কিন্তু কলোনের গির্জাচূড়ো তন্বঙ্গী সুন্দরী। যেন মা-ধরণী উর্ধ্বপানে দু বাহু বাড়ায়ে পরমেশ্বরকে তাঁর অনন্ত অবিচ্ছিন্ন নমস্কার জানাচ্ছেন।

এ গির্জা আবার আমাদের কাছে নবীন এক গৌরব নিয়ে ধরা দিয়েছে।

বছর দুত্তিন পূর্বে কলোনবাসী প্রায় শ' দুই তুর্কী ও অন্যান্য মুসলমান ঐ গির্জার প্রধান বিশপকে গিয়ে আবেদন জানায়, "এ-বছরে ঈদের নামাজ শীতকালে পড়েছে। বাইরে বরফ; সেখানে নামাজ পড়ার উপায় নেই। হুজুর যদি আপনাদের এই গির্জের ভিতরে আমাদের নামাজ পড়তে দেন, তবে আল্লা আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।" বিশপের হৃদয়কন্দরে কণামাত্র আপত্তি ছিল না —কিন্তু···? এ শহরের লোক খৃশ্চান। তাদেরই বিত্ত দিয়ে, গরিবের কড়ি দিয়ে এ-গির্জা সাত শ বছর আগে গড়া হয়েছে। এখনো ওদেরই পয়সাতে এ-মন্দিরের তদারকী দেখভাল চলে। সেও কিছু কম নয়। এরা যদি আপত্তি করে? কিন্তু এই বিশপটি ছিলেন বড়ই সন্ত-প্রকৃতির সজ্জন। এবং তার চেয়েও বড় কথা: সাহসী। তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। মা-মেরী মালিক। তিনি সর্বসন্তানের মাতা।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম। তাঁর কাছে কোনো প্রতিবাদপত্র এল না। খবরের কাগজেও এই অভাবনীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বেরুলো না। অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!! অবিশ্বাস্য!!!

কিন্তু মার্কিন 'টাইম' কাগজে বেরিয়েছে ও বিলেতেও বেরিয়েছে। তারপর সন্দ করে কোন্ পিচেশ!

* * *

কলোন এ্যারপর্টে নেমে দেখি, দুটো স্যুটকসের একটা আমার নেই। ছুট ছুট দে ছুট,—সেই ঘরের দিকে যেখানে 'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ' সম্বন্ধে তড়িঘড়ি ফরিয়াদ জানাতে হয়। নইলে চিত্তির। অবশ্য এরা নিজের থেকেই হয়তো দু পাঁচ দিনের

ভিতরই আমার বেওয়ারিশ জাতুকে খুঁজে পাবেন, কিন্তু আমি কোন মোকামে আস্তানা গাড়বো, তার ঠিকানাটা এদের না দিলে মাল হস্তগত হবে কি করে? সেটা তখন তার মালিককে হারাবে। কোন এক গ্রীক দার্শনিক নাকি বলেছেন, "একই নদীতে তুমি দুবার আঙুল ডোবাতে পারবে না, একই শিখায় দুবার আঙুল পোড়াতে পারবে না। কারণ প্রত্যেকটি বস্তু প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে।" মানলুম। কিন্তু একই স্যুটকেস নিশ্চয়ই দুবার, দুবার কেন দুশ বার হারাতে কোন বাধা নেই। অতি অবশ্য কবিগুরু বলেছেন, "তোমায় নতুন করে পাব বলেই হারাই ক্ষণেক্ষণ/ও মোর ভালবাসার ধন।।" কিন্তু প্রশ্ন, এটা কি হারানো বাক্সের বেলাও খাটে?

আপিস ঘরটি প্রমাণ সাইজের চেয়েও বৃহদায়তন। ভিতরে ফুটফুটে মেমসায়েব বসে আছেন। আমার লাগেজ টিকিট দেখাতেই তিনি মুচকি হেসে বললেন, "নিশ্চিন্ত থাকুন, ওটা খোওয়া যাবে না। কিন্তু বলুন তো ওটার ভিতর কি কি আছে?"

সর্বনাশ! সে কি আমি জানি? প্যাকিং করেছে আমার এক তালেবর ভাতিজা মুখুয্যে। তার বাপ প্রতি বৎসর নিদেন তিনবার ইয়রোপ-আমেরিকা যেতেন। সে নিখুঁত প্যাকিং করে দিত। আমার বেলা এ-বারে করেছে—নিখুঁততর। কোন্ বাক্সে কি মাল রেখেছে কি করে জানবো।

কিন্তু মিসি বাবা সদয়া। পীড়াপিড়ি করলেন না। আমার ঠিকানাটি টুকে নিলেন। আর ইতিমধ্যে বার বার বলছেন, "এ্যার ইণ্ডিয়া বলুন, লুফট-হানজা বলুন, সুঈসএ্যার বলুন কোনো লাইনেই কোন লাগেজ খোওয়া যায় না। আপনি পেয়ে যাবেনই যাবেন।"

আমি মনে মনে বললুম, "বট্যো!" বেরবার সময় তাকে বিস্তর ধন্যবাদ জানিয়ে সবিনয়ে বললুম, "গ্নেডিগেস ফ্রলাইন (সদয়া কুমারী)। একটি প্রশ্ন শুধোতে পারি কি?"

সুমধুর হাস্যসহ, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

আমি বললুম, "তাবৎ হারানো মালই যদি ফিরে পাওয়া যায়, তবে এ-হেন বিরাট আপিস আপনারা করেছেন কেন? আমি তো শুনেছি, কলোন এ্যার পোর্টের প্রতিটি ইঞ্চির জন্য দশ বিশ হাজার টাকা ছাড়তে হয়।"

প্রত্যুত্তরে প্রতীক্ষা না করেই এক লম্ফে দফতর থেকে বেরিয়ে মালসামান নিয়ে উঠলুম বিরাট এক বাস-এ।

বাঁচলুম, বাবা, বাঁচলুম। প্লেনের গর্ভ থেকে বেরিয়ে খোলা-মেলায় এসে বাঁচলুম। বাসটি যদিও পর্বতপ্রমাণ, সাগর করিবে গ্রাস হয় অনুমান, তবু চলছে যেন রোলস রইস—রইস খানদানী গতিতে, মৃদু মধুরে। কবিগুরু গেয়েছিলেন, 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসার ঘায়ে'—আমি গাইলুম, 'বাঁচালে তুমি মোরে ভালো বাস-এর ছায়ে।'

আহা কী মধুর অপরাহ্নের সূর্যরশ্মি। কখনো মেঘমায়ায় কখনো আলোছায়ায়। দু-দিকের গাছ পাতার উপর সে-রশ্মি কভু বা মেঘের ভিতর দিয়ে আলতো আলতো হাত বুলিয়ে যায়, কভু বা রুদ্রদীপ্ত হয়ে প্রচণ্ড আলিঙ্গন করে। ঐ হোথায় দেখছি, বুড়ো চাষা ঘাসের উপর শুয়ে আছে, চোখের উপর টুপি ঢেকে। তার সবুজ পাতলুন যেন ঘাসের ঝিলিমিলির সঙ্গে 'একতালে যায় মিলি'। এদেশের নবান্ন হতে এখনো বেশ কিছুদিন বাকি আছে। চতুর্দিকে অল্পবিস্তর ফসল কাটা হচ্ছে। আজ রববার। রাইন-ল্যাণ্ডের লোক বেশির ভাগই ক্যাথলিক। তাদের অধিকাংশই সেদিন সর্বকর্ম ক্ষান্ত দেয়। তাই ক্ষেত খামারে তেমন ভিড় নেই। ...আমিও মোকামে পৌঁছুতে পারলে বাঁচি। ইংরিজিতে প্রবাদ 'এ সিনার হ্যাজ নো সনডে।' 'পাপীর রববার নেই।' আমি তো তেমন পাপিষ্ঠ নই॥

বাস মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রামের ভিতর দিয়ে যায়। সেখানেও রাস্তা নির্জন। বাচ্চাকাচ্চারা কোথায়? তারা তো ক্লাইপে বা সুধালয়ে যায় না—সেখানে অবশ্যই আজ জোর কারবার, বেজায় ভিড়। আমার পাশের সীটে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে-ছিলেন। তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললুম, "স্যর, ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে আমি এসব গ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়েছি। তখন তো ছেলে-মেয়েরা রাস্তার উপর রোল-স্কেটিং করতো, দড়ি নিয়ে নাচতো, এমন কি ফুটবলও খেলতো। ওরা সব গেল কোথায়?"

বৃদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "একাধিক উত্তর হয়তো আছে। চট করে যেটা মনে আসছে সেটা বলতে গেলে বলি, বদ্ধ ঘরে টেলিভিশন দেখছে।"

আমি একটু ঘাড় চুলকে বললুম, "কিছু যদি অপরাধ না নেন, স্যর, তবে শুধবো, এটা কি সর্বংশে ভালো? ফার্সীতে একটি দোহা আছে:—

হর্ চে কুনী, ব্ খুদ্ কুনী
খা খুব্ কুনী, খা বদ্ কুনী॥
যা করবে স্বয়ং করবে
ভালো করো কিংবা মন্দই করো॥

এই যে প্যাসিভভাবে বসে বসে টেলি দেখা তার চেয়ে রাস্তায় অ্যাকটিভভাবে খেলাধূলো করা কি অনেক বেশী কাম্য নয়?"

গুণী এবারে চিন্তা না করেই বললেন, "নিশ্চয়ই। অবশ্য ব্যত্যয়ও আছে। যেমন মনে করুন, আমরা যখন মোৎসার্ট বা শপাঁ শুনি তখন তো আমরা প্যাসিভ। আর তাই বা বলি কি করে? বেটোফেনকে গ্রহণ করা তো প্যাসিভ নয়। ভেরি ভেরি অ্যাকটিভ কর্ম! কী পরিমাণ কনসানট্রেশন্ তখন করতে হয়, চিন্তা করুন তো! কিন্তু বাচ্চাদের কথা বাদ দিন—কটা বয়স্ক লোকই বা সে জিনিস করে?"

বুঝলুম লোকটি চিন্তাশীল। এঁকে খুঁচিয়ে আরো অনেক তত্ত্ব কথা জেনে নিই। বললুম, "তা টেলিতে প্রোগ্রাম কিছুই দেয় না?"

"তা হলে শুনুন, আপনাকে পুরো ফিরিস্তি দিচ্ছি। যদিও আমি ঐ যন্ত্রটির পূজোরী নই। পুরনো ফিল্ম, নয়া থিয়েটার, গর্ভপাতের সেমিনার আলোচনা, পাদ্রিদের বক্তৃতা (এ দুটো তিনি ঠিক পর পর বলেছিলেন সেটা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে), রাজনৈতিকদের সঙ্গে ইন্টারভ্যু, খেলা, কাবারে, ইটালি ভ্রমণ, চন্দ্রাভিযান, ভিয়েটনাম থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন, পার্লামেন্টে হ্যার ভিলি ব্রাণ্ট ও হ্যার শেলের বক্তৃতা—এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ঐ একই কেচ্ছা, একই অন্তরীণ খাড়াবড়িথোড়থোড়বড়িখাড়া (তিনি জরমনে বলেছিলেন 'একই ইতিহাস'—ডী জেল্‌বে গেশিষ্‌টে—)। সর্ববস্তু কুচি কুচি করে পরিবেশন। পরের দিনই ভুলে যাবেন, আগের দিন কি দেখেছিলেন—মনের উপর কোনো দানা কাটে না। পক্ষান্তরে দেখুন, বই পড়ার ব্যাপারে আপনি আপনার রুচিমত বই বেছে নিচ্ছেন।"

ইতিমধ্যে আমাদের বাস কতবার যে কত ট্রাফিক জামে কত মিনিট দাঁড়িয়েছে তার হিসেব আমি রাখিনি। অথচ এদেশের রিকশা, ঠ্যালা, গোরুর গাড়ি এমন কোনো কিছুই নেই যে-সব হযবরল আমাদের কলকাতাতে নিত্য নিত্য ট্রাফিক জ্যাম জমাতে কখনো স্বেচ্ছায় কখনো অনিচ্ছায়—বিশ্ববিজয়ী প্রতিষ্ঠান।

ভদ্রলোক বাইরের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "ঐ দেখুন, আরেক উৎকট নেশা। মোটর, মোটর, মোটর। প্রত্যেক জরমনের একখানা মোটর গাড়ি চাই। জরমন মাত্রই মোটরের পূজারী।"

আমার কেমন যেন মনে হল, আমরা বোধ হয় বন্ শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছি। কিছুটা চেনাচেনা ঠেকছে, আবার অচেনাও বটে। অথচ একদা এ শহর আমি আমার হাতের তেলোর

চেয়ে বেশী চিনতুম। আমি ভদ্রলোককে আমার সমস্যা সমাধান করতে অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, "এটা বনই বটে। তবে এ অঞ্চলটা গত যুদ্ধে এমনই বোমারু-মার খেয়েছিল যে এটাকে নতুন করে গড়া হয়েছে। তবে শহরের মধ্যিখানটা প্রায় পূর্বেরই মত মেরামত করে বানানো। আসল কথা কি জানেন, বমিঙের ফলে ঘিঞ্জি পাড়াগুলো যে নষ্ট হয়ে গেল সেগুলোকে ভালো করে, নতুন করে প্ল্যান মাফিক বানাবার চান্সটা আমরা মিস করেছি। তবে এই যে বললুম, শহরের মাঝখানটা মোটামুটি আগেরই মত—হার্ট অব দি সিটি—আর জানেন তো পুরানো হার্টের জায়গায় নতুন হার্ট বসানো মুশকিল। এই ধরুন লুটভিষ্ ফান বেটোফেন—"

আমি বললুম "ওই নামটার ঠিক উচ্চারণটা আমি আজো জানিনে।"

হেসে বললেন, "ঐ তো ফেললেন বিপদে। মাঝখানের Vanটা যে খাঁটি জর্মন নয় তা তো বুঝতেই পারছেন। ওঁরা প্রাচীন দিনের ফ্ল্যামিশ। তখন তারা 'ভান' না 'ফান' উচ্চারণ করতো কে জানে —অন্তত আমি জানিনে—"

আমি বললুম, "থাক, থাক। এবারে যা বলছিলেন তাই বলুন"

"সেই বেটোফেনের বাড়ি যদি বোমাতে চুরমার হয়ে যেত তবে সেখানে তো একটা পিরামিড গড়া যেত না।"

"এমন কি তাজমহলও না।"

* * *

ঝুম্ করে গাড়ি থেমে গেল। একি? ও। মোকামে পৌঁছে গিয়েছি। অর্থাৎ বন্ শহরে। এবং সবচেয়ে প্রাণাভিরাম নয়নানন্দদান দৃশ্য—যে পরিবারে উঠবো তারই একটি জোয়ান ছেলে ভিটরিষ্ উলানোফস্কি প্রবলবেগে হাত নাড়াচ্ছে। মুখে তিন গাল হাসি। পাশে দাঁড়িয়ে তার ফুটফুটে বউ। সে রুমাল দুলোচ্ছে।

৬

লক্ষ্মী ছেলে ডীটরিষ। তার মাঝারি সাইজের মোটরখানা এনেছে। আমার কোনো আপত্তি না শুনে বললে "আমি মালপত্র-গুলো তুলে নিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ বউয়ের সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নাও। ও তো আপনাকে চেনে না।" মেয়েটিকে বাড়ির কুশলাদি শুধোলুম। কিন্তু বড় লাজুক মেয়ে—কয়েকদিন আগে 'দেশ' পত্রিকায় যে সিগরেট-মুখী 'মডার্ন মেয়ের' ছবি বেরিয়েছে তার ঠিক উল্টোটি। কোনো প্রশ্ন শুধোয় না। শুধু উত্তর দেয়। শেষটায় বোধ হয় সেটা আবছা-আবছা অনুভব করে একটিমাত্র প্রশ্ন শুধোলে "বন্ কি খুব বদলে গেছে? আমি অবশ্য প্রাচীন দিনের বন্ চিনিনে। আমার বাড়ি ছিল ক্যোনিষবের্গে।"

সর্বনাশ! এবং পাঠক সাবধান।

ক্যোনিষবের্গ শহরটি এখন বোধ হয় পোলাণ্ডের অধীনে। ঐসব অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী বাস্তুহারা সর্বহারা হয়ে পশ্চিম জর্মনিতে এসেছে। তাদের বেশীর ভাগই সে-সব দুঃখের কাহিনী ভুলে যেতে চায়। কাজেই সাবধান। ওসব বাবদে ওদের কিছু জিজ্ঞেস করো না।

তবে এ তত্ত্বও অতিশয় সত্য যে মৌকামাফিক দরদ-দিলে যদি আপনি কিছু শুনতে চান তখন অনেক লোকেই, বিশেষ করে রমণীরা অনর্গল অবাধগতিতে সবকিছু বলে ফেলে যেন মনের বোঝা নামাতে চায়। বিশেষ করে বিদেশীর সামনে। সে দুদিন বাদেই আপন দেশে চলে যাবে। ও যা বলেছিল সেটা নিয়ে খামোখা কোনো ঘোটলার সৃষ্টি হবে না। আমি তাই বেমালুম চেপে গিয়ে বললুম, "ও! ক্যোনিষবের্গ। যেখানে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক

কান্ট্ জন্মেছিলেন। এবং শুনেছি তিনি নাকি ঐ শহরের বারো না চোদ্দ মাইলের বাইরে কখনো বেরোননি। শহরটাকে এতই ভালোবাসতেন।"···ইতিমধ্যে উটরিষ স্টিয়ারিঙে বসে গেছে এবং আমার শেষ মন্তব্যটা শুনেছে। বললে "ভালোবাসতেন না কচু। আসলে সব দার্শনিকই হাড়-আলসে।" আমি বললুম, "সে-কথা থাক। তোর বউ শুধোচ্ছিল, বন্ শহরটা কি খুব বদলে গেছে? তারই উত্তরটা দি। বদলেছে, বদলায়ও নি—"

"তুমি, মামা, চিরকালই হেঁয়ালিতে কথা কও—"

আমি বললুম, "থাক্, বাবা থাক্। বাস্-এ এক বৃদ্ধ বিষয়টির অবতারণা করতে না করতেই মোকামে পৌঁছে গেলাম। আর এ-তাবৎ দেখেছিই বা কি?"

* * *

বন শহরের নাম করলেই দেশী-বিদেশী সবাই বেটোফেনের নাম সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করে বটে, কিন্তু এ বৎসরে বিশেষ করে। কারণ তাঁর দ্বিশত জন্মশতবার্ষিকী সম্মুখেই। ডিসেম্বর ১৯৭০-এ। এ-শহর তাঁকে এতই সম্মান করে যে তাঁর সুন্দর প্রতিমূর্তিটি তুলেছে তাদের বিরাটতম চত্বরে, তাদের বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম না হলেও তারই কাছাকাছি প্রাচীন ম্যুনস্টার গির্জার পাশে। হয়তো তার অন্যতম কারণ, বেটোফেন ছিলেম সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরবিশ্বাসী। শুধু তাঁর সঙ্গীত নয়, তাঁর বাক্যালাপে চিঠিপত্রে সর্বত্রই তাঁর ঈশ্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস, প্রভুর পদপ্রান্তে তাঁর ঐকান্তিক আত্মনিবেদন বারবার স্বপ্রকাশ।

সেখানে থেকে কয়েক মিনিটের রাস্তা—ছোট্ট গলির ছোট্ট একটি বাড়ির ছোট্ট একটি কামরায় যেখানে তাঁর জন্ম হয়। বাড়ির নিচের তলায় বেটোফেন মিউজিয়ম। সেখানে তাঁর ব্যবহৃত অনেক

কিছুই আছে, যেমন ইয়াসনা পলিয়ানাতে তলস্তয়ের—বৃহত্তর, সম্পূর্ণতর, কারণ সেটা দেড়শ বছর পরের কথা এবং অসম্পূর্ণতম রবীন্দ্রনাথের উত্তরায়ণে, যদ্যপি সেটা তলস্তয়ের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে।...

কিন্তু সেখানে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী বেটোফেনের কানের চোঙা-গুলো। বত্রিশ বৎসর বয়স থেকেই তিনি ক্রমে ক্রমে কালা হতে আরম্ভ করলেন। বিধাতার এ কী লীলা! বীণাপাণির এই অংশাবতার আর তাঁর বীণা শুনতে পান না। তখন তিনি আরম্ভ করলেন ঐ-সব কানের চোঙা ব্যবহার করতে। পাঠক, দেখতে পাবে, তাঁর বধিরতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বাড়তে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোঙার সাইজও বাড়তে লাগলো। তাতে করে তাঁর কোনো লাভ হয়েছিল কি না বলা কঠিন। তবে এটা জানি, তার কিছুকাল পরে, যখন তাঁর সঙ্গীতপ্রেমী কোনো সহচর বলতেন, 'বাঃ! কী মধুর সুরেলা বাঁশী বাজিয়ে যাচ্ছে রাখাল ছেলেটি', আর তিনি কিছুই শুনতে পেতেন না তখন বেটোফেন বলতেন, তিনি তন্মুহূর্তেই আত্মহত্যা করতেন যদি না তাঁর বিশ্বাস থাকতো যে সঙ্গীতে এখনো তাঁর বহু কিছু দেবার আছে। আমাদের শ্রীরাধা যেরকম উদ্ধবকে বলেছিলেন, 'যদি না আমার 'বিশ্বাস' থাকতো, প্রভু একদিন আমার কাছে ফিরে আসবেন, তাহলে বহু পূর্বেই আমার মৃত্যু হয়ে যেতো।' এবং সকলেই জানেন, বদ্ধ কালা হয়ে যাওয়ার পরও বেটোফেন মনে মনে সঙ্গীতের রূপটি ধারণ করে বহুবিধ স্বর্গীয় রচনা করে গেছেন। যেগুলো তিনি স্বকর্ণে শুনে যেতে পাননি। আমি যেন কোথায় পড়েছি, তিনি সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে করুণ আবেদন জানাচ্ছেন, প্রভু যেন তাঁকে একবারের মত তাঁর শ্রুতিশক্তি ফিরিয়ে দেন যাতে করে তিনি মাত্র একবারের তরে আপন সৃষ্ট সঙ্গীত শুনে যেতে পান। তারপর তিনি সধন্যান্তঃকরণে পরলোকে যেতে প্রস্তুত।

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো। ডীটরিষ শুধলো, "মামা, কথা কইছ না যে!"

বললুম, "আমি ভাবছিলুম বেটোফেনের কানের চোঙাগুলোর কথা। ওগুলো সত্যি কি তাঁর কোনো কাজে লেগেছিল?"

ডীটরিষ বললে, "বলা শক্ত। কোনো কোনো আধাকালা একখানা কাগজের টুকরো দু' পাটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কাগজের বেশীর ভাগটা মুখের বাইরে রাখে। ভাবে, ধ্বনিতরঙ্গ ঐ কাগজকে ভাইব্রেট করে দাঁত হয়ে মগজে পৌঁছোয়, কিংবা কান হয়ে। কেউ বা সামনের দু পাটির চারটে দাঁত দিয়ে লম্বা একটা পেনসিল কামড়ে ধরে থাকে। কি ফল হয় না হয় কে বলবে?···আচ্ছা, মামু, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, কী রকম অদ্ভুত, প্রিমিটিভ মিনি সাইজের যন্ত্র দিয়ে তিনি তাঁর বিচিত্র সঙ্গীত রচনা করেছিলেন? আমার কাছে ভারি আশ্চর্য লাগে।"

আমি বললুম, "কেন বৎস, ঐ যে তোমার ছোট পিসি, যার সঙ্গে আমার চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব, লীজেল—দেখেছো, ঝড়তি-পড়তি কয়েক টুকরো লেটিসের পাতা, আড়াই ফোঁটা নেবুর রস আর তিন ফোঁটা তেল দিয়ে কিরকম সরেস স্যাল্যাড তৈরী করতে পারে? মুখে দিলে যেন মাখম!!···আর তোর আমার মত আনাড়ীকে যাবতীয় মশলাসহ একটা মোলায়েম মুর্গী দিলেও আমরা যা রাঁধবো সেটা তুইও খেতে পারবিনি, আমিও না। পিসি লীজেল কি বলবে, জানিনে। অথচ জানিস, ঐ অভুক্ত মুর্গীটি তাঁকে তখন দিয়ে দে। তিনি সেটাকে ছোট ছোট টুকরো করে যাকে ফরাসীরা বলে রাগু ফ্যাঁ, রা ফ্রিকাস্ অর্থাৎ লম্বা লম্বা ফালি-ফালি করে কেটে, মুর্গীটাতে আমরা যে-সব বদ-রান্নার ব্যামো চাপিয়েছিলুম সেগুলো রাইনের ওপারে পাঠিয়ে এ্যামন একটি রান্না করে দেবেন যে, প্যারিসের শ্যাফতক্ আমরি আমরি বলতে বলতে তরিয়ে তরিয়ে খাবে।··· প্রকৃত গুণীজন যা-কিছুর মাধ্যমে যা-কিছু সৃষ্টি করতে পারেন।

আমাদের দেশে একরকম বাদ্যযন্ত্র আছে। 'একতারা' তার নাম। তাতে একটি মাত্র তার। তার দুদিকে দুটি ফ্লেক্সিবল বাঁশের কৌশল আছে। সে দুটোতে কখনো জোর কখনো হাল্কা চাপ দিয়ে তার মাঝখানের তারটাকে প্লাক করে নাকি বিয়াল্লিশ না বাহান্নোটা নোট বের করা যায়। তবেই ছাখ। বেটোফেনের মত কটা লোক পৃথিবীতে আসে—আমাদের দেশেও গণ্ডায় গণ্ডায় তানসেন জন্মায় না। যদিও আমাদের দেশ তোদের দেশের চেয়ে বিস্তর বিরাটতর, এবং সেখানে কলাচর্যা আরম্ভ হয়েছিল অন্তত চার হাজার বছর পূর্বে। এবং আমাদের কলা জগতে আমরা এখন সাহারাতে। এবং—"

ডীটরিষ বললে, "তুমি আমাদের পার্লামেণ্ট হাউসটা দেখবে না। রাইনের পারে। আমি একটু ঘোরপথে যাচ্ছি। সোজা পথে গেলে দুপাঁচ মিনিট আগে বাড়ি পৌঁছতুম।"

"ছাখ ডীটরিষ, তোর পিসি নিশ্চয়ই বিস্তর কেক পেসট্রি আমাদের জন্য বানিয়ে বসে আছে—"

ডীটরিষের বউ বললে, "মামা, শুধু কেক পেসট্রি বললেন। ওদিকে পিসি কি কি বানিয়ে বসে আছেন, জানেন? ক্যোনিৎস-বের্গের ক্লপসে (ক্যানিসগবের্গ শহরের একরকম কোফ্‌তা), ফ্রাঙ্কফুর্টের সসিজ, হানোফারের ষাঁড়ের ন্যাজের শুরুয়া—"

আমি বাধা দিয়ে বললুন, "সে তো জানি। কিন্তু লীজেল পিসি আমার জন্যে কি ক্যাঙারু ন্যাজের শুরুয়া তৈরী করেছে?"...

দুজনাই তাজ্জব। আমি বললুম, "ষাঁড়ের ন্যাজের ভিতর থাকে চর্বি এবং মাংস। তার একটা বিশেষ স্বাদ থাকে। কিন্তু ষাঁড়ের ন্যাজ আর কতটুকু লম্বা? তার চেয়ে ক্যাঙারুর ন্যাজ ঢের ঢের বেশী। ওটা যদি পাঁচজনকে খাওয়ানো যায় তবে বিস্তর কড়ি সাশ্রয় হয়।"

ঘঁ্যাচ করে গাড়ি থামলো।

"এটা কি রে? মনে লয়, গোটা আষ্টেক বিরাট বিস্কুটের টিন একটার উপর আরেকটা বসিয়ে দিয়েছে।" বললুম আমি।

ডীটরিষ বললে, "এটাই আমাদের পার্লামেণ্ট।"

৭

যাকে বলে মডার্ন আর্ট, পিকাস্সো উপস্থিত যার পোপস্য পোপ, সেই পদ্ধতিটি জর্মনরা কখনো খুব পছন্দ করেনি। কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেলম যাকে এখনো মার্কিনিংরেজ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করে তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আর্ট এবং আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল: আর্ট হবে সুন্দর, আর্ট হবে সমাজসেবক, রাষ্ট্রসেবক, আর্ট মানুষের দুঃখদৈন্যের ছবি না এঁকে আঁকবে এমন ছবি, কম্পোজ করবে এমন সঙ্গীত, রচনা করবে এমন সাহিত্য যাতে মানুষ আপন পীড়াদায়ক পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে আনন্দসায়রে নিমজ্জিত হবে। আজকের দিনে আমরা এটাকে নাম দিয়েছি এসকেপিজম—পলায়নমনোবৃত্তি। বলা বাহুল্য জর্মন আর্টিস্ট—সাহিত্যিক সঙ্গীতস্রষ্টা—কাইজারের এই পথনির্দেশ খবরের কাগজে পড়ে স্তম্ভিত হন। তাহলে আর্টিস্টের কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। সে তার আপন সুখ দুঃখ, আপন বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আপন হৃদয়ে উপলব্ধ ভবিষ্যতের আশাবাদী চিত্র অঙ্কন করতে পারবে না। সে তা হলে রাষ্ট্রের ভাঁড়, ক্লাউন! তার একমাত্র কর্তব্য হল জনসাধারণকে কাতুকুতো দিয়ে হাসানো!

কিন্তু জর্মন জনসাধারণ কাইজারের কথাই মেনে নিল। এটা আমার ব্যক্তিগত মত নয়। এই পরিস্থিতিটা বোঝাতে গিয়ে

প্রখ্যাত জর্মন সাংবাদিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক শ্রীযুত য়োখিম বেসার বলেছেন, জর্মন মাত্রই উপরের দিকে তাকায়; রাজা কি হুকুম দিলেন সেই অনুযায়ী কাব্যে চিত্রে সঙ্গীতে আপন রুচি নির্মাণ করে।

১৯১৮-এ কাইজার যুদ্ধে হেরে হল্যাণ্ডে পলায়ন করলেন।

তখন সত্য সত্য আরম্ভ হল 'মডার্ন আর্টের' যুগ। যেন কাইজারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করার জন্য আর্টিস্টরা আরম্ভ করলেন রঙ নিয়ে নিত্য নব উন্মাদ নৃত্য, ধ্বনি নিয়ে সঙ্গীতে তাণ্ডব একসপেরিমেণ্ট, ভাস্কর্যে বিকট বিকট মূর্তি যার প্রত্যেকটাতেই থাকত একটা ফুটো (তার অর্থ বোঝাতে গেলে পুলিশ আমাকে জেলে পুরবে)। আমি ঐ সময়ে জর্মনিতে ছিলুম। মডার্নদের পাল্লায় পড়ে একদিন একটা চারুকলা প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে একলম্ফে পুনরপি বেরিয়ে এসেছিলুম। একদা যে-রকম কোন এক জুতে বকা পাঁঠার খাঁচার সামনে থেকে বিদ্যুৎগতিতে পলায়ন করেছিলুম। বোটকা গন্ধে।

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে সেখানে উত্তম দ্রষ্টব্য কিছুই ছিল না। নিশ্চয়ই ছিল। রাস্তার ডাস্টবিন খুঁজলে কি আর খান দুই লুচি, একটা আলুর চপ পাওয়া যায় না? কিন্তু আমার এমন কি দায় পড়েছে।

এরপর ১৯৩৩-এ এলেন হিটলার। তাঁর কাহিনী সবাই জানেন। কিন্তু আর্ট সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সবাই হয়তো জানেন না; তাই সংক্ষেপে নিবেদন করছি। হিটলার সর্বক্ষণ কাইজারকে অভিসম্পাত দিতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কাইজার যদি কাপুরুষের মত হার না মেনে লড়ে যেতেন তবে জর্মনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করতোই করতো।...অথচ আর্ট সম্বন্ধে দেখা গেল হিটলার কাইজার সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন। তিনি কঠিনতর কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বারংবার বলে যেতে লাগলেন 'আর্ট হবে সমাজের

দাস, অর্থাৎ নাৎসিদের দাস। সূর্যনিম্নে এই পৃথ্বীতলে তারা যে স্থায়সম্মত আসন খুঁজছে তারই সেবা করবে আর্টিস্টরা।'

কাইজারের চরম শত্রুও বলবে না তিনি অসহিষ্ণু লোক ছিলেন। তাঁর আমলে তাঁর নির্দেশ সত্ত্বেও যাঁরা মডার্ন ছবি আঁকতো তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো প্রকারেরই কোনো-কিছু করেননি।

কিন্তু হিটলার চ্যানসেলার হওয়ার পর আরম্ভ হল এঁদের উপর নির্যাতন। উত্তম উত্তম ছবি, নব নব সঙ্গীত ব্যান করা হল। সেরা সেরা পুস্তক পোড়ানো হল—কারণ এগুলো নাৎসি সঙ্গীতের সঙ্গে এক সুরে এক গান গায় না। আমি দূর থেকে এরকম একটা অগ্নিযজ্ঞ দেখেছিলুম। কাছে যাইনি। পাছে প্রভুরা আমার রঙ দেখে আমাকে ইহুদি ঠাউরে আমার নাকটা না কেটে দেন। যদিও আমার নাকটি খাঁটি মঙ্গোলীয়ন। খাটো, বেঁটে, হ্রস্ব। কিন্তু বলা তো যায় না।

হিটলার তাঁর সাধনোচিত ধামে গেছেন। এখন জর্মনরা উঠে পড়ে লেগেছেন 'মডার্ন' হতে। চোদ্দতালা বাড়ি ভিন্ন অন্য কথা কয় না।

তাই এই বিস্কুটটিনপারা পার্লিমেণ্ট।

ডীটরিষকে বললুম, "জানো, ভাগিনা, আমাদের দেশেও এ ধরনের স্থাপত্য হুশ হুশ করে আকাশ পানে উঠছে। তারই এক আর্কিটেকট্ এসেছেন আমাদের সঙ্গে তাস খেলতে। ভদ্রলোক সিগার খান। বর্ষাকাল। সিগার গেছে মিইয়ে। ঘন ঘন নিভে যায়। ভদ্রলোক দেশলাই খোঁজেন।···খেলা শেষ হল। তখন কেন জানিনে তিনি তাঁর দেশলাই আর খুঁজে পান না। আমাদের এক রসিক বন্ধু বসে বসে খেলা দেখছিল। সে দরদী কণ্ঠে বললে, 'দাদাদের কাছে আমার অনুরোধ, আর্কিটেকট্ মশায়ের মডেলটি

তোমরা কেউ গাপ্‌ মেরো না। দেশলাইটির মডেল থেকেই তো তিনি হেথাহোথা সর্বত্র বিয়াল্লিশ তলার বিলডিং হাঁকাচ্ছেন। ওটা গায়েব হলে ওঁয়ার রুটি মারা যাবে যে'।"

ডীটরিষ বললে, "জানো, মামু, আমাদের বিশ্বাস প্রাচ্যদেশীয়রা বড্ডই সীরিয়াস। সর্বক্ষণ গুমড়ো মুখ করে, লর্ড বুদ্ধের মত আসন নিয়ে শুধু আত্মচিন্তা মোক্ষানুসন্ধান করে। তারাও যে রসিকতা করে এ কথা ৯৯.৯% জর্মন কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। অথচ তোমার এই বন্ধুটির রসিকতাটি শুধু যে রসিকতা তাই নয়। ওতে গভীর দর্শনও রয়েছে। মডার্ন আর্কিটেকচর সম্বন্ধে মাত্র ঐ একটি দেশলাই দিয়ে তিনি তাঁর তাচ্ছিল্য সিনিসিজম সহ প্রকাশ করলেন কী সাতিশয় সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে। ভদ্রলোক কি তোমার মত লেখেন টেখেন—লিতেরাত্যোর ?"

আমি বললুম, "তওবা, তওবা! ভদ্রলোক ছিলেন আমাদের ফরেন অফিসের ডেপুটি মিনিস্টার; পণ্ডিত নেহরুর সহকর্মী। খুব বেশী দিন কাজ করেননি। ঐ সব দার্শনিক সিনিক্ রসিকতা তিনি সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ করতেন তাঁর ভিন্ন ভিন্ন সহকর্মী মন্ত্রীদের সম্বন্ধে। ঠিক পপুলার হওয়ার পন্থা এটা নয়—কি বলো ? কাজেই তিনি যখন ফরেন অফিস থেকে বিদায় নিলেন তখন আমি বলেছিলুম, তিনি মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিদায় নেবার সময় উল্লাসে নৃত্য করলেন এবং মন্ত্রিমণ্ডলীও তাঁর থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে উল্লাসে নৃত্য করলেন।"

ডীটরিষ চুপ। আমি একটু অবাক হলুম। সে তো সব সময়ই জুৎমাফিক উত্তর দিতে পারে।

সে বললে "আমার অবস্থাও তাই। যে আফিসে আমি কাজ করি সেটা থেকে বেরুতে পারলে আমিও খুশি হই; ওরাও খুশি হয়।"

৮

ঐ তো সামনে গোডেস্‌বের্গ। ডীটরিষ শুধোলে, "মামু, পিসি বলছিল তুমি নাকি এই টাউনটাকে জর্মনির সর্ব জায়গার চেয়ে বেশী ভালোবাসো? কেন, বলো তো।"

আমি মুচকি হেসে কইলুম, "যদি বলি তোর পিসির সঙ্গে হেথায় আমার 'প্রথম প্রণয়' হয়েছিল বলে?"

ডী। "ধ্যত! আমি ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য করেছি, লীজেল পিসির ধ্যানধর্ম শুধু কাজ আর কাজ। ফাঁকে ফাঁকে বই পড়া। এবং সে-বইগুলোও দারুণ সিরিয়স। বড় পিসি বরঞ্চ মাঝে মাঝে হালকা জিনিস পড়তো। কিন্তু ছোট পিসি ওসবের ধার ধারতো না। সে যেতো প্রতি প্রভাতে ট্রামে চড়ে বন্ শহরে—যেখানে সে চাকরী করতো—"

আমি। "সেই সূত্রেই তো আমাদের পরিচয়। আম্মো ঐ সকাল আটটা পনেরোর ট্রামে বন্ যেতুম। আমরা আর সবাই দু'তিনটে সিঁড়ি বেয়ে ট্রামে উঠতুম। আর লীজেল পিসি ডান হাতে এক-খানা বই আর বাঁ হাতে ট্রামের গায়ে সামান্যতম ভর করে সিঁড়ি গুলোকে 'তাচ্ছিলি' করে এক লম্ফে উঠতো ট্রামের পাটাতনে। উঠেই এক গাল হেসে ডাইনে বাঁয়ে সমুখ পানে তাকিয়ে বলতো 'গুটেন্ মর্‌গেন্' "সুপ্রভাত"। ওর ঐ লম্ফ মেরে ওঠার কৈশল দেখে আমি মনে মনে বলতুম, একদম 'টম বয়'! ওর উচিত ছিল মার্কিন মুল্লুকে 'কাউ বয়' হয়ে জন্ম নেবার। অথবা 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন'—গুরুদেবের ভাষায়।"

গোডেসবের্গে তখন অতি ক্ষুদ্র শহর। সবাই সবাইকে চেনে। কিন্তু আসল কথা, ঐ আটটা পনেরোর ট্রামে থাকতো পোনেরো

আনা কাচ্চাবাচ্চা। ইস্কুলে যাচ্ছে বন্ শহরে। এরা সবাই জানতো যে লীজেল পিসির, অবশ্য তখনো তিনি 'পিসি' খেতাব পাননি, কাছে আছে লেবেনচুস্, দু'একটা আপেল, হয়তো নবাগত মার্কিন চুঈংগাম, মাঝে মধ্যে চকলেট। কাজেই বাচ্চারা সমস্বরে, কোরাস কণ্ঠে বলতো, অন্তত বার তিনেক "সুপ্রভাত—"। তার পর সবাই তার চার পাশে ঘিরে দাঁড়াত। সবাই বলতো, "প্লীজ, এজ্ঞে এজ্ঞে, এই এখানে বসুন"।

আমি বললুম, "বুঝলি ডীটরিষ, তোর পিসি লীজেল ছিল আমাদের হীরইন অব্ দ প্লে। তবে তুই ঠিকই বলেছিস ও কখনো প্রেম ফ্রেমের ধার ধারতো না। আমি দু'একবার তার সঙ্গে হাফাহাফি ফ্লার্ট করতে গিয়ে চড় খেয়েছি। অথচ আমাদের মধ্যে প্রীতিবন্ধুত্ব ছিল গভীর। আমাকে কত কী না খাইয়েছে—ঐ অল্প বয়সেই বেশ দু'পয়সা কামাতো বলে। তখনকার দিনে ছিল—এখনো নিশ্চয়ই আছে—একরকমের বেশ মোটা সাইজের চকলেট—ভিতরে কন্যাক্। বড্ড আক্রা। কিন্তু খেতে—ওঃ! কী বলবো—মুখে ফেলে সামান্য একটু চাপ দাও। ব্যস হয়ে গেল। ভিজে ভিজে চকলেট আর তরল কন্যাকে মিশে গিয়ে, ছাখ তো না ছাখ, চলে গেল একদম পেটের পাতালে। কিন্তু যাবার সময় ঐ যে কন্যাক্—তোরা যাকে বলিস ব্র্যানট্ভাইন, ইংরিজিতে ব্র্যাণ্ডি, নাড়িভূঁড়ির প্রতিটি মিলিমিটার মধুর মধুর চুলবুলিয়ে বুঝিয়ে দিতো, যাচ্ছেন কোন মহারাজ! ···আর মনের মিলের কথা যদি তুলিস তবে বলবো, লীজেল ছিল বড্ডই লিব্রেল। তাই যদিও নাৎসিরা তখনো ক্ষমতা পায়নি কিন্তু রাস্তাঘাটে দাবড়াতে আরম্ভ করেছে—পিসি সেটা আদৌ পছন্দ করতো না। আমিও না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ইংরেজ যে ইতিমধ্যেই হিটলার বাবদে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে সেটা আমার চিত্তে পুলক জাগাতো। পিসিও সেটা জানতো। ভারতবর্ষের পরাধীনতার কথা উঠলেই সে ব্যথা পেত। বলতো, 'ও কথা থাক না।' ওরকম

দরদী মেয়ে চিনতে পারার সৌভাগ্য আমি ইহসংসারে অতি অল্পই পেয়েছি।"

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, ভাগিনা ডীটরিষ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে। শুধোলুম, "কি হল রে? তুই কি পরশুদিনের হাওয়া খেতে চলে গিয়েছিস?"

কেমন যেন বিষণ্ণ কণ্ঠে ভেজাভেজা গলায় সে বললে, "মামা, তুমি বোধ হয় জানো না, আমার বাবা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ওপারে চলে গেল কি করে।"

ডীটরিষের এখন যৌবনকাল। ওর বাপ কেন, ঠাকুর্দাও বেঁচে থাকলে আশ্চর্য হবার মত কিছু ছিল না। বললুম, "আমি তো জানিনে ভাই। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, আবার হচ্ছেও না। কারণ তোর গলাটা কি রকম যেন ভারী ভারী শোনাচ্ছে---"

"তুমি এইমাত্র বললে না, তুমি পিসি দুজনাই নাৎসিদের পছন্দ করতে না। বস্তুত পিসি-পরিবারের কেউই নাৎসি ছিল না। যদিও আমি তোমার বান্ধবীকে পিসি বলে পরিচয় দিয়েছি, আসলে তিনি আমার মাসি। তাঁরা তিন বোন। আমার মা সকলের ছোট। তিনি বিয়ে করলেন এক নাৎসিকে---কট্টর নাৎসিকে। কেন করলেন জানিনে। প্রেমের ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিল। বাড়ি গিয়ে তোমাকে তার ডাইরিটি দেখাবো। আর চেহারাটি ছিল সুন্দর—"

বাধা দিয়ে বললুম, "সে তোর চেহারা থেকেই বোঝা যায়।"

"থ্যাঙ্কউ। আর বাবা ছিল বড্ডই সদয়-হৃদয়—"

"ভাগিনা, কিছু মনে করো না। আমি মোটেই অবিশ্বাস করি না যে তোর পিতা অতিশয় করুণ হৃদয়, শান্তস্বভাব ধরতেন—তোর দুই মাসিই সে-কথা আমাকে বারংবার বলেছে। কিন্তু আবার বলছি কিছু মনে করো না, তাহলে তিনি নাৎসিদের কনসানট্রেশন ক্যামপ সয়ে নিলেন কি করে?"

ডীটরিষ চুপ মেরে গেল। কোন উত্তর দেয় না। আমি এবার, বহুবারের পর আবার, বুঝলুম যে আমি একটা আস্ত গাড়োল। এ রকম একটা প্রশ্ন করাটা আমার মোটেই উচিত হয়নি। বললুম "ভাগিনা, আমি মাফ চাইছি। আমি আমার প্রশ্নটার কোনো জবাব চাইনে। ওটা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

ডীটরিষ বললে, "না, মামু। তুমি যা ভেবেছো তা নয়। আমি ভাবছিলুম, সত্যই তো, বাবা এগুলো বরদাস্ত করতো কি করে? এবং আরো লক্ষ লক্ষ জর্মন? এই নিয়ে আমি অনেকবার বহু চিন্তা করেছি। তুমি জানো, মার্কিনিংরেজ রুশ-ফরাসী ন্যুরেনবের্গ মোকদ্দমায় বার বার নাৎসিদের প্রশ্ন করেছে, 'তোমরা কি জানতে না যে হিটলার কনসানট্রেশন ক্যামপে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে খুন করছে?' উত্তরে সবাই গাঁইগুঁই করছে। সোজা উত্তর কেউই দেয়নি। জানো তো যুদ্ধের সময় কত সেনসর্ কত কড়াকাড়ি। কে জানবে কি হচ্ছে না হচ্ছে। আমার মনে হয়, আবার বলছি জানিনে, বাবার কানে কিছু কিছু পৌঁচেছিল। কিন্তু বাবা তখন উন্মত্ত। তিনি চান জর্মনির সর্বধিকার। তাঁর ডাইরিতে বার বার বহুবার লেখা আছে, ইংরেজ কে? সে যে বিরাট বিশ্ব শুষে খেতে চায় তাতে তার হক্কো কি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মানি, তারা যদি আমাদের কিংবা ফরাসীদের মত কল্‌চর্‌ড জাত হত তবে আমরা এ-নিয়ে কলহ করতুম না। কিন্তু ইংরেজ জাতটাই তো বেনের জাত। তারা কলচারের কি বোঝে! ওদের না আছে মাইকেল এঙ্গেলো, না আছে বেটোফেন। আছে মাত্র শেকসপীয়র। ওদের না আছে স্থাপত্য, না আছে ভাস্কর্য, না আছে—" হঠাৎ বললো "ঐ তো বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি।"

৯

—"ডু হালুঙ্কে"—সোল্লাসে হুহুঙ্কারে রব ছাড়লো শ্রীমতী লীজেল। "তুই গুণ্ডা—"

আমরা যেরকম কোনো দুরন্ত ছোট বাচ্চাকে আদর করে 'গুণ্ডা' বলে থাকি 'হালুঙ্কে' তাই। শব্দটা চেক ভাষাতে জর্মনে প্রবেশ লাভ করেছে। গত চল্লিশ বছর ধরে দেখা হলেই লীজেল এইভাবেই আমাকে 'অভ্যর্থনা' জানিয়েছে।

তারপর আমাকে জাবড়ে ধরে দু'গালে দুটো চুমো খেল।

ডীটরিষ মারফত পাঠককে পূর্বেই বলেছি লীজেল ছিল ন'-সিকে 'টম-বয়'। এবং দু'একবার তার সঙ্গে হাফাহাফি ফ্লার্ট করতে গিয়ে চড় খেয়েছি। তবে এটা হল কি প্রকারে? শুচিবায়ুগ্রস্ত পদীপিসীরা ক্ষণতরে ধৈর্য ধরুন। বুঝিয়ে বলছি। এই ষাট বছর বয়সে তার কি আর 'টমবয়ত্ব' আছে? এখন আমাকে জাবড়ে ধরে আলিঙ্গন করাতে সে শুধু তার অন্তরতম অভ্যর্থনা জানালো।

আমি মনে মনে বললুম, চল্লিশ বছর ল্যাটে, চল্লিশ বছর ল্যাটে। এই আলিঙ্গন-চুম্বন চল্লিশ বছর পূর্বে দিলেই পারতে, সুন্দরী। পরে তাকে খুলেও বলেছিলুম।

ইতিমধ্যে ডীটরিষ আমতা আমতা করে বললে, "আমরা তা হলে আসি। রাত্রের পার্টিতে দেখা হবে।"

ওরা পাশেই থাকে। তিন মিনিটের রাস্তা। ওদের ভাব থেকে বুঝলুম, ওরা মনে করছে বিদ্যা ও সুন্দর যখন বহু বৎসর পর সম্মিলিত হয়ে গেছেন তখন ওদের কেটে পড়াই ভালো। আমাদের প্রেমটি যে চিরকালই নির্জলা জল ছিল সেটি হয়তো তারা গলা দিয়ে নাবাতে পারেনি—হজম করা তো দূরের কথা।

লীজেল আমাকে হাতে ধরে ড্রইংরুমের দিকে নিয়ে চললো। আমি বললুম, "এ কি আদিখেত্তা! চল্লিশ বছর ধরে যখনই এ বাড়িতে এসেছি তখনই আমরা বসেছি বাবা, মা, বড়দি, তুমি, ছোড়দি রান্নাঘরে। অবিশ্যি মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আজ কেন এ ব্যত্যয়? তদুপরি ঐ বিরাট ড্রইংরুম! বাপ্‌স্। তুই যদি এক কোণে বসিস আর আমি অন্য কোণে, তা হলে একে অন্যকে দেখবার তরে জোরদার প্রাশান মিলিটারি দুরবীনের দরকার হবে; কথা কইতে হলে আমাদের দেশের ডাকহরকরা, নিদেন একটা ট্রাংককল-ফোন্ ব্যবস্থা, আর—"

লীজেল সেই প্রাচীন দিনের মত বললে, "চোক্‌কোর চোক্‌-কোর। তুই চিরকালই বড্ড বেশী বকর বকর করিস্।"

গতি পরিবর্তিত হল। আমরা শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরেই গেলুম।

কিচেনের এক প্রান্তে টেবিল, চতুর্দিকে খান ছয় চেয়ার। অন্য প্রান্তে দুটো গ্যাসউনুন, তৃতীয়টা কয়লার (সেটা খুব সম্ভব প্রাচীন দিনের ঐতিহ্য রক্ষার্থে)। দুই প্রান্তের মাঝখানে অন্তত দশ কদম ফাঁক। অর্থাৎ কিচেনটি তৈরি করা হয়েছে দরাজ হাতে। বস্তুত লীজেলের মা যখন রাঁধতেন তখন এ-প্রান্ত থেকে আমাকে কিছু বলতে হলে বেশ গলা উঁচিয়ে কথা কইতে হত।

লীজেল একটা চেয়ার দেখিয়ে বললে, "এটায় ব'স্।"

সত্যি বলছি, আমার চোখে জল এল। কি করে লীজেল মনে রেখেছে যে, চল্লিশ বৎসর পূর্বে (তিনি গত হয়েছেন বছর আটত্রিশেক হবে) তার পিতা আমাকে ঐ চেয়ারটায় বসতে বলতেন। আমি জানতুম, কেন। জানলা দিয়ে, ঐ চেয়ারটার থেকে দূর-দূরান্তরের দৃশ্য সবচেয়ে ভালো দেখা যায়! পরে জানতে পেরেছিলুম, তিনি স্বয়ং ঐ চেয়ারটিতে বসে আপন খেত-খামারের দিকে এবং বিশেষ করে তাঁর বিরাট আপেল বাগানের দিকে নজর রাখতেন—

(মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আমাদের যেরকম আমবাগান)। অবশ্যই তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে ভালোবাসতেন। নইলে আমাকে তাঁর আপন আসন ত্যাগ করে, আপন অভ্যস্ত আসন ছেড়ে দিয়ে ওখানে বসতে বলবেন কেন? আমি তো সেখান থেকে তাঁর খেত-খামার, আপেলবাগান তদারকি করতে পারবো না—যারা ঘোরাঘুরি করছে তারা তাঁর আপন 'মুনিষ' না ভিন্-জন আমি ঠাহর করবো কি প্রকারে? আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ? সে দিকে আমার কোনো চিত্তাকর্ষণ নেই। একদিন ঐ শেষ কথাটি তাঁকে আস্তে আস্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে—যাতে অন্যেরা শুনতে না পায়—তিনি বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে অতিশয় সুন্দর স্মিতহাস্যে বললেন, "তোমরা ইণ্ডিয়ান। তোমাদের দেশে এখনো কল-কারখানা হয়নি। তোমরা এখনো আছো প্র কৃ তি র শি শু। শিশু কি মায়ের সৌন্দর্য বোঝে? না। সে শুধু তার মায়ের স্তনরস চায়—সেই স্তনদ্বয়ের সৌন্দর্য কি সে বোঝে? যেমন তার বাপ বোঝে? ঠিক ঐরকম তোমরা তোমাদের মা-জননী জন্মভূমিতে খেতখামার করে খাদ্যরস আহারাদি গ্রহণ করো। তোমরা এখনো কি করে বুঝবে, নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলতে কে বোঝায়? সেটা শুধু হয় যখন মানুষ কল-কারখানার গোলাম হয়ে হয়। অর্থাৎ মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর, বড় হয়ে সে তার মাতৃদুগ্ধের মূল্য বুঝতে শেখে—"

আমি বললুম, "মানছি, কিন্তু দেখুন গ্রীস, রোম এবং আমার দেশ ভারতবর্ষেও তো কলকারখানা নির্মিত হওয়ার বহু পূর্বে উত্তমোত্তম কাব্য রচিত হয়েছিল এবং সেগুলোতেও বিস্তর প্রাকৃতিক নৈসর্গিক বর্ণনা আছে। তবে কেন—?"...

এসব কথাবার্তা যেন ঐ চেয়ারে বসে কানে শুনতে পাচ্ছি। কত বৎসর হয়ে গেছে। এমন সময় লীজেল আমার মাথায় মারলো একটা গাঁট্টা। আমার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। বিশেষ করে তার ঠাকুরমার ছবিটি।

"কি খাবে বলছিলে ?"

আমি আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলুম, "আমি তো কিছুই বলিনি।"

"তবে চলো, তুমি যে স্যুপ পছন্দ করতে সেই স্যুপই করেছি— অর্থাৎ পী স্যুপ (কলাইশুঁটির স্যুপ)—এবারে বলো তুমি কি খাবে ? তুমি যা খেতে চাও তার জন্য মাছ, মাংস, ক্রীম আছে।"

আমি বললুম, "দিদি, স্যুপ ছাড়া আমার অন্য কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই। আর এই জর্নিতে আমার সর্বাঙ্গ অসাড়।…তবে কিনা আমি বঙ্গসন্তান। হেথায় ডান পাশে রাইন নদী। সে নদীর উত্তম উত্তম মাছ খেয়েছি কত বৎসর ধরে। তারই যদি একটা কিছু—"

বেচারী লীজেল!

শুকনো মুখে বললে, "রাইনে তো আজকাল আর সে-মাছ নেই।"

আমি শুধোলুম, "কেন ?"

বললে, "রাইন নদের জাহাজের সংখ্যা বড্ড বেশী বেড়ে গিয়েছে। তাদের পোড়ানো তেল তারা ঐ নদীতে ছাড়ে। ফলে নদীর জল এমনই বিষে মেশা হয়ে গিয়েছে যে, মাছগুলো প্রায় আর নেই। আমার কাছে যেসব মাছ আছে সেগুলো টিনের মাছ।"

আমি বললুম, "তা হলে থাক।"

১০

বিন্দু যখন সোয়ামীর সঙ্গে ট্রেনে করে যাচ্ছিল তখন বললে "আহা ওরা কেমন সুখে আছে"। আমরাও ভাবি ইংরেজ ফরাসী জর্মন জাত কি রকম সুখে আছে। কিন্তু ওদের দুঃখও আছে। তবে আমাদের মতো ওদের দুঃখ ঠিক একই প্রকারের নয়। ওরা খেতে পায়, আশ্রয় আছে। তৎসত্ত্বেও ওদের দুঃখ আছে।

লীজেলদের বাড়ি প্রায় দুশো বছরের পুরোনো। সে আমলে স্টীল সিমেন্টের ব্যাপার ছিল না। বাড়িটা মোটামুটি কাঠের তৈরী। দুশো বছর পরে ছাদটা নেমে আসছে। এটাকে খাড়া রাখা যায় কি প্রকারে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "লীজেল, এটাকে কি মেরামত করা যায় না?"

লীজেল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "শুধু ছাদ নয়, দেয়ালগুলো ঝুরঝুরে হয়ে এসেছে। এ বাড়ি মেরামত করতে হলে কুড়ি হাজার মার্ক (আমাদের হিসাবে চল্লিশ হাজার টাকারও বেশী) লাগবে। বাবা গেছেন, আমার কোনো ভাইও নেই। খেত-খামার দেখবে কে? আপেল বাগানটা পর্যন্ত বেচে দিয়েছি। তাই স্থির করেছি বাড়িটা সরকারকে দিয়ে দেবো। ওরা সব পুরোনো বাড়ির কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কারণ এ বাড়িটির স্টাইল একেবারে খাঁটি রাইনল্যাণ্ডের।"

আমি বললুম, "এটা মর্টগেজ করে টাকাটা তোলো না কেন?"

লীজেল বললে, "যে টাকাটা কখনো শোধ করতে পারবো না সে টাকা ধার করবো কি করে!"

আমার মনে গভীর দুঃখ হলো। বাড়িটি সত্যিই ভারী সুন্দর। শুধু বাড়িটি নয়, তার পেছনে রয়েছে ফল-ফুলের বাগান, তরি-তরকারির ব্যবস্থা, কুয়ো, হ্যাণ্ডপাম্প দিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা—গ্রামাঞ্চলে উত্তম ব্যবস্থা। খেত-খামার গেছে যাক। ওদের আপেল বাগান এই অঞ্চলে বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতমও ছিল। সেও গেছে যাক। কিন্তু এই সুন্দর বাড়িটা সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে, এটা আমার মন কিছুতেই মেনে নিতে চাইল না।

ইতিমধ্যে লীজেলের ছোট বোন মারিয়ানা এল। তিন বোনের ঐ একমাত্র যার বিয়ে হয়েছিল। যে-ডীটরিষ আমাকে নিয়ে

যাবার জন্য বন্-এ এসেছিল তার মা। ছেলের বাড়ি দু মিনিটের রাস্তা। সেখানে বউ নিয়ে থাকে।

মারিয়ানা বিধবা। প্রায় সাতাশ বছর পূর্বে তার বিয়ে হয়। বরটি ছিল খাসা ছোকরা—কিন্তু···

এ বাড়ির তিন বোনের কেউই নাৎসি ছিল না। এরা সবাই ধর্মভীরু ক্যাথলিক। ইহুদীরা প্রভু খৃষ্টকে হয়তো ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, হয়তো করেনি। যাই হোক, যাই থাক্—তাই বলে দীর্ঘ, সুদীর্ঘ, সেই ঘটনার দু হাজার বছর পর ওদের দোকান-পাট, ভজনালয়, ওদের লেখা বইপত্র পুড়িয়ে দেবে (মহাকবি হাইনরিষ হাইনের কবিতাও বাদ যায়নি), ইহুদি ডাক্তার, উকীল প্র্যাকটিস করতে পারবে না—এটা এরা গ্রহণ করতে পারেনি। এটা ১৯৩৪ সালের কথা। তখনো কনসানট্রেশন ক্যাম্প আরম্ভ হয়নি। যখন আরম্ভ হল তখন আমি দেশে। যুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। চিঠি-চাপাটির[১] গমনাগমন সম্পূর্ণ রুদ্ধ। কিন্তু আমার মনে কণা-মাত্র সন্দেহ ছিল না যে লীজেলদের পরিবার এ-প্রকারের নিষ্ঠুর নরহত্যা শুধু যে ঘৃণার চোখে দেখবে তাই নয়, এরা যে এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছে না সেটা তাদের মনকে বিকল করে দেবে।··· এ সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন জর্মনি যাই তখন লীজেল আমাকে বলেছিল, "ডু হালুঙ্কে, তুই তো ভালো করেই চিনিস, আমাদের এই মুফেনডার্ফ গ্রাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের না হোক, জর্মনির

---

১ আমার এক গুণী সখা আমাকে একদা বলেন, 'সিপাহী বিদ্রোহের' সময় চাপাটি-রুটির মারফৎ 'বিদ্রোহী'রা একে অন্যকে খবর পাঠাতো বলে 'চিঠিচাপাটি' সমাসটি নির্মিত হয়। কোনো এবং কিংবা একাধিক বিদ্বজ্জন যদি এ-বিষয়ে 'দেশ' পত্রিকায় সবিস্তর আলোচনা করেন তবে এ-অজ্ঞজন উপকৃত হবে। কিন্তু দয়া করে আমাকে সরাসরি লিখবেন না। এটা পাঞ্চজন্য। আমি ছাড়াও পাঁচজনের উপকারার্থে।

ক্ষুদ্রতম গ্রাম। সেই হিসেবে আমরা প্রখ্যাততম গ্রাম। এখানে মাত্র একটা দুটো ইহুদী পরিবার ছিল। দিদি সময়মত ওদেরকে স্যুইটজারল্যাণ্ডে পাচার করে দিয়েছিল।

এবারে আরম্ভ হবে ট্রাজেডি।

মারিয়ানা বড় সরলা। এ-সব ব্যাপার নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতো না। অবশ্য সেও ছিল আর দুই দিদির মত পরদুঃখ-কাতর।

বিয়ে করে বসলো এক প্রচণ্ড পাঁড় নাৎসিকে। কেন করলো, এ মূর্খকে শুধোবেন না। মেয়েরা কেন কার প্রেমে পড়ে, কেন কাকে বিয়ে করে এ-নিগূঢ় তত্ত্ব দেবতারাও আবিষ্কার করতে পারেননি।

তারপর যুদ্ধ লাগল। সেটা শেষ হল।

এইবারে মার্কিন ইংরেজদের কৃপায় দেশের শাসনভার পেলেন নাৎসিবৈরীরা। এঁরা খুঁজে খুঁজে বের করলেন নাৎসিদের। তখন আরম্ভ হল তাদের উপর নির্যাতন। আজ ধরে নিয়ে যায়। তিন দিন তিন রাত্তির গারদে নির্জন কারাবাসের পর আপনাকে ছেড়ে দিল। আপনি ভাবলেন, যাক বাঁচা গেল। দশদিন যেতে না যেতে আবার ভোর চারটেয় আপনাকে গ্রেফতার করে ঠাসলো গারদে। (এই যে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছিল সেটা শুধু আপনার পিছনে গোয়েন্দা রেখে ধরবার জন্য কারা কারা আপনার সহকর্মী ছিল; কারণ স্বভাবতই আপনি তাদেরই সন্ধানে বেরবেন। দ্বিতীয়ত এরা আপনার দরদী বন্ধু। আপনার দৈন্য-দুর্দিনে—একমাত্র তারাই আপনাকে সাহায্য করবে—অবশ্য যদি তাদের দু' পয়সা থাকে। ...এটা কিছু নবীন ইতিহাস নয়। আমাদের এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়, পরবর্তী যুগে 'মহামান্য' টেগার্ট সাহেবের আমলে—

বারে বারে সহস্র বার হয়েছে এই খেলা।
দারুণ রাহু ভাবে তবু হবে না মোর বেলা ॥)

সর্বশেষে মারিয়ানার স্বামীর তিন বছরের জেল হল। সেখানে যক্ষ্মা। বেরিয়ে এসে ছ মাসের পরই ওপারে চলে গেল।

পাঠক ভাববেন না,

আমি নাৎসিবৈরীদের দোষ দিচ্ছি।

বার বার শুধু আমার মনে আসছে :—

এদেশের লোক সবাই কৃশ্চান।

এদেশের প্রভু, প্রভু খৃষ্ট আদেশ দিয়েছেন, ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা।

জানি, মানুষ এত উঁচুতে উঠতে পারে না।

কিন্তু সেই চেষ্টাতেই তো তার খৃষ্টত্ব, তার মনুষ্যত্ব।

১১

হুর্‌রে, হুর্‌রে, হুর্‌রে।

কৈশোরে অবশ্য আমরা বলতাম হিপ্‌স্ হিপ্‌স্ হুর্‌রে।

পুরোপাক্কা ক্রেডিট নিশ্চয়ই এ্যার ইণ্ডিয়া কোম্পানির।…দীর্ঘ হাওয়াই মুসাফিরির পর অঘোরে ঘুমিয়েছিলাম সকাল আটটা অবধি। নীচে নাবতেই লীজেল চেঁচিয়ে বললে "ভূ হালুঙ্কে! তোর হারানো সুটকেস ফিরে পাওয়া গিয়েছে।"

"কি করে জানলি?"

"আমাদের তো টেলিফোন নেই। চল্লিশ বছর আগে এই গডেসবের্গের যে বাড়িতে তুই বাস করতি তার টেলিফোন নম্বরটি তুই কলোনের 'হারানো প্রাপ্তির' দফতরে সুবুদ্ধিমানের মত দিয়ে এসেছিলি। আশ্চর্য! সে নম্বর তুই পুতুপুতু করে এত বৎসর ধরে পুষে রেখেছিলি কি করে আর সেটা যে কলোনের সেই 'হারানো

প্রাপ্তির' দফতরে আপন স্মরণে এনে ওদের দিয়েছিলি সেটা আরো বিস্ময়জনক। তোর পেটে যে এত এলেম তা তো জানতুম না। আমি তো জানতুম তোর পশ্চাৎদেশে টাইম বম্ রাখতে হয় (আমরা বাঙলায় বলি, 'পেটে বোমা না মারলে কথা বেরয় না'), ফিউজের হিস্‌হিস্ শুনে তবে তোর বুদ্ধি খোলে। সে-কথা থাক। কলোনের দফতর সেই নম্বরে ফোন করে, আর তোর সেই প্রাচীন দিনের ল্যাণ্ডলেডির মেয়ে 'আনা' সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল তুই আমাদের বাড়িতে উঠেছিস। তা ছাড়া যাবি আর কোন্ চুলোয়। আনা-র বিয়ে হয়েছে এক যুগ আগে। ভাতার আর বাচ্চা দুটো রয়েছে। তাই সেখানে না উঠে আমাকে আপ্যায়িত করতে এসেছিস। ফের বলছি সে-কথা থাক। আনা কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "হবে না কেন? আমি ওদের বাড়িতে ঝাড়া একটি বছর ছিলুম। আমার সঙ্গ পেয়েছে বিস্তর।"

লীজেল আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে কোনো মন্তব্য না করে বললে, "সে জানে আমাদের টেলিফোন নেই। কিন্তু আমাদের পাশের বাড়ির মহিলার আছে। তাকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে যে তোর স্যুটকেসটি পাওয়া গিয়েছে এবং কলোন দফতরে জমা পড়েছে।"

আমি বললুম "সর্বনাশ! আমাকে এখন ঠ্যাঙস ঠ্যাঙস করে যেতে হবে সেই ধেড়ধেড়ে-গোবিন্দপুর কলোনে? আধা খানা দিন তাতেই কেটে যাবে। হেথায় এসেছি ক'দিনের তরে? তারও নিরেট চারটি ঘণ্টা মেরে দিয়েছে জুরিক। কনেকশন ছিল না বলে। আমি—"

লীজেল বাধা দিয়ে বললে, "চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রাথমিক পরিচয়ে তোকে যে একটা আকাট মূর্খ ঠাউরেছিলুম সেটা কিছু ভুল নয়; কলোনের দফতরে তোর প্র্যাকটিকাল বুদ্ধি ব্যত্যয়। অবশ্য

আমি কখনো বলিনে এক্‌সেপ্‌শন্ প্রুভজ দি রুল, আমি বলি রুল প্রুভজ দি এক্‌সেপ্‌শন্। তোর স্যুটকেস তারাই এখানে পৌঁছে দেবে।”

ওঃ। কী আনন্দ, কী আনন্দ। কাল রাত্রে ভয়ে ভয়ে আমি আমার হারিয়ে না যাওয়া বড় স্যুটকেসটি খুলিনি। যদি দেখি, এদের এবং আমার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের জন্য ছোটখাটো যে-সব সওগাৎ এনেছি সেগুলো এই বড় স্যুটকেসটিতে নেই। এটাকেই নাকি বিদেশী ভাষায় বলে অসট্রিচ মনোবৃত্তি।

ইতিমধ্যে বাড়ির সদর দরজাতে ঘা পড়লো। লীজেল সেথায় গিয়ে কি যেন কথা-বার্তা কইলে। মিনিট দুই পরে সেই হারিয়ে-যাওয়া-ফিরে-পাওয়া স্যুটকেসটি নিয়ে এসে আমার সামনে রেখে বললে, “তোদের এ্যার-কোমপানি তো বেশ স্মার্ট : কম্‌পিটেন্ট্। এত তড়িঘড়ি হুলিয়া ছেড়ে বাক্সটাকে ঠিক ঠিক পকড় কর্ তোর কাছে পৌঁছে দিলে।” আমার ছাতি সুশীল পাঠক, ইঞ্চি ছয়—মাফ করবেন, আজকাল নাকি তাবৎ মাপ সেন্টিমীটার মিলিমীটারে বলতে হয়—অর্থাৎ ১৫ মিলিমীটার (কিংবা সেন্টিমীটারও হতে পারে—আমার প্রিন্‌স্ অব ওয়েলস্ অর্থাৎ বড় বাবাজী যে ইস্‌কেলখানা রেখে দিয়ে ঢাকা চলে গিয়েছেন সেটাতে তার হদীস মেলে না) ফুলে উঠলো।

* * *

বাকসোটা খুলে দেখি, আমার মিত্র মিত্র যে-সব বস্ত্র খাদী প্রতিষ্ঠান থেকে কিনে দিয়েছিল তার সবই রয়েছে (১) বারোখানা মুর্শিদাবাদী রেশমের স্কার্ফ, (২) উড়িষ্যার মোষের শিঙে তৈরী ছ'টি হাতি, (৩) পূর্ববৎ ঐ দেশেরই তৈরী পিঠ চুলকনোর জন্য ইয়া লম্বা হাতল, (৪) দশ বাণ্ডিল বিড়ি (এগুলো অবশ্য লীজেল পরিবারের জন্য নয় ; এগুলো আমার অন্য বন্ধুর জন্য), (৫) ভিন্ন ভিন্ন গরম মশলা

এবং আচার, (৬) বর্ধমানের রাজপরিবারের আমার একটি প্রিয় বান্ধবীর দেওয়া একখানি মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম স্কার্ফ (তাঁর শর্ত ছিল সেটি যেন আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠা বান্ধবীকে দি), (৭) তিনটি ফার্স্টক্লাস বেনারসী রেশমের টাই, কাশ্মীরের ম্যাংগো ডিজাইনের শালের মত ওগুলো বর্ধমানেরই দেওয়া, (৮) দুই পৌণ্ড দক্ষিণ ভারতের কফি ও পূর্ববৎ ওজনে দার্জিলিঙের চা।....এবং একখানা বই ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে—তাঁর এক বিশেষ পূজারিণীর জন্য, তিনি বাস করেন সুইটজারল্যাণ্ডে। আর কি কি ছিল ঠিক ঠিক মনে পড়ছে না। বেশ কিছু কাসুন্দোও ছিল। এই ইয়োরোপীনদের বড্ডই দেমাক, তাদের মাস্টার্ড নিয়ে। দম্ভজনিত আমার উদ্দেশ্য ছিল, এদেরকে দেখানো যে আমাদের বাঙলাদেশের কাসুন্দো এ-লাইনে অনির্বচনীয়, অতুলনীয়। পাউডার দিয়ে তৈরী ওদের মাস্টার্ড দু'দিন যেতে না যেতেই মসনে ধরে সবুজ হয়ে অখাদ্যে পরিবর্তিত হয়। আর আমাদের কাসুন্দো? মাসের পর মাস নির্বিকার ব্রহ্মের মত অপরিবর্তনশীল।

লীজেলকে বললুম, "দিদি, এসব জিনিস ঐ বড় টেবিলটার উপর সাজিয়ে রাখ্। আর খবর দে ডীটরিষ ও তার বউকে। মারিয়ানা আর তুই তো আছিসই। যার যা পছন্দ তুলে নেবে।"

লীজেল বললে, "এটা কি ঠিক হচ্ছে? এখান থেকে তুই যাবি ড্যুসলডর্ফে—সেখান তোর বন্ধু পাউল আর তার বউ রয়েছে। তারপর যাবি হামবুর্গে; সেখানে তোর বান্ধবীর (তিনি গত হয়েছেন) তিনটি মেয়ে রয়েছেন। তারপর যাবি স্টুটগার্ট-এ। সেখানে রয়েছেন তোর ফার্স্ট লভ। এখানেই যদি ভালো ভালো সওগাৎ বিলিয়ে দিস তবে ওরা পাবে কি?"

একেই বঙ্গভাষায় বলে পাকা গৃহিণী। কোন্ গয়না কে পাবে জানে।

১২

গডেসবের্গ সত্যই বড় সুন্দর। এ শহরের সৌন্দর্য আমাকে বারবার আহ্বান করেছে। রাস্তাগুলো খুবই নির্জন। এতই নির্জন যে পথে কারো সঙ্গে দেখা হলে, সে সম্পূর্ণ অচেনা হলেও আপনাকে অভিবাদন জানিয়ে বলবে, 'গুটেন টাহ্'। আপনিও তাই বলবেন। রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট গেরস্ত বাড়ি। সবাই বাড়ির সামনে যেটুকু ফাঁকা জায়গা আছে তাতে ফুল ফুটিয়েছে। যদি কোন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আপনি ফুলগুলোর দিকে মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে থাকেন তবে প্রায়ই বাড়ির কর্তা, কিংবা গিন্নি, কিংবা তাদের ছেলে-মেয়ের একজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনার সঙ্গে কথা জুড়ে বসবে। শেষটায় বলবে, "আপনিও আমাদেরই একজন; কিছু ফুলটুল চাই? বলুন না, কোনগুলো পছন্দ হয়েছে।" তারপর একগাল হেসে হয়ত বলবে, "প্রেমে পড়েছেন নাকি? তাহলে লাল ফুল! হাসপাতালে রুগী দেখতে যাচ্ছেন নাকি? তাহলে সাদা ফুল।" আমি একবার শুধিয়েছিলুম, "আর যদি আমার প্রিয়ার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে থাকে, তাহলে কি ফুল পাঠাব?" যাকে শুধিয়ে-ছিলুম তিনি তখন দু'গাল হেসে বলেছিলেন, "সবুজ ফুল। সবুজ ঈর্ষার রং।" আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, "সবুজ ফুল ত এদেশে দেখিনি কখনো। আমাদের দেশেও সবুজ ফুল একেবারেই বিরল।" ভদ্রলোক বললেন, "আমাদের দেশেও। কিন্তু আমাদের এক প্রতি-বেশীর বাড়িতে সবুজ ফুল আছে। আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।" "ও মশাই, দাঁড়ান দাঁড়ান, আমার সবুজ ফুলের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই—ও মশাই—"

কিন্তু কে বা শোনে কার কথা!

মিনিট দুই যেতে না যেতেই সেই মহাত্মার পুনরাবির্ভাব। হাতে একটি সবুজ গোলাপ। চোখে মুখে যে আনন্দ তার থেকে মনে হলো তিনি যেন বাকিংহাম প্রাসাদ কিংবা কুতুব মিনার কিংবা উভয়ই কুড়িয়ে এনেছেন। আমি বিস্তর "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ডাঙ্কে শ্যোন, ডাঙ্কে রেষট শ্যোন্‌" বলে অজস্র ধন্যবাদ জানালুম।

ইতিমধ্যে বাড়ির দরজা খুলে গেল। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের একটি মহিলা ডেকে বললেন, "ওগো, তোমার কফি—"

হঠাৎ আমাকে দেখে কেমন যেন চুপসে গেলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "চলুন না। এক পাত্র কফি—হেঁ হেঁ—"

আমি বললুম, "কিন্তু আপনার গৃহিণী—?"

"না, না, না—আপনি চিন্তা করবেন না। আমার গৃহিণী খাণ্ডারিণী নয়। অবশ্য সে আপনাকে কখনো দেখেনি। চলুন চলুন।"

বসার ঘরে ঢুকে ভদ্রলোক আমাকে কফি টেবিলের পাশে সযত্নে বসিয়ে বললেন, "আপনাকে চল্লিশ বৎসর পূর্বে কত না দেখেছি। আমার বয়েস তখন চোদ্দ পনেরো। কিন্তু ভয়ে আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে পারিনি—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "সে কি?"

"এজ্ঞে, আমি জানতুম, আপনি ইণ্ডিয়ান। আর ইণ্ডিয়ানরা সব ফিলসফার। তারা যত্রতত্র যার তার সঙ্গে কথা কয় না। তাই। আপনি ধীরে ধীরে পা ফেলে যেতেন রাইন নদের পারে। আমি কত না দিন আপনার পিছন পিছন গিয়েছি। আপনি একটি বেঞ্চিতে বসে রাইনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবতেন। তখন কি আর বিরক্ত করা যায়?"

আমি বললুম, "ব্রাদার, এটা বড় ভুল করেছ। তখন আমার সঙ্গে কথা কইলে বড়ই খুশী হতুম।"

ইতিমধ্যে বাড়ির গৃহিণী কেক ইত্যাদি নিয়ে এসে আমাদের

টেবিলে রাখলেন। তাঁর গাল দুটো আরো লাল হয়ে গিয়েছে, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে এবং তিনি হাঁপাচ্ছেন। অর্থাৎ এ পাড়ায় কোনো কেকের দোকান নেই বলে তিনি কুড়ি কুড়ি মিনিটের রাস্তা ঠেঙিয়ে কেক টার্ট নিয়ে এসেছেন।

এস্থলে যে কোনো ভদ্রসন্তান ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাফ চাইতো। বলতো, 'এ সবের কি প্রয়োজন ছিল?' কিন্তু আমি চাইনি। আমাকে বেয়াদব মূর্খ যা খুশী বলতে পারেন।

আমি শুধু আমার পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে তাঁর কপালটি মুছে দিলুম।

১৩

ভ্রমণকাহিনী লিখতে লিখতে মানুষ আশকথা পাশ-কথার উত্থাপন করে। গুণীরা বলেন এটা কিছু দুষ্কর্ম নয়। সদর রাস্তা ছেড়ে পথিক যদি পথের ভুলে আশপথ পাশপথ না যায় তবে অচেনা ফুলের নয়া নয়া পাখির সঙ্গে তার পরিচয় হবে কি প্রকারে? কবিগুরুও বলেছেন,

"যে পথিক পথের ভুলে,
এল আমার প্রাণের কুলে—"

অর্থাৎ প্রণয় পর্যন্ত হতে পারে। তাই আমি যদি মাঝে মধ্যে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ি তবে সহৃদয় পাঠক অপরাধ নেবেন না।

* * *

আলেকজাণ্ডার ফন্ হুম্বল্‌টের নাম কে না শুনেছে? নেপোলিয়ন, গ্যোটে, শিলারের সমনাময়িক। দুই কবির সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান প্রদান হত। এবং অনেকেই বলেন, ঐ সময়ে পাশ্চাত্য মহাদেশগুলোতে নেপোলিয়নের পরেই ছিল হুম্বল্‌টের

সুখ্যাতি। আসলে তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক এবং পর্যটক—ওদিকে কাব্য দর্শন অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গেও সুপরিচিত।

কিন্তু তাঁর পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমার শক্তির বাইরে এবং সে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এ-লেখাটি আরম্ভও করিনি।

হুম্‌বল্‌ট্‌ গত হন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। যেহেতু তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের জন্য (দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ককেশাস সাইবীরিয়া পর্যন্ত) অতিশয় সযত্নবান ছিলেন তাই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের জর্মন পররাষ্ট্র দফতরের উৎসাহে ঐ দেশের জনসাধারণ একটি প্রতিষ্ঠান—এন্‌ডাওমেণ্ট দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর, ওয়াকফ্‌, যা খুশী বলতে পারেন—নির্মাণ করলো, নাম: আলেকজাণ্ডার ফন্‌ হুম্‌বল্‌ট্‌ স্টিফ্‌টুঙ্‌। তাদের একমাত্র কর্ম তখন ছিল বিদেশী ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে জর্মনিতে পড়াশুনো করার ব্যবস্থা করে দেওয়া। আমার বড়ই বিস্ময় বোধ হয়, জর্মনির ঐ দুর্দিনে (ইনফ্লেশন সবে শেষ হয়েছে; তার ধোঁয়ারী তখন কাটে নি) সে কি করে এ-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করলো? আমরা বলি 'আপনি পায় না খেতে—'। অনেক চিন্তা করে বুঝেছিলুম, দয়াদাক্ষিণ্য আর্থিক সচ্ছলতার উপর নির্ভর করে না। লক্ষপতি ভিখিরিকে একটা কানাকড়ি দেয় না, অথচ আমি আপন চোখে দেখেছি এক চক্ষুষ্মান ভিখিরি এক অন্ধ ভিখিরিকে আপন ভিক্ষালব্ধ দু'চার আনা থেকে দু' পয়সা দিতে। আমার এক চেলা এদানিং আমাকে জানালে গঙ্গাস্বরূপা ইন্দিরাজীও নাকি বলেছেন, গরীবই গরীবকে মদৎ দেয়।

সে আমলে ইণ্ডিয়া পেত মাত্র একটি স্কলারশিপ—আজ অনেক বেশী পায়।[1] সেটি পেলেন আমার বন্ধু সতীর্থ বাসুদেব বিশ্বনাথ গোখলে।[2] ইনি সর্বজনপূজ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাতঃ-

১ দয়া করে আমাকে প্রশ্ন শুধিয়ে চিঠি লিখবেন না, কি কৌশলে এ স্কলারশিপ পাওয়া যায়।

২ দয়া করে "গোখেল" উচ্চারণ করবেন না।

স্মরণীয় ঈশ্বর গোখলের ভ্রাতুষ্পুত্র। তার চার বৎসর পর পেলুম আমি। সে-কথা থাক। মাঝে মাঝে গাধাও রাজমুকুট পেয়ে যায়।...

গোডেস-বের্গ শহরের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখি, একটি বাড়ির সমুখে মোটা মোটা হরফে লেখা

আলেকজাণ্ডার ফন হুম্‌বল্‌ট স্টিফটুঙ্

আমারে তখন আর পায় কে? লম্বা লম্বা পা ফেলে তদ্দণ্ডেই সে বাড়িতে উঠলুম

আমি অবশ্যই আশা করিনি যে সেই চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার লোক এ আপিস চালাবেন।

কিন্তু এনারাও ভদ্রলোক। অতিশয় ভদ্রভাবে শুধোলেন,

"আপনি কোন্ সালে হুম্‌বল্‌ট বৃত্তি পেয়েছিলেন?"

"১৯২৯।"

ভদ্রলোক যেন সাপের ছোবল খেয়ে লম্ফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

আমিও তাজ্জব বনে গিয়ে বললুম,

"কি হল?"

"কী! চল্লিশ বছর পূর্বে!"

"এজ্ঞে হাঁ।"

"মাইন গট্ (মাই গড্) এত প্রাচীন দিনের কোনো স্কলার-শিপ হোল্ডারকে আমি তো কখনো দেখিনি!"

আমি একটুখানি সাহস পেয়ে বললাম, "ব্রাদার, ইহ সংসারে তুমিও অনেক-কিছু দেখোনি, আম্মো দেখিনি। তুমি কি আপন পিঠ কখনো দেখেছ? তাই কি সেটা নেই?"

* * *

যেহেতু আমি এ-বাড়িতে ঢোকার সময় আমার ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, তাই তারা ইতিমধ্যে চেক-অপ ক'রে নিয়েছে, আমি সত্য সত্যই ১৯২৯-এ স্কলারশিপ পেয়ে এ-দেশে এসেছিলুম।

হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"অ—অ—অ। জানেন, আপনি আমাদের প্রাচীনতম স্কলারশিপ হোলডার ?"

আমি সবিনয় বললুম,

"তা হলে আমাকে আপনাদের প্রাচ্যদেশীয় যাদুঘরে পাঠিয়ে দিন। টুটেনখামের মমির পাশে কিংবা রানী নফ্রেটাট্রির পাশে আমাকে শুইয়ে দাও।"

১৪

সুইটজারল্যাণ্ড, জর্মনি, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেনে টাকাকড়ির এমনই ছড়াছড়ি, সে কড়ি কি করে খরচ করবে যেন সেটা ভেবেই পায় না। বিশ্বময় (সঠিক বলতে পারবো না, তবে বোধ হয় চীন এবং লৌহ-যবনিকার অন্তরালের দেশগুলো এখনো অপাংক্তেয়) গণ্ডায় গণ্ডায় স্কলারশিপ ছড়ানোর পরও হুম্‌বল্‌ট ওয়াক্‌ফের হাতে বেশ-কিছু টাকা বেঁচে যায়।

তাই তারা প্রতি বৎসর একটা জব্বর পরব করে। তিন দিন ধরে। জর্মনিতে যে শত শত হুম্‌বল্‌ট স্কলার ছড়িয়ে আছে এবং যারা একদা স্কলার ছিল, উপস্থিত জর্মনিতেই কাজকর্ম করে পয়সা কামাচ্ছে তাদের সবাইকে তিন দিনের তরে বাড্. গডেসবেগে নেমন্তন্ন জানায়। যারা বিবাহিত, তাদের বউ কাচ্চা বাচ্চা সহ ;—বলা বাহুল্য ঐ উপরোক্ত সম্প্রদায়, যারা কাজকর্ম করে পয়সা কামায়। আসা-যাওয়ার ট্রেন ভাড়া, হোটেলের খাইখর্চা, তিনদিন ধরে নানাবিধ মীটিং পরব নৃত্যগীত, অনুষ্ঠানে যাবার জন্য মোটর গাড়ি—এক কথায় সব—সব। প্রাচীন দিনে আমাদের দেশে যে-রকম জমিদার বাড়িতে

বিয়ের সময় দশখানা গাঁয়ের বাড়িতে তিন দিন ধরে উনুন জ্বালানো হত না।

হ্যার পাপেনফুস্ স্টিফটুঙের অন্যতম কর্তাব্যক্তি। আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বললেন, "আপনার তুলনায় জর্মনিতে উপস্থিত যে-সব প্রাক্তন স্কলার আছেন তাঁরা নিতান্তই শিশু—"

আমি বললুম "আমার হেঁটোর বয়স।"

পাপেনফুস ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। অর্থাৎ বুঝতে পারেননি। সব দেশের ইডিয়ম, প্রবাদ তো একই ছাঁচে তৈরী হয় না আমি বুঝিয়ে দেওয়ার পর বললুম, "আমাকে যে আপনাদের পরবে নিমন্ত্রণ করেছেন তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাদের পরব আসছে সপ্তাহ তিনেক পরে। ওদিকে আমাকে যেতে হবে কলোন, ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফ, হামবুর্গ, স্টুটগার্ট —এবং সর্বশেষ স্টুটগার্ট থেকে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূরে পাড়াগাঁয়ে আমার প্রাচীন দিনের এক বিধবা বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে। আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো করেছি। তার অর্থ আমার স্কলারশিপের মত তিনিও চল্লিশ বছরের পুরনো—প্লাস তাঁর বয়স।"

লক্ষ্য করলুম, যে তৃতীয় ব্যক্তি 'সভাস্থলে' উপস্থিত ছিলেন তাঁর চোখে ঠোঁটে কেমন যেন একটুখানি মৃদু হাসি খেলে গেল। এর অর্থ হতে পারে :—

(১) এ তো বড় আশ্চর্য। ষাট বছর বয়সের প্রাচীনা প্রিয়ার অভিসারে যাচ্ছে এই নাগর

কিংবা

(২) এর এক-প্রিয়া-নিষ্ঠতাকে তো ধন্যি মানতে হয়।

(রামচন্দ্রকে বলা হয় একদারনিষ্ঠ?)

ইতিমধ্যে কর্তা বললেন, "সে কি কথা। আপনি আসবেন না, সে তো হতেই পারে না। আপনার ভাষায়ই বলি আপনার মত 'মিউজিয়ম পীস' আমাদের কর্তাব্যক্তিদের গুণীজ্ঞানীদের দেখাতে

পারবো না, সে কি একটা কাজের কথা হল? ওনাদের অনেকেই ভাবেন, আমাদের অলেকজাণ্ডার ফন্ হুম্বল্‌ট স্টিফ্‌টুঙ বুঝি পরশু দিনের বাচ্চা। অথচ আমাদের প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন কবে সেই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে—অবশ্য যুদ্ধের ফলস্বরূপ জর্মনি যখন তছনছ হয়ে গেল তখন কয়েক বৎসর প্রতিষ্ঠান দেউলে হয়ে রইল। এঁদের আমি দোষ দিই নে—সব জর্মনই তো ঐতিহাসিক মমজেন হয় না। অতএব চল্লিশ বছরের পূর্বেকার জলজ্যান্ত একজন বৃত্তিধারীকে যদি ওদের সামনে তুলে ধরতে পারি, তখন হুজুরদের পেত্যয় যাবে—"

আমি মনে মনে বললুম, 'ঈশ্বর রক্ষতু। যাদুঘরে যে-রকম পেডে-স্টালের উপর গ্রীক মূর্তি খাড়া করে রাখে, সে রকম নয় তো! তা করুক, কিন্তু জামাকাপড় কেড়ে নিয়ে লজ্জা নিবারণার্থে কুল্লে একখানা ডুমুরপাতা পরিয়ে দিলেই তো চিত্তির—'

কর্তা বলে যেতে লাগলেন, "আপনি পরবের সময় কন্টিনেন্টে যেখানেই থাকুন না কেন আমরা সানন্দে আপনাকে একখানা রিটার্ন টিকিট পাঠিয়ে দেব। এখানে হোটেলের ব্যবস্থা যানবাহন সবই তো আমরা করে থাকি। তারপর আপনি ফিরে যাবেন আপন মোকামে।" বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, "আপনি কি মাত্র তিনটি দিনও স্পেয়ার করতে পারবেন না?···আচ্ছা, তবে এখন চলুন আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে।"

বড্ডই নেমকহারামী হয়। তদুপরি এরা আমাকে আবার দুই যুগ পরে আবার নেমক দিতে চায়। একদা যে প্রতিষ্ঠান যে জর্মন জাত এই তরুণকে স্কলারশিপ-নেমক দিয়েছিল, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে, তাদেরকে নিরাশ করি কি প্রকারে?

আমি সকৃতজ্ঞ পরিপূর্ণ সম্মতি জানালুম।

*　　　*　　　*

রেস্তোরাঁটি সাদামাঠা, নিরিবিলি, ছোটখাটো, ঘরোয়া। ব্যাণ্ড-বাত্তি, জ্যাজম্যাজিক, খাপসুরৎ তরুণীদের ঝামেলা, কোনো উৎপাতই

নেই। বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না যে এ রেস্তোরাঁতে আসেন নিকটস্থ আপিস-দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। তার অন্যতম প্রধান কারণ 'মেনু' (খাদ্যনির্ঘণ্ট) দেখেই আমার চক্ষুস্থির। তড়ি-তেই হিসেব করে দেখলুম এখানে অতি সাধারণ লাঞ্চ খেতে হলেও নিদেন পনেরো মার্ক লাগার কথা। আমাদের হিসেবে তিনখানা করকরে দশ টাকার নোট। অবশ্য গচ্চাটা আমাকে দিতে হবে না। কারণ ওরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। এবং এ-দেশের রেস্তোরাঁতে যে ব্যক্তি অর্ডার দিল সেই পেমেন্ট করবে—যে খেলো তার কোনো দায় নেই।

কিন্তু এ-স্থলে সেটা তো কোনো কাজের কথা নয়।

যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন তাঁরা আমাকে মেনু এগিয়ে দিয়ে বলেছেন, "কি খাবেন, বলুন।" আমি কি তখন তাদের ঘাড় মটকাবো।

আমি শুধোলুম, "আপনারা কি এই রেস্তোরাঁতেই প্রতিদিন লাঞ্চ খেতে আসেন ?"

"এজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি খান, মানে, কোন্ কোন্ পদ।"

"স্যুপ মাংস আর পুডিং। কখনো বা আইসক্রীম—তবে সেটা বেশীর ভাগ গ্রীষ্মকালে। মাঝে মধ্যে শীতকালেও।"

আমি অবাক হয়ে শুধোলুম, "শীতকালে আইসক্রীম !"

তখন আমার মনে পড়লো আমরাও তো দারুণ গরমের দিনে গরমোত্তর চা খাই। তবে এরাই বা শীতকালে আইসক্রীম খাবে না কেন ?

আমি অতিশয় সাদামাঠা লাঞ্চ অর্ডার দিলুম। যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তার গলা মটকাতে নেই।

আহারাদির কেচ্ছা শুরু হলেই আমি যে বে-এক্তেয়ার হয়ে যাই আমা সম্বন্ধে সে বদনাম এতই দীর্ঘকালের যে তার সাফাই এখন বেবাক তামাদি—ইংরিজি আইনের ভাষায় 'টাইম-বার' না কি যেন বলে—হয়ে গিয়েছে। তাই পাঠক 'ধর্মাবতারের' সমুখে করজোড়ে স্বীকার করে নিচ্ছি "আমি দোষী, অপরাধ করেছি।"

কিন্তু আমি জাত-ক্রিমিনাল। আমার মিত্র এবং পৃষ্ঠপোষক জেল সুপারিনটেনডেনট তাঁর একাধিক প্রামাণিক পুস্তকে লিখেছেন, এই বঙ্গদেশে 'জাত-ক্রিমিনাল' হয় না। হুঁঃ! আমি জাত-ক্রিমিনাল সেটা জানার পূর্বেই তিনি এসব দায়িত্বহীন 'বাক্যবিন্যাস' করেছেন। তাই আমি আবার সেই লাঞ্চের বর্ণনা পুনরায় দেব।

সুপ আমি বড্ড বেশী একটা ভালোবাসিনে।

এ বাবদে কিন্তু আমি সমুদ্রের বেলাভূমিতে সম্পূর্ণ একাকী নুড়ি নই। ডাচেস অব উইণ্ডসর (উচ্চারণ নাকি 'উইনজার') অতি উত্তম রান্নাবান্না করতে পারেন। তা সে অনেকেই পারেন। কিন্তু তিনি আরেকটি ব্যাপারে অসাধারণ হুন্নুরি। ভোজনটি কি প্রকারে 'কম্‌পোজ' করতে হবে—এ-তত্ত্বটি তিনি খুব ভালো করে জানেন।

অপরাধ নেবেন না। আমরা বাঙালী মাত্রই ভাবি ভোজনে যত বেশী পদ দেওয়া হয় ততই তার খানদানিত্ব বেড়ে যায়। তিন রকমের ডাল, পাঁচ রকমের চচ্চড়ি, তিনরকমের মাছ, দু তিন রকমের মাংস, চিনিপাতা দই আর কত হরেক রকমের মিষ্টি তার হিসেব নাই বা দিলুম।

আর প্রায় সব-কটাই অখাদ্য। কারণ, এতগুলো পদের জন্য তো এতগুলো উনুন করা যায় না, গোটা দশেক পাচক ডাকা যায়

না। অতএব বেগুন ভাজা মেগনোলিয়ার আইসক্রমের মত হিম, চিনি-পাতা দই পাঞ্জাব মেলের এনজিনের মত গরম, লুচি কুকুরের জিভের মত চ্যাপটা, লম্বা,—খেতে গেলে রবরের মত। আজকাল আবার ফ্যাশন হয়েছে ঘি-ভাত বা পোলাউয়ের বদলে চীনা ফ্রাইড রাইস। চীনারা 'র' উচ্চারণ করতে পারে না। অতএব বলে 'ফ্লাইড লাইস'—অর্থাৎ 'ভাজা উকুন'! তা সে যে উচ্চারণই করুক আমার তাতে কানাকড়ি মাত্র আপত্তি নেই। শুনেছি, মহাকবি শেকসপীয়র বলেছেন, 'গোলাপে যে-নামে ডাকো গন্ধ বিতরে'। তাই 'ফ্রাইড্ রাইস' বলুন বা 'ফ্লাইড লাইস'ই বলুন—সোওয়াদটি উত্তম হলেই হল। কিন্তু আজকালকার কেটারাররা (হে ভগবান, এই সম্প্রদায়কে বিনষ্ট করার জন্য আমি চেঙ্গিস খান হতে রাজী আছি) নেটিভ পাচক দিয়ে 'ফ্লাইড্ লাইস' নির্মাণ করেন। সত্য সত্য তিন সত্য বলছি, সে মহামূল্য সম্পদ জিহ্বাগ্র স্পর্শ করার পূর্বেই আপনি বুঝে যাবেন এই অভূতপূর্ব বস্তু 'উকুন ভাজা'। আলবৎ, আমি নতমস্তকে স্বীকার করছি, 'উকুন ভাজা' আমি এই কেটারার-সম্প্রদায়ের অবদান—মেহেরবাণীর পূর্বে কখনো খাইনি। তাই গোড়াতেই বলেছি, আমরা মেনু কম্পোজ করতে জানিনে।

তা সে থাক, তা সে যাক্। পরনিন্দা মহাপাপ। এখানেই ক্ষান্ত দি। বয়স যত বাড়ে মানুষ ততই খিটখিটে হয়ে যায়।

পুরনো কথায় ফিরে যাই। ডাচেস অব উইনজার নাকি তাঁর লাঞ্চ ডিনারে নিমন্ত্রিতজনকে কখনো সুপ পরিবেশন করেন না। অতিশয় অভিজ্ঞতালব্ধ তাঁর বক্তব্য: এই যে বাবুরা এখন ডিনার খেতে যাবেন তার আগে তেনারা গিলেছেন গ্যালন গ্যালন ককটেল হুইস্কি। জালা জালা শেরি, পোর্ট। সক্কলেরই পেট তরল বস্তুতে টইটম্বুর—ছয়লাপও বলতে পারেন। ডাচেসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাপ্রসূত সুচিন্তিত অভিমত: এর পরও যদি হুজুররা ত র ল দ্রব্য সুপ পেটে

ঢোকান তবে, তার পর আর রোস্ট ইত্যাদি নিরেট সলিড দ্রব্য খাবেন কি প্রকারে ? তাই তাঁর ডিনারে 'নো সুপ !' অবশ্য ডাচেস সহৃদয়া মহিলা। কাজেই যাঁরা নিতান্তই সুপাসক্ত তাঁদের জন্য সুপ আসে। ওদেরকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তিনিও মাঝে মাঝে দু' চার চামচ সুপ গলাতে ঢালেন।

অতএব আমাকেও নিতান্ত সঙ্গ দেওয়ার জন্য হুম্‌বল্‌ট স্টিফ্‌টুঙ প্রদত্ত লাঞ্চে কিঞ্চিৎ সুপ সেবন করতে হল।

বাঃ। উত্তম সুপ। ব্যাপারটা তাহলে ভালো করে বুঝিয়ে বলি।

যে সব দেশের কলোনি নেই--বিশেষ ভারত, সিংহল কিংবা ইণ্ডোনেশিয়ায়—তারা গরম মশলা পাবে কোত্থেকে ? কেনার জন্য অত রেস্ত কোথায় ? শত শত বৎসর ধরে তাদের ছোঁকছোঁকানি শুধু গোল মরিচের জন্য। শুনেছি, ভাস্কো দা গামা ঐ গোলমরিচের জন্য অশেষ ক্লেশ করে দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, কলম্‌বস্‌ও নাকি ঐ একই মৎলব নিয়ে সাপ খুঁজতে গিয়ে কেঁচো পেয়ে গেলেন—অর্থাৎ ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে গিয়ে আমেরিকায় পৌঁছে গেলেন। এর পর ইয়োরোপীয়রা দক্ষিণ আমেরিকায় ঝাল লাল লঙ্কা আবিষ্কার করলো, কিন্তু ওটা ওদের ঠিক পছন্দ হল না। যদ্যপি আমরা ভারতীয়রা সেটি পরমানন্দে আলিঙ্গন করে গ্রহণ করলুম।

ইতিহাস দীর্ঘতর করবো না।

ইতিমধ্যে জর্মনির এতই ধনদৌলত বেড়ে গিয়েছে যে, এখন সে শুধু কালা মরিচ কিনেই পরিতৃপ্ত নয়—এখন সে কেনে দুনিয়ার যত মশলা। বিশেষ করে 'কারি পাউডার' আর লবঙ্গ, এলাচি, ধনে ইত্যাদির তো কথাই নেই। তবে কি না আমি কন্টিনেন্টের কুত্রাপি কাঁচা সবুজ ধনে পাতা দেখিনি। কিন্তু ভয় নেই, কিংবা ভয় হয়তো সেখানেই। যেদিন কন্টিনেন্টের কুবের সন্তানরা ধনেপাতা-লঙ্কা-তেঁতুল-তেলের চা ট নি র সোয়াদটি বুঝে যাবেন সেদিন হবে

আমাদের সর্বনাশ। হাওয়াই-জাহাজের কল্যাণে কুল্লে ধনেপাতা হিল্লি-দিল্লী হয়ে চলে যাবেন কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে। এটা তো এমন-কিছু নয়া অভিজ্ঞতা নয়। ভারত বাঙলাদেশের বহু জায়গাতেই আজ আপনি আর চিংড়ি মাছ পাবেন না। টিনে ভর্তি হয়ে তাঁরা আপনার উদরে না এসে সাধনোচিতধামে (অর্থাৎ কন্টিনেণ্টে—যেখানে চিংড়ি মাছ কেন সর্বভারতীয় যুবকই যেতে চায়) প্রস্থান করেন। একমাত্র কোলা ব্যাঙ সম্বন্ধেই আমাদের কোন দুঃখ নেই। যাক্ যত খুশী যাক্। ওটা ফরাসীদের বড়ই প্রিয় খাদ্য। তবে কিনা ব্যাঙালোর থেকে তারস্বরে এক ভদ্রলোক প্রতিবাদ করেছেন: পাইকিরি হিসেবে এ-ভাবে কোলা ব্যাঙ বিদেশে রফ্‌তানী করায় ঐ-অঞ্চলে মশার উৎপাত দুর্দান্তরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে; কারণ ঐ কোলা ব্যাঙরাই মশার ডিম খেয়ে তাদের বংশবৃদ্ধিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতো।

এটা অবশ্যই একটা সমস্যা—দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আমার ভাবনা কি? আমার তো একটা মশারি আছে।

"গুর্‌মে" ভোজনরসিকরা বলেন সুইটজারল্যাণ্ডের জর্মনভাষী অঞ্চলের খাদ্যই সবচেয়ে ভোঁতা। অথচ নেপোলিয়ন না কে যেন বলেছেন "ইংরেজ এ-নেশন অব্ শপ্‌কীপার্‌জ্" (অবশ্য ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সাকী' নামক ছদ্মনামের এক অতিশয় সুরসিক ইংরেজ লেখক বলেন "আমরা এখন এ নেশন অব্ শপ্‌লিফ্‌টার্‌জ্" অর্থাৎ আমরা এখন দোকানের ভিড়ে চটসে এটা-ওটা-সেটা চুরি করতে ওস্তাদ) এবং "সুইসরা এ নেশন অব্ হোটেলকীপারস্"। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তাবৎ ইয়োরোপে সুইসরাই পরিচ্ছন্নতম হোটেল রাখে। কিন্তু প্রশ্ন: তোমার হোটেল-রেস্তরাঁ যতই সাফ-সুৎরো রাখো না কেন, তোমার রেস্তরাঁর সুপে ব্লণ্ড, ব্রুনেট, কালো চুল না পাওয়া গেলেও (দিনের পর দিন তিন রঙের চুল আবিষ্কার করতে করতে আমার এক মিত্র—সুইটজারল্যাণ্ডে নয়, অন্য এক

নোংরা দেশের হোটেলে—একদিন মেনেজারকে শুধোলেন "আপনার রান্নাঘরে তিনটি পাচিকা আছেন ; না ? একজনের চুল ব্লণ্ড, অন্য জনের ব্রুনেট এবং তেসরা জনের কালো। নয় কি ?" মেনেজার তো থ! এই ভদ্রলোকই কি তবে শার্লক হোম্‌সের বড় ভাই মাইক্রফ্‌ট্‌ হোম্‌স্? সবিনয়ে তথ্যটা স্বীকার করে শুধোল, "স্যর, আপনি জানলেন কি করে? আপনি তো আমাদের রসুই-খানায় কখনো পদার্পণ করেন নি!" বন্ধু বললেন, "সুপে কোনো দিন ব্লণ্ড, কখনো বা ব্রুনেট এবং প্রায়ই কালো চুল পাই--কালোটাই পাতলা সুপে চোখে পড়ে বেশী। এ তত্ত্বে পৌঁছবার জন্য তো দেকার্ত কান্ট-এর দর্শন প্রয়োজন হয় না। আমি বলছি ঐ কালো চুলউলীকে যদি দয়া করে বলে দেন, সে যেন আর পাঁচটা হোটেলের পাঁচজন পাচকের মাথায় যে রকম টাইট সাদা টুপি পরা থাকে ঐরকম কোনো একটা ব্যবহার করে। আমার মনে হয় ওর মাথায় দুর্দান্ত খুসকি"—পাঠক অপরাধ নেবেন না, এ-কেচ্ছাটা বলার প্রলোভন কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলুম না।) সুদ্ধুমাত্র সুইস হোটেলের সুপমধ্যে হরেকরকম্বা চুল নেই বলেই যে দুনিয়ার লোক হুদ্দমুদ্দ হয়ে সে-দেশে আসবে এও কি কখনো সম্ভব? আমার সোনার দেশ পূব্‌পচ্ছিমওতর বাঙলায় সুপ তৈরী হয় না। অতএব প্লাটিনাম ব্লণ্ড, সাদামাটা ব্লণ্ড, চেশনাট ব্রাউন, মোলায়েম ব্রাউন, কালো, মিশ কালো কোনো রঙের কোনো চুলের কথাই ওঠে না। 'মোটেই মা রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তা।' কিংবা বলতে পারেন, 'হাওয়ার গোড়ায় রশি বাঁধার মত।' তাই বলে কি মার্কিন সুইস টুরিস্ট এ-দেশে আসে না।

'বিজনেস ইজ বিজনেস'—তাই সুইসরা পর্যন্ত তাদের রান্নাতে প্রাচ্য দেশীয় মশলা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে।

আমার কাছে একখানা সুইস সাপ্তাহিক আসে। তার কলেবর প্রায় ষাট পৃষ্ঠা। একদা কেউ ফ্ল্যাটে এলে আমরা ঠাট্টা করে

'বলতুম 'কি বেরাদর, কেপ অব গুড হোপ হয়ে এলে নাকি ?'—সুয়েজ কানাল যখন রয়েছে। এখন কিন্তু এটা আর মস্করা নয়। এ্যার মেলের কথা অবশ্য ভিন্ন। কিন্তু ষাট পৃষ্ঠাবপুধারী পত্রিকা তো আর এ্যার মেলে পাঠানো যায় না। খর্চা যা পড়বে সেটা সাপ্তাহিকের দাম ছাড়িয়ে যাবে। হিন্দীতে বলে 'লড়কে সে লড়কার গু ভারি'—বাচ্চাটার ওজনের চাইতে তার মলের ওজন বেশী।

সেই পত্রিকার একটি প্রশ্নোত্তর বিভাগ আছে। কেউ শুধোল "মাংস আলু তরকারি সহ নির্মিত ভোজনের মেন ডিশ (পিয়েস দ্য রেজিস্‌তাঁস) খাওয়ার পর যেটুকু তলানি সস্ (শুকনো শুকনো ঝোল, কলকাত্তাইয়ারা কাইও বলে থাকে) পড়ে থাকে তার উপর পাঁউরুটি টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়ে কাঁটা দিয়ে সেগুলো নাড়িয়ে চাড়িয়ে চেটেপুটে খাওয়াটা কি প্রতোকোলসম্মত—এটিকেট মাফিক, বেয়াদবী 'অভদ্রস্থতা' নয় তো ?"

উত্তর: "পৃথিবীতে এখন এমনই নিদারুণ খাদ্যাভাব যে ঐ সসটুকু ফেলে দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই" (অবশ্য তার সঙ্গে রুটির টুকরোগুলোও যে গেল সে বাবদে বিচক্ষণ উত্তরদাতা কোনো উচ্চ-বাচ্য করেন নি। কারণ রুটিটি পরের ভোজনেও কাজে লাগতো কিংবা গরীব-দুঃখীকেও বিলিয়ে দেওয়া যেত—এঁটো প্লেটের তলানি সস তো পরবর্তী ভোজনের জন্য বাঁচিয়ে রাখা যায় না, কিংবা গরীব দুঃখীকেও বিলোনো যায় না—লেখক) তারপর তিনি বলছেন, "কিন্তু আপনি যদি নিমন্ত্রিত হয়ে কোথাও যান তবে এই কার্পণ্যটি করবেন না।" তার মানে আপনার বাড়ির বাইরের এটিকেট যেন বাড়ির ভিতরের চেয়ে ভালো হয়। আমি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মত ধরি। আমার মতে বাড়ির এটিকেট, আদবকায়দা যেন বাইরের চাইতে ঢের ঢের ভালো হয়।

প্রশ্ন: "কোহিনূর প্রস্তর কোন ভাষার শব্দ ?"

উত্তর : "ফার্সী।"

(সম্পূর্ণ ভুল নয়। 'কোহ্' = পাহাড়—ফার্সতে। যেমন কাবুলের উত্তর দিকে কোহীস্তান রয়েছে [আমার সখা আব্দার রহমান ঐ কোহীস্তানের লোক]। কিন্তু কোহ্-ই-নূরের 'নূর' শব্দটি ন' সিকি আরবী। খাঁটি ফার্সীতে যদি বলতেই হয় তবে 'নূর'-এর বদলে 'রওশন' বা 'রোশনী' [বাঙলায় 'রোশনাই'] ব্যবহার করে বলতে হয় কোহ্-ই-রওশন্। শুদ্ধ আরবীতে বলতে হলে 'জবলুন (পাহাড়) নূর।'...কিন্তু এ রকম বর্ণসঙ্কর সমাস সর্বত্রই হয়ে থাকে। 'দিল্লী-শ্বর' ইত্যাদি!)

প্রশ্ন : "আমার বয়স বত্রিশ ; আমি বিধবা। আমার ষোলো বছরের ছেলের একটি সভেরো বছরের ভেরি ডিয়ার ক্লাস ফ্রেণ্ড প্রায়ই আমাদের এখানে আসে। কিন্তু কিছু দিন ধরে সে আমার সঙ্গে ভাবভালোবাসা জমাবার চেষ্টা করছে। আমি করি কি?"

উত্তর : "আপনি ওকে সঙ্গোপনে নিয়ে গিয়ে বলুন, 'তুমি তোমার অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে প্রেমট্রেম করো। আমি তোমার মায়ের বয়সী। তোমার বয়সী মেয়ের তো কোনো অভাব নেই'। কিন্তু, আমার মনে হয়, ছেলেটার বোধ হয় মাদার কমপ্লেক্স্ আছে—অতি অল্প বয়সেই তার মা গত হন। কাজেই সে একটি মায়ের সন্ধানে আছে"—তার পর আরো নানাপ্রকারের হাবিজাবি ছিল।

এ-উত্তর যে-কোনো গোগর্দভ দিতে পারতো।

কিন্তু এই প্রশ্নোত্তরমালা নিতান্তই অবতরণিকা মাত্র।

* * * *

কয়েক মাস পূর্বে—মনে হল—একটি প্রাচীনপন্থী মহিলা—প্রশ্ন শুধালেন : "আজকালকার ছেলে-ছোকরারা এমন কি মেয়েরাও বড্ড বেশী মশলাদার খানা খাচ্ছে। আমি গ্রামাঞ্চলে থাকি। সেদিন বাধ্য হয়ে আমাকে শহরে যেতে হয়। যদি জানতুম, শহরের 'মাই লর্ড' রেস্তরাঁওলারা কি জঘন্য ঝাল, মাস্টার্ড (আমাদের কাসুন্দো—

'লেখক) আর মা মেরিই জানেন কি সব বিদকুটে বিদকুটে বিজাতীয় মশলা দিয়ে যাবতীয় রান্না করেন, তবে কি আমি সে রেস্তরাঁয় যেতুম। এক চামচে সুপ মুখে ঢালা মাত্রই আমার সর্বাঙ্গ শিহরিত হতে লাগলো। আমার কপালে সেই শীতকালে, ঘাম জমতে লাগলো। মনে হলো, আমার জিভে যেন কেউ আগুন ঠেলে দিয়েছে। আমার চোখ থেকে যা জল বেরুতে আরম্ভ করলো সেটা দেখে আমার কাছেরই একটি সহৃদয় প্রাইভিট শুধলো—'মাদাম, আমি বহু দেশ বিদেশ দেখেছি—যেখানে টিয়ার গ্যাস্ ছাড়া হয়; কিন্তু আমাদের এই সুইটজারল্যাণ্ডে তো কখনো দেখিনি। শোকাতুরা হয়ে কান্না করলে রমণীর চোখে যে অশ্রুজল বেরয় এটা তো তা নয়।"

একদা সুইস কাগজে প্রশ্ন বেরলো : "এই যে আমরা প্রতিদিন আমাদের রান্নাতে মশলার পর মশলা বাড়িয়েই চলেছি এটা কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো?"

সেই 'সবজান্তা' উত্তরিলা :

"মাত্রা মেনে খেলে কোনো আপত্তি নেই। কোনো বস্তুরই বাড়াবাড়ি করতে নেই।" (মরে যাই। এই ধরনের মহামূল্যবান উপদেশ পাড়ার পদীপিসি, ইস্কুলবয় সবাই দিতে পারে।—লেখক)। তার পর সবজান্তা বলছেন "ডাক্তারদেরও আধুনিক অভিমত, 'মেকদার-মাফিক মশলাদার খাদ্য ভোজনস্পৃহা আহাররুচি বৃদ্ধি করে।' তদুপরি আরেকটা গুরুত্বব্যঞ্জক তত্ত্ব আছে। আপনি যদি আপনার ভোজন ব্যাপারে সর্বক্ষণ এটা খাবো না ওটা ছোঁব না এ রকম পুতুপুতু করে আপনার ভোজন যন্ত্রটিকে ন'সিকে মোলায়েম করে তোলেন (ইংরিজিতে একেই বলে 'মলিকড্ল্' করেন) তবে কি হবে? আপনি যতই চেষ্টা দিন না কেন, আপন বাড়িতে তৈরী মশলা বিবর্জিত রান্নামাত্রই খাবো তথাপি ইহসংসারে বহুবিধ ফাঁড়া-গর্দিশ আছে যার কারণে আপনাকে হয়তো কোনো

স্তোরাঁতে এক বেলা খেতে হল। কিংবা মনে করুন, আপনি নমন্ত্রিত হলেন। শক্তসমত্ত জোয়ান আপনি। কি করে বলবেন আপনি ডায়েটে আছেন? ওদিকে রেস্তোরাঁ বলুন, ইয়ার বখশীর ড়ই বলুন সর্বত্রই সর্বজন শনৈঃ শনৈঃ গরম মশলার মাত্রা বাড়িয়ে চ্ছেন তো যাচ্ছেনই। পরের দিন আপনি কাৎ। অতএব"— মাদের সবজান্তা বলছেন, "কিছু কিছু মশলা খেয়ে নেওয়ায় াসটা করে ফেলাই ভালো।"

স্ত মশলাপুরাণ এখানেই সমাপ্ত নয়। সেটা পরে হবে।

তমধ্যে আমি দুম্ করে প্রেমে পড়ে গেলুম।

কবিগুরু গেয়েছেন :

যদি পুরাতন প্রেম
ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে
তবু মনে রেখো।

কিন্তু এ-আশা রাখেন নি, সেই প্রথম প্রিয়াই পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসবে। আমার কপাল ভালো।

লাঞ্চ সেরে মৃদুমন্থরে যখন বাড়ি ফিরছি তখন বাস্স্ট্যাণ্ডের বেঞ্চিতে বসেই দেখি বেঞ্চির অন্য প্রান্তে যে-মেয়েটি বসেছিল সে জলজল করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমার দুশমনরা তো জানেনই, এস্তেক দোস্তরাও জানেন, আমি কন্দর্পকিউপিডের সৌন্দর্য নিয়ে জন্মাইনি। তদুপরি বয়স যা হয়েছে তার হিসেব নিতে গেলে কাঠাকালি বিঘেকালি বিস্তর আঁক কষাকষি করতে হয়। সর্বশেষে সেটা ভগ্নাংশে না ত্রৈরাশিকে দিতে হবে তার জন্য প্ল্যাঁশেৎ মারফৎ শ্বর সুকুমার রায়কে নন্দনকানন থেকে এই য বনভূমিতে নামাতে হবে!

অবশ্য লক্ষ্য করেছিলুম, আমি ওর দিকে তাকালেই সে ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে নেয়।

রোমান্টিক হবার চেষ্টাতে বলেছিলুম, "মেয়েটি।" কিন্তু তার বয়স হবে নিদেন চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ এমন কি পঞ্চাশও হতে পারে কিন্তু তাতে কি যায় আসে। বিদগ্ধ পাঠকের অতি অবশ্যই আসবে, বৃদ্ধ চাটুয্যে মশাই যখন প্রেমের গল্প অবতারণা ক যাচ্ছেন তখন এক চ্যাংড়া বক্রোক্তি করে বলেছিল[১] চাটু মশাই প্রেমের কী-ই বা জানেন। মুখে আর যে-কটা দাঁত যা যাচ্ছি যাবোযাচ্ছি করছে তাই নিয়ে প্রেম।

চাটুয্যে মশাই দারুন চটিতং হয়ে যা বলেছিলেন তার ওরে মূর্খ প্রেম কি চিবিয়ে খাবার বস্তু যে দাঁতের খবর নি প্রেম হয় হৃদয়ে।... একদম খাঁটি কথা। ভল্তের, গ্যোটে, আ তোল ফ্রাঁস, হাইনে আমৃত্যু বিস্তরে বিস্তর বার ফট ফট করে নয়া হুরী পরীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন। এই সোনার বাঙলা দু' একটি উত্তম দৃষ্টান্ত আছে। তা হলে আমিই বা এমন কি হত্যা করেছি যে ফুট করে প্রেমে পড়বো না।

বললে পেত্যয় যাবেন না, অকস্মাৎ একই মুহূর্তে একে অন্যকে চিনে গেলুম। যেন 'আকাশে বিদ্যুৎ বহ্নি পরিচয় গেল লেখি।'

এক সঙ্গে আমি চেঁচালুম "লটে।"

সে চেঁচালে "হ্যার সায়েড।"

তারপর চরম নির্লজ্জার মত সেই প্রশস্ত দিবালোকে সর্বজন সমক্ষে আমাকে জাবড়ে ধরে দুই গালে ঝপাঝপ এক হন্দর বা দুই টন চুমো খেল।

সুশীল পাঠক, সচ্চরিত্রা পাঠিকা, মায় দেশের মরালিটি র বিধবা পদীপিসি এতক্ষণে একবাক্যে নিশ্চয়ই নাসিকা কুঞ্চিত ক "ছ্যা ছ্যা" বলতে আরম্ভ করেছেন। আমি দোষ দিচ্ছিনে। এস্থ

১ বইখানা আমার চুরি গেছে। কাজেই উল্টোসুল্টো হয়ে গে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

আস্মো তাই করতুম—যদি না নাটকের হেরোঈন আমার প্রিয়া লটে (তোলা নাম 'শার্লট') হত। বাকিটা খুলে কই।

ওর বয়স যখন নয় দশ আমার বয়স ছাব্বিশ। আমি বাস করতুম ছোট গোডেসবের্গ টাউনের উত্তরতম প্রান্তে লটেদের বাড়ির ঠিক মুখোমুখি। ওদের পাশে থাকতো দুই বোন গ্রেটে ক্যাটে। আরো গোটা পাঁচেক মেয়ে—তাদের বাড়ির পরে। কারোই বারো তেরোর বেশী নয়।

লটে ছিল সবচেয়ে ছোট।

আমার জীবনের প্রথমা প্রিয়া।

আর সব কটা মেয়ে এ তথ্যটা জানতো এবং হয়তো অতি সামান্য কিছুটা হিংসে হিংসে ভাব পোষণ করতো। ওদের আশ্চর্য বোধ হত, হয়তো, যে লটে তো ওদের তুলনায় এমন-কিছু গুলে-বাকাওলী নয় যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসে আমি এরই 'প্রেমে মজে যাবো'। এটা অবশ্য আমি বাড়িয়ে বলছি। 'প্রেমে মজার' কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমার বয়স ছাব্বিশ, ওর নয় কি দশ।

আসলে ব্যাপারটি কি জানেন? জর্মনদের ভিতর যে-চুল অতিশয় বিরল, লটের ছিল সেই চুল। দাঁড়কাকের মত মিশমিশে কালো একমাথা চুল। ঠিক আমার মা-বোনদের চুলের মত। ওর চুলের দিকে তাকালেই আমার মা-বোনদের কথা, দেশের কথা মনে পড়তো। আর লটে ছিল আমার বোনেদের মত সত্যই বড় লাজুক। সকলের সামনে, নিজের থেকে, আমার সঙ্গে ককখনো কথা বলতো না।

আমাদের বাড়ির সামনে ছিল এক চিলতে গলি। সেখানে রোজ দুপুর একটা দুটোয় আমরা ফুটবল খেলতুম। আমার বিশ্বাস তুমি পাঠক, আমাদের সে টিমের নাম জানো না। আমিও অপরাধ নেবো না। আমরা যে আই এফ এ শীল্ডে লড়াই দেবার জন্য সে

আসলে ভারতবর্ষে আসিনি তার মাত্র দুটি কারণ ছিল। পয়ল
অতখানি জাহাজ ভাড়ার রেস্ত আমাদের ছিল না, এবং দোসর
আমাদের 'কাইজার টীমে' পুরো এগারো জন মেম্বর ছিলেন ;
আমরা ছিলুম মাত্র আষ্টো জন। তৃতীয়ত, যেটা অবশ্য আমাে
ফেভারেই যায়, আমাদের ফুটবলটি ছিল অনেকটা বাতাবী ে
মত। ওরকম ফুটবল দিয়ে কি সমদ, কি জুম্মা খান কক্থ
প্যাটান-উইভিং ড্রিবলিং ডজিং ডাকিঙের সুযোগ পাননি।

হায়, হায়! এ-জীবনটা শুধু সুযোগের অবহেলা করে ক
কেটে যায়।

এসব আত্মচিন্তা যে তখন করেছিলুম তা নয়।

চল্লিশ বছর পর পুনরায় এই প্রথম আমাদের পুনর্মিলন।
হঠাৎ শুধুলো, "হ্যার সায়েড! তুমি বিয়ে করেছো?"

শুনেছি ইহুদীরা নিতান্ত গঙ্গাযাত্রার জ্যান্ত মড়া না হলে কে
প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন শুধিয়ে শাক দিয়ে মাছ
দেয়। আমি শুধলুম "তুই?"

খল খল করে হেসে উঠলো।

"কেন? আমার আঙ্গুলে এনগেজমেণ্ট রিং বিয়ের আংটি দু
এখনো তোমার চোখে পড়েনি। আমি তো দিদিমা হয়ে গিয়ে
চলো আমাদের বাড়ি।"

আমি সাক্ষাত যমদর্শনের ন্যায় ভীত চকিত সন্ত্রাসগত হয়ে
চিৎকার করে উঠলুম, "সে যদি আমায় ঠ্যাঙায়।"

দুটি মিষ্টি মধুর ঠোঁটের উপর অতিশয় নির্মল মৃদু হাসি
নিয়ে বললে, "বটে! আমার জীবনের প্রথম প্রিয়াকে সে প্যাঁদা
তা হলে সেই হালুঙ্কেটাকে আমি ডিভোর্স করবো না!"

তওবা, তওবা!